যাদু ও বাস্তবতার গল্প

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

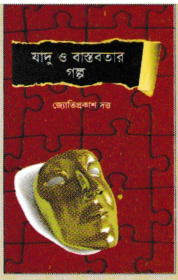

আমরা যখনই সেই সুদূর অতীতে, ১৯৬০-এর দশকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রকালীন অবস্থায় লেখালেখির কথা ভাবছি কিংবা বলা ভালো, মনে মনে লেখক হবার গোপন বাসনা নিয়ে ঘর করছি তখনই সাক্ষাৎ আলাপ-প্রলাপ-আড্ডা তাঁর সঙ্গে। তিনি এখন স্বনামধন্য সাহিত্যরথী। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তর কথা বলছি।

প্রথম থেকেই তিনি কথকতার জগতে যে বিশিষ্টতা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তা আখ্যানসর্বস্বতার কারণে নয়, বরং ভাষাশৈলীর সম্মোহনী গুণে আমাদের সকলকে তাঁর কাছে টেনেছিলেন। গদ্যকাঠামোর ভিতরে কবিতার আভা বিচ্ছুরণ করার অপ্রচল মেধা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জ্যোতিপ্রকাশের লেখা গল্প সে-কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। কাহিনী একটা থাকে বটে সে-সবে, অথচ গল্প পাঠে কবিতার মাধুরী পাঠককে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত পাঠ করা তাই এক বিরল অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই। তাঁর গল্পের যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে অন্য সকলের চাইতে আলাদা করেছে তা তাঁর রচনায় অতীন্দ্রিয়তাবোধ যা তৎকালে ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম বা জাদুবাস্তবতার স্বাদ এনে দিয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর ঐ-রকম গল্পবলিরই একটি সংকলন।

হায়াৎ মামুদ

পুথিনিলয় ▪ ঢাকা

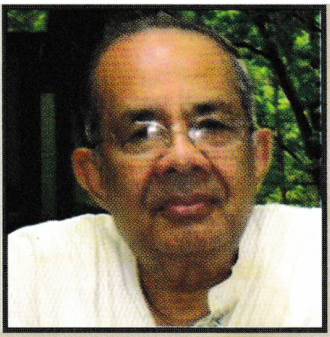

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বাংলাদেশের গত শতকের ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের অন্যতম পুরুষ, এই তথ্য সকলের এতটাই পরিচিত যে নিষ্ঠাবান পাঠকের নিকট অত্যুক্তি শোনাতেই পারে। কিন্তু যে-ঘটনা আমাদের মুগ্ধ করে তা হল, তিনি এখনও পূর্ণোদ্যমে সক্রিয়।

জ্যোতিপ্রকাশের গল্পে তাঁর কাহিনী-বয়ান বা কথনশৈলী যেমন স্বাতন্ত্রিক ও ব্যতিক্রমী তেমনই পরিচয় দেয় বাংলা গদ্যকে তিনি কীভাবে কবিতার সমান্তরাল মাত্রায় নিষিক্ত করেন।

তাঁর গল্প পাঠ করা কেবল গপ্পো পড়া নয়, তারও অধিক অনেক কিছু–এক নান্দনিক বোধের ভিতরে নিজের সম্প্রসারণ। ধীমান পাঠকবর্গের নিকট তাঁর আদৃতি অদ্যাবধি ঈর্ষাযোগ্য।

প্রচ্ছদ : সুমন বৈদ্য

যাদু ও বাস্তবতার গল্প

যাদু ও বাস্তবতার গল্প

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

পুথিনিলয়

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
পুথিনিলয়

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশক
শ্যামল পাল
পুথিনিলয়
৩৮/২-ক, মান্নান মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮০২৯৫৮২১৫৬
ই-মেইল puthiniloy2@gmail.com

প্রচ্ছদ
সুমন বৈদ্য

কম্পোজ
নির্বাচিতা কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
২/১, তনুগঞ্জ লেন
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

দাম
তিনশত পঁচিশ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-92118-6-0

Jadu O Bastobotar Golpo, by Jyotiprakash Dutt. Published by Puthiniloy, 38/2-Ka. Mannan Market, Banglabazar, Dhaka-1100.

উৎসর্গ

হায়াৎ মামুদ

সেবাব্রত চৌধুরী

হুমায়ুন চৌধুরী

শামসুল হক

বন্ধু চতুষ্টয়। এই সব গল্প রচনার কালে যাঁরা আমার পাশে ছিলেন। আজ তাঁদের কেউ আছেন, কেউ নেই।

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থের গল্পসমূহ অনেকাংশেই প্রথাবিরোধী। যে-কালে এইসব গল্প লেখা হয়েছিল বাঙালি পাঠকের কাছে তখনও ভিন্নধারার নতুন গল্পের খবর পৌঁছায়নি। তাই অনেকে এসব রচনাকে 'দুর্বোধ্য' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব ধারণাও পাল্টায়। 'মগ্নচৈতন্য', 'অস্তিত্বস্রোত', 'চৈতন্যপ্রবাহ', 'বিমূর্ততা' ইত্যাকার ধারণা সঞ্জাত গল্প পাঠকের বোধের সীমানায় যাওয়া-আসা করে। বোদ্ধা পাঠক স্পষ্ট লক্ষ করেন বাংলা গল্প কেমন করে নিজ চেহারায় উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য এনে বিশ্বমানের হয়ে উঠেছে। 'ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম' বা 'যাদুবাস্তবতা'-র ধারণা ও বাংলা সাহিত্যে তার ব্যবহার আরও পরের কথা। ঐ জাতীয় রচনাসমূহের পথিকৃৎও বর্তমান গ্রন্থের কিছু কিছু গল্প। সব ক'টি নয়, এই জন্য এই গ্রন্থের নাম 'যাদুবাস্তবতার গল্প' নয়– *'যাদু ও বাস্তবতার গল্প'*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

হায়াৎ মামুদ
সেবাব্রত চৌধুরী
হুমায়ুন চৌধুরী
শামসুল হক
বন্ধু চতুষ্টয়। এই সব গল্প রচনার কালে যাঁরা আমার পাশে ছিলেন। আজ তাঁদের কেউ আছেন, কেউ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থের গল্পসমূহ অনেকাংশেই প্রথাবিরোধী। যে-কালে এইসব গল্প লেখা হয়েছিল বাঙালি পাঠকের কাছে তখনও ভিন্নধারার নতুন গল্পের খবর পৌঁছায়নি। তাই অনেকে এসব রচনাকে 'দুর্বোধ্য' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব ধারণাও পাল্টায়। 'মগ্নচৈতন্য', 'অস্তিত্বস্রোত', 'চৈতন্যপ্রবাহ', 'বিমূর্ততা' ইত্যাকার ধারণা সঞ্জাত গল্প পাঠকের বোধের সীমানায় যাওয়া-আসা করে। বোদ্ধা পাঠক স্পষ্ট লক্ষ করেন বাংলা গল্প কেমন করে নিজ চেহারায় উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য এনে বিশ্বমানের হয়ে উঠেছে। 'ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম' বা 'যাদুবাস্তবতা'-র ধারণা ও বাংলা সাহিত্যে তার ব্যবহার আরও পরের কথা। ঐ জাতীয় রচনাসমূহের পথিকৃৎও বর্তমান গ্রন্থের কিছু কিছু গল্প। সব ক'টি নয়, এই জন্য এই গ্রন্থের নাম 'যাদুবাস্তবতার গল্প' নয়– *'যাদু ও বাস্তবতার গল্প'*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

পরমাত্মীয়	১১
আরও কয়েকটি পুতুল	১৮
একজন পুরুষ চাই	২৪
গোলাপের নির্বাসন	৩৩
ক্রীতদাসী বাসনা	৪১
সারাজীবন	৫২
বিচার চাই, সম্রাট	৫৭
প্রতিবিপ্লবী	৬৩
ছায়া দাও	৭০
ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়	৭৬
ফিনিক্স	৮২
মনোলোক	৮৮
শোণিতরেখা	৯৩
কালপুরুষ	৯৮
প্লাবনভূমি	১০২
যদি পাড় ভাঙে	১০৭
যদি পাখি না ওড়ে	১১৬
রূপসাগরে ডোবে না, ঈভ	১২২
দ্যূতক্রীড়া	১২৯
জ্যোৎস্নার শরীরে আছে শোণিতের ঘ্রাণ	১৩৫
শবশোভাযাত্রা	১৪২
রেহাননামা	১৪৮
জাদুকর জাদু জানে না	১৫৪
জলপরী নাচে	১৬২
দিন ফুরানোর খেলা	১৬৮
শূন্য গগনবিহারী	১৭২
দৃশ্য মুছে গেলে	১৭৮
স্বপ্নের সীমানায় পারাপার	১৮৩
দেহাবশেষ	১৯৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরমাত্মীয়

এখন সেই আশ্চর্য বৃষ্টি নেমেছে শ্রীমন্ত। এত ধূসরতার পরে। যার জন্য আমি উন্মুখ প্রতীক্ষায় ছিলাম। এবং তাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তুমি সে কথা জানতে। আমি ভেবেছিলাম, আমার মতো তুমিও অমনি প্রফুল্ল হবে এবং আমার আনন্দের সঙ্গী হয়ে আমায় তৃপ্ত করবে। অথচ শ্রীমন্ত, তুমি এখন আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে আছ, তোমাকে ব্যথিত দেখাচ্ছে– যেন কাঁদতে পারলেই এখন খুশি হও তুমি।

খানিকক্ষণ আগে আমি যখন এই ঘরে ঢুকলাম– তুমি আগে থেকেই বসে ছিলে, তোমার দৃষ্টি আমায় কোমল গাঢ় আশ্লেষে আবদ্ধ করল, শ্রীমন্ত। অথচ তারপরে, তুমি সেই দৃষ্টিকে ভাঙলে, ছড়ালে, কণায় কণায় আমার অঙ্গে ছড়িয়ে দিলে আর সেই অজস্র কণা তোমার দু'চোখে আকুল হয়ে থিরথির করে কাঁপতে লাগল।

আমি কি ক্লান্ত ছিলাম? অথবা সেই অতৃপ্ত ধূসরতা আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল? আমি তখন চোখ তুলে চাইতে পারছিলাম না, কেননা আমার দৃষ্টিকে মুগ্ধ এবং বিভ্রান্ত করার কোনো উপকরণ তখন কোথাও ছিল না। তাই তুমি তখন অমন নরম, অমন কোমল হয়েছিলে। কিন্তু এখন শ্রীমন্ত, এই বৃষ্টির মুহূর্তে তুমি অমন আকুল, অমন ব্যথিত হলে কেন? আসলে তুমি আমায় দুর্বল ভাবছ। দুর্বল এবং ভীরু। ভীরু এবং আর্ত। আমায় করুণা করছ তুমি।

তুমি কি আমায় শুনতে পারছ শ্রীমন্ত? বুঝতে পারছ?

অথচ আমি যা ভাবছি তা বলছি না। আমরা কেউ তা বলি না। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কথায় কথায় ঠাসা। একটি মুহূর্ত থেকে আর একটি মুহূর্ত– একটি কথা থেকে আর একটি কথা। মুহূর্ত আমাদের জীবন-কথা, আমার, আমাদের ভাবনা। তাই সব বলে না কেউ। বলা যায় না। কিন্তু শ্রীমন্ত তুমি আমায় বুঝলে, বুঝলে এবং করুণা করলে।

শ্রীমন্ত, তার বন্ধু, তখন তার পাশে বসা। এবং তার একখানি হাত বন্ধুর কাঁধের উপর ন্যস্ত। আসলে সে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছিল না কিংবা করুণাও না। সে তাকে অনুভব করছিল আর সেই অনুভব পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টায় ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঈদ, বললো শ্রীমন্ত, অস্পষ্ট এবং আপন করে এবং নিঃশব্দে, তোমায় করুণা করিনি আমি। তোমায় আমি শুধু অনুভব করছিলাম। সেই অনুভূতি অবশেষে তীব্র হলো, প্রগাঢ় হলো আর আকুল হয়ে, অজস্র হয়ে তোমায় ঘিরে ধরতে চাইল। তাই দেখ, সাঈদ, আমরা এখন এখানে পাশাপাশি বসে আছি এবং তোমাকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিচ্ছি– কী তুচ্ছ, কী হাস্যকর! আমার কতটুকু এতে তুমি বুঝতে পারছ?

একটু আগে– বেয়ারা তখন চা নিয়ে আসেনি, তুমি ধূসরতার পথ অতিক্রম করে আমার কাছে এসে বসেছ, আমরা কথা বলছিলাম। তুমি উত্তাপের কথা বলছিলে এবং রৌদ্রের! আমি মেঘের কথা বলছিলাম এবং বৃষ্টির। দুজনে মিলে উত্তাপ এবং মেঘের কথা বলছিলাম আর আমার মধ্যে সেই অনুভূতি জন্ম নিচ্ছিল।

তার একটু পরে এবং এখন থেকে আরও একটু আগে কী অদ্ভুত এবং আশ্চর্য হয়ে আমরা মিলে গেলাম। আমাদের কথা একসঙ্গে মিলল। আকাশের পূর্ব দিকে মেঘ ছিল। ঘন, কালো, নিশ্ছিদ্র, গম্ভীর মেঘ। আরও পশ্চিমে পড়ন্ত বেলার রোদ।

আমি বললাম, এই মেঘ উঠবে, আস্তে আস্তে সবটা আকাশ পেতে বসবে, রোদকে নিষ্পিষ্ট করবে এবং বৃষ্টি নামবে।

তুমি হঠাৎ চিৎকার করে বললে, দেখ কী আশ্চর্য, জীবনে এমন দেখনি। দেখে নাও।

আমি দেখলাম সাঈদ। তোমার সেই আশ্চর্যকে এবং আমাদের কথার একসঙ্গে মেশাকে। দু'চোখ ভরে দেখলাম। পেছনে কৃষ্ণ মেঘের স্তূপ এবং সামনে পড়ন্ত বেলার রোদকে রেখে, সমস্ত আকাশ আর সব দেওদার শিরিষের শীর্ষগুলো কী অদ্ভুত এবং আশ্চর্য সোনা রঙে মাখামাখি হয়ে গেছে। এমন কখনো দেখিনি– না, একবার দেখেছিলাম। তখন আমি পনেরো বছরের কিশোর, বাধ্য হয়ে লেখাপড়া বন্ধ রেখে অনেক দূরের এক গ্রামের মেলায় পানের দোকান করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় এক বিকেলে এমন মেঘ উঠেছিল, এবং রোদ। কিন্তু সে এমন সোনারঙা ছিল না– পাণ্ডুর, ভীষণ এবং পিঙ্গল ছিল। প্রচণ্ড ঝড় এবং বৃষ্টির কালে– যা সেই মেঘকে অনুসরণ করেছিল, আমার বাড়ি এবং অশক্ত পিতার কাছ থেকে বহু দূরে এক গ্রাম্য মেলার কুঁড়ে ঘরে, চৌকিতে মুখ লুকিয়ে আমি কেঁদেছিলাম। সাঈদ, আজ আবার তেমনি দেখলাম। এখন আমি কাঁদছি না যদিও সেদিনের মতো, কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছে, যদি আমি কাঁদতে পারতাম। আর তা তোমার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি গল্প করছিলে– যখন এই মেঘ এবং বৃষ্টি ছিল না। আতৃপ্ত ধূসরতায়ও আচ্ছন্ন ছিলাম না আমরা, কেমন করে বৃষ্টিকে এবং হাওয়াকে তুমি চাও। অনেক উঁচুতে সাততলা অথবা আরও বেশি উঁচু দালানে একটি ঘরের মধ্যে আছ তুমি। আলো এবং হাওয়াকে বাধা না দিতে সেই ঘরের দরজা এবং জানালাগুলো কী প্রশস্ত! আর সেই সব জানালায়, দরজায় তুমি পরদা ঝুলিয়েছ। কী কোমল, কী মসৃণ সেই সব পরদা, এবং সূক্ষ্ম। আর সেই ঘরের মসৃণ হিম, কারুকার্যখচিত মেঝেয় তুমি শুয়ে আছ প্রশান্ত, অলৌকিক, নগ্ন এবং নিরবয়ব হয়ে। সেই সময় এমনি আশ্চর্য মেঘ-রৌদ্রের খেলা শুরু হলো আকাশে। তারপর সেই অপ্রাপণীয় হাওয়া এসে জানালার সব পরদাকে কাঁপিয়ে দিল, উড়িয়ে দিল। পরদাগুলো শুধু নিজেদের প্রান্তকে সজোরে আঁকড়ে ধরে উড়তে থাকল পত্ পত্ করে। নিশানের মতো। আর তখনই সেই অদৃশ্য বৃষ্টি এলো। তুলে-ধরা পরদার খোলা জানালা দিয়ে তারা লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, মাতন লাগিয়ে ঘরে এসে ঢুকল আর শায়িত, অলৌকিক, নিরবয়ব, নগ্ন তোমাকে নিশ্চেতন, তুহিন, অবস্থায় উত্তোলিত করল।

সাঈদ, তাই ভাবছিলাম আমি। এইখানে বসে (তুমি ছাপ্পান্ন বাই নয়-এর এ গোলক বসু বাইলেন থেকে এবং আমি তেষট্টির ছয়-ই কাদের বক্সের গলি থেকে এসে যেখানে মিলেছি এবং আমাদের পেছনে ফেলে আসা অথবা যদি আসে এমন বৃষ্টির দিনের কথা ভেবে চা খাচ্ছি) সেই কথা মনে পড়ল আমার, তোমার চিৎকার, আমার আশ্চর্য অবলোকন এবং সোনারঙা দেবদারুর সারি দেখে। এখন বাইরে প্রবল বৃষ্টি, হাওয়া এবং আমরা এখানে। সেই ভেবে আমার অনুভূতি গাঢ়, তীব্র, তীক্ষ্ণ হলো সাঈদ, আর তাই ছড়িয়ে দিলাম তোমার ওপরে। তোমায় করুণা করতে নয়, ভালোবাসতে।

শ্রীমন্তের মনে এমনি করে কথাগুলো উঠছিল, একটু সময় ভেসে থেকে আবার ডুবে যাচ্ছিল নতুন আর একটার জন্য।

তখন তারা দুজন আরও ঘনিষ্ঠ এবং একান্ত হয়ে বসেছিল। দুজন দুজনের কথা বলছে না অথচ পরস্পরকে অনুভব করছে আর সেখানে এসেই একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। যেন দুজনে ট্রেনের দুটো কামরা থেকে নেমে একই প্লাটফর্মে পা রাখছে। একই মাটিতে, একই ছাউনির নিচে।

দু'মাস পরে আমাদের দেখা হয়েছে, তেমনি নিঃশব্দে বললো শ্রীমন্ত, দু'মাস পরে যোগাযোগ করে আমাদের দেখা হয়েছে। এ দু'মাসে এমন কী কী ঘটেছে যার ফলে তোমায় করুণা করছি বলে ভাবছ তুমি? তুমি মুখে কিছু বলোনি সাঈদ, মুখে কেউ কিছু বলে না। বুঝতে হয়, অনুভব করতে হয়। তোমায় আমি এমন করে বুঝতে পারি যে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তুমি বলছ, শ্রীমন্ত, এই রোদ বৃষ্টিতে চিৎকার, এই মেঘের কালের কথা ভেবে এবং আমার কথা ভেবে তুমি আমায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুণা করছ। এমন আগে করোনি, এখন করছ। কী আশ্চর্য, সাঈদ, তুমি এমন ভাবলে! অবশ্য এটা ঠিক, তোমার জন্য আমি ব্যথিত আর সেই ব্যথার অংশকেই নিঃশব্দে বহন করছি আমি অথচ মাত্র দু'মাসেই তুমি তা বুঝতে পারছ না।

শ্রীমন্ত এবং সাঈদ, দু'বন্ধু, তখন পরস্পরের কাছ থেকে একটু দূরে এবং মুখোমুখি বসল। আসলে, দুজনে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। কেবল তাদের সেই দুটি আশ্চর্য সত্তা, যারা নিঃশব্দে কথা বলে– দেহকে মুখর হবার সুযোগ দিয়ে, তারা মুখোমুখি উঠে বসল। একটু আগে মুখে কথা বলছিল ওরা, দু'মাস পরে দেখা হওয়ার কথা। কিন্তু কেউ সে কথা বললো না যে, দু'মাস আমার কাছে এমন কিছু সময় নয় অথবা দু'মাস আমার কাছে একটি যুগ। সব কথা তারা বলেনি। অর্থাৎ মুখর হয়ে বলেনি। কিন্তু যুধ্যমান দুই সৈনিকের মতো তাদের সত্ত রা তখন মুখোমুখি এবং এইসব নিঃশব্দ মুখরতায় কলকণ্ঠ।

দু'মাস কিছু কম সময় নয়, শ্রীমন্ত। দু'মাসে কত কী হতে পারে। আমাকে দেখেই কি তুমি ভাবতে পারছ, দু'মাস কতটা সময়? আসলে একটি মুহূর্ত এবং একটি কাল এরা এক। একই সমান। একজন ক্ষুদ্র এবং একজন অসীম। কিন্তু কার্যকারিতা বিশেষে তারা ক্ষুদ্র নয় এবং অসীম নয়। কী আশ্চর্য শ্রীমন্ত! এরা কেউ কারো মুখ চেয়ে থাকে না। এরা পরস্পরের পরিপূরক নয়। বরং বলতে পার ব্যক্তি বিশেষে আপেক্ষিক।

যখন ক্লাস টেনে পড়তাম, তখন ক্ষুদ্র আর অসীমের ধারণা পেয়েছিলাম আমি, শ্রীমন্ত, আমার নিজেরই কাছ থেকে। সেপ্টেম্বরে সেবার বেশ গরম আর আমার টেস্ট পরীক্ষা সামনে। সেই সেপ্টেম্বরের বিকেলে– সন্ধ্যায় বরং বলি, আমাদের শহরের খেলার মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলাম আমি– পাঁচ টাকা মাইনের টিউশনি সেরে। মাঠের এককোণে দুটো কবর বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে। মাঠের চারদিকে ঘর-বাড়ি, রাস্তা। রাস্তায় দূরে দূরে ইলেকট্রিকের থাম পোঁতা। আকাশে অসংখ্য অগুনতি তারা। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে মাঠের নির্জন ঘাসের রাস্তায় হাঁটছিলাম। বিজ্ঞান-বইয়ে পড়া নক্ষত্রমণ্ডলের কথা আমার মনে পড়ল তখন। নীহারিকা, ছায়াপথ, কালপুরুষ, ক্যাসিয়োপিয়া, সপ্তর্ষি, লুব্ধক ভিড় করে আবার আমার মনের দরজায় হানা দিল। আমি সেই মাঠের মাঝখানে বসে পড়লাম। নীহারিকা থেকে কী করে সৌরজগতের সৃষ্টি হলো সেই অকল্পনীয় বিরাট নক্ষত্র সূর্যের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ায়, যার চেয়ে আরও অনেক লক্ষ কোটি গুণ বড় লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি নক্ষত্র আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে! কী বিরাট, কী অনন্ত! আস্তে আস্তে সেইসব আমার মনে পড়ল। আমি হারিয়ে গেলাম শ্রীমন্ত। অনন্ত অচিন্ত্যকে আমি ধারণায় আনার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। অসীমকে জানতে পারলাম না আমি কিন্তু তার বিশালত্বকে উপলব্ধি করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বিশালের ধারণা এলো, আর তাই ক্ষুদ্রের ধারণাও। নিজের ক্ষুদ্রত্বকে চিনলাম। কত তুচ্ছ আমি! কী হাস্যকর রকমের তুচ্ছ! আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

অকস্মাৎ নিজের কথা মনে পড়ল আমার। আমি সাঈদ, ক্লাস টেনে পড়ি, টেস্ট পরীক্ষা সামনে, মাঠের ওপারে রাস্তা, আলো, তারপর ঘর-বাড়ি, আমাদের বাসা– সব ঝাঁক ধরে ফিরে এলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর তখন, কী আশ্চর্য, শ্রীমন্ত, ক্ষুদ্র এবং অসীম নয়, আমি আমিই সেখানে বড় হয়ে গেলাম। আমি বেঁচে আছি এবং এখন বাসায় ফিরে যাচ্ছি ভেবে সেদিন কী আনন্দ আমার হলো।

শ্রীমন্ত তাই দেখ, অসীম এবং ক্ষুদ্র, মুহূর্ত এবং কাল আসলে কিছু নয়, তারা আপেক্ষিক। তুমি তাকে যেমন ভাবো, তেমনি হয়। তাই শ্রীমন্ত, দু'মাস সময় এমন কিছু নয়। আমি তাকে অনেক ভাবি।

এবারে বিপক্ষকে পরাজিত মনে হলো সাঈদের। আর তাই সে নিজেই জায়গা থেকে উঠল, অর্থাৎ সাঈদ– সাঈদের দেহ থেকে উঠে এলো এবং শ্রীমন্তের চারদিকে শূন্যে কয়েকটি পাক দিল বিজয়ী সৈন্যের মতো। শ্রীমন্ত, একটু আগে তুমি যা বলেছিলে তারই জবাবে এত কথা বললাম নিজেকে। আমি ভাবছিলাম, তুমি আমায় করুণা করছ। তাই এত বললাম।

এখানে বসার পরে, আমাদের দৈহিক মুখরতার কালে, তুমি অকৃত্রিম আগ্রহে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে দু'মাসে নতুন কী লিখলে?

আমি আর লিখি না। নির্বিকার নিরাসক্ত কণ্ঠে বলেছিলাম। আর তখনই বিস্মিত হয়ে আমায় মূঢ় আখ্যা দিলে তুমি যখন বললাম, আর কখনো লিখব না, তুমি আমায় তখনও বিকৃত, ভীরু এবং দুর্বল ভাবলে শ্রীমন্ত, তারপর সেই চরম ক্ষণ এলো যখন তুমি আমায়–

শ্রীমন্ত (যে তখন টেবিলের উপর ঝুঁকে তার বন্ধুর ছবি আঁকা দেখবার চেষ্টা করছিল এবং তার বন্ধু, যে নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছিল– অথচ আসলে তারা কথা বলছিল নিঃশব্দে, পরস্পরের মুখোমুখি বসে, যুধ্যমান দুই সৈনিকের মতো) সাঈদের কাছ থেকে কথা কেড়ে নিল, হ্যাঁ, যখন আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন লেখনি অথবা লিখবে না, তুমি আমায় বুঝিয়ে দিলে না। শুধু কয়েকটি মৌন বিষণ্ন মুহূর্তের পরে তুমি উৎফুল্ল হয়ে বললে, আমি ছবি আঁকছি। মানে ছবি আঁকা শিখছি।

ছবি আঁকা, কার কাছে?

কারো কাছে নয়, নিজে নিজে। পকেট থেকে ছোট এতটুকু একটা লাল-নীল পেনসিল বের করে তুমি আমায় দেখালে। কী হাস্যকর ছিল তোমার আচরণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাবার্তা। কিন্তু আমি বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম, আর যখন তুমি মহাউৎসাহে খবরের কাগজের নিচের সাদা অংশে ছবি আঁকতে শুরু করলে (যা এখনও তুমি আঁকছ, আমি দেখছি) তখন আমি আকুল হলাম। আততধূসরিত পথ অতিক্রম করে এখানে আসার পরে গাঢ়, কোমল দৃষ্টিতে তোমায় আবদ্ধ করেছিলাম; উত্তাপ-মেঘের কালে তোমাকে অনুভব করলাম, না-লেখার সংকল্পের কথা শুনে বিমূঢ় হলাম, আর এখন তোমার ছবি আঁকার প্রচেষ্টায় আকুল হয়েছি। সব মিলিয়ে তোমায় আরও জানতে এবং কাছে টানতে চাইলাম সাঈদ। করুণা অথবা অনুগ্রহ করে তোমার সমব্যথী হতে নয়। সে বড় সস্তা জিনিস। আমাদের সে সম্পর্ক নয়। তোমায় ভীরু ভাবিনি আমি, মূঢ় না, দুর্বলও না। তোমাতে যে-বিশেষণ আরোপিত হবে, সে আমারও।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এবং খবরের কাগজের পাতায় আঁকতে-থাকা ছবির দিকে নজর দিতে দিতে শ্রীমন্তের চোখের পাতা কাঁপছিল। ছোট্ট এতটুকু সেই লাল-নীল-রঙা পেনসিলটা আঙুলের ডগায় কাঁপছে সাঈদের। কেননা তখন তারা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

শ্রীমন্ত, আমি লিখব না কেন জানো, লিখতে পারব না বলে। আর আমি একটি নিখুঁত পাখির ছবি এবং একগুচ্ছ নিখুঁত ফুলের ছবি আঁকতে চাই বলে।

তুমি জানো, আমি লিখতাম। আমি লিখছিলাম। পরে আমার মনে হলো কী লিখছি আমি? নিখুঁত এবং পূর্ণাবয়ব একটি অনুভবকে আমি ধরতে চাইলাম—একটি সাততলা দালানের মেঝেয় শোওয়া সেই অনুভবের কথা থেকে সোনা-মেঘের বৃষ্টি এবং আমার সেই অসীম-ক্ষুদ্রের অনুভবের কথা আমি ধরতে চাইলাম। কিন্তু তুমি জানো, অন্তত বুঝতে পারছ, তা আমি পারিনি। সেই অলৌকিক প্রাসাদকে আমি ছুঁতে পারিনি মেঘ-বৃষ্টির দিনে। আর সেই ব্যর্থতা এই সোনা-মেঘে বৃষ্টি নামার মুহূর্তে আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছ। আমাকে অনুভব করেছ। কোনো অসীমকে বা ক্ষুদ্রকে আমি ধরতে পারিনি। (কেননা, দু'মাস আমার কাছে দুই শতাব্দী, তুমি জানো), তারি জন্য তুমি বিমূঢ় হয়ে গেছ এবং শেষে আজকের এই আশ্চর্য বৃষ্টির বিকেলে আমার বিস্ময় দেখে তুমি আকুল হয়েছ।

আমার ক্লাস টেন-এর জীবনের সেই বিস্তীর্ণ উদার মাঠ, যা আমায় দুই বিপরীতের সন্ধান দিয়েছিল তা আমার গোলক বসু বাইলেনে হারিয়ে গেছে। আমার অলৌকিক প্রাসাদের স্বপ্নকাল যখন উপস্থিত তখন আমি এখানে বসে না-লেখার ক্ষতিপূরণ হিসেবে খবরের কাগজের সাদা অংশে দাগ কাটছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

তবুও এখানে আমি একটি নিখুঁত পাখির ছবি আঁকতে চাই। নিখুঁত একগুচ্ছ ফুলকে ধরতে চাই। অথচ কী আশ্চর্য, আর কী যন্ত্রণার, দেখ, একটি পাখির নিখুঁত চেহারা পাচ্ছি না আমি (জগতে কি পাখি নেই?) একগুচ্ছ নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ফুল পেলাম না (সাদা ফুল আর ফুটবে না?)।

এতক্ষণে খবরের কাগজের সাদা অংশে ফুল এবং পাখিরা অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীমন্ত, যে এতক্ষণ ধরে সেইসব পাখি এবং ফুলগুলোকে দেখছিল– যারা আসলে কোনো পাখি এবং কোনো ফুলই হয়নি, এবারে মুখ তুলে চাইল। তার অক্ষিপটের উপরে কিসের একটা আবছা ছায়া ভাসল। সেই ছায়া ভাঙল, গুঁড়ো গুঁড়ো হলো এবং শেষে টলমল করতে করতে থির্ থির্ করে কাঁপতে লাগল। সামনে বসা বন্ধুকে এবারও সেই দৃষ্টি গাঢ় আশ্লেষে আবদ্ধ করল, নরম এবং কোমল এবং শেষে দ্রব হলো।

দুজনে তারা হাত ধরাধরি করে পথে নামল তখন। আস্তে আস্তে পিচ্ছিল পথে হাঁটতে লাগল তারা। প্রতিটি পদক্ষেপে পিছলে যাবার সম্ভাবনা, কিন্তু তারা পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগল। তারপর দুজনে দু'দিকে যাবার জন্য তৈরি হলো। একজন ছাপ্পান্ন বাই নয়-এ গোলক বসু বাইলেন এবং অন্যজন তেষট্টির ছয়-ই কাদের বক্সের গলিতে যাবে বলে তৈরি হলো।

আর যে দুই যুধ্যমান সৈনিক এতক্ষণ তাদের পাশে পাশে, মাথার উপরে এবং চোখে-মুখে– সারা অঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল, তারা এবারে একাত্ম হয়ে গালে গাল রেখে মিশে গেল, কিন্তু তাদের সঙ্গে এলো না। একজন, চোখে অলৌকিক প্রাসাদের এবং নিখুঁত ফল-পাখি আঁকার স্বপ্ন নিয়ে এবং আর একজন তারই পাশে টলমল আবছা চোখে চেয়ে বসে রইল আরেক এমনি সামনে গম্ভীর মেঘ এবং পিছনে পড়ন্ত বেলার রোদে মাখা দুর্লভ বিকেলের জন্য!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও কয়েকটি পুতুল

আরও কয়েকটি ক্রীড়ারত পুতুল এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল এবং তখন সেই মোহন অন্ধকারের দুঃকৃতিগুলো ধরা পড়তে লাগল— যারা প্রতিকারহীন।

চুলের প্রান্ত, চিবুক এবং সেই অপরাধী দেহ বেয়ে জল গড়িয়ে নাবছিল। এই জল, মেঘ থেকে যে জল হলো যে আমার হাতের নয়— সে, মাটির বুকে রেখা এঁকে খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে নদী হয়, এখন যদি নদী হতো তবে আমি ডুবতাম। আবার ঘটি থেকে নেবে তিন ধারায় প্রবাহিত হয়ে তারা যদি ত্রিবেণী হতো তবে আমি ডুবতাম। ত্রিবেণী সমুদ্রসঙ্গমে মিশত, আমি ডুবতাম।

বিড়বিড় করছিলেন সরোজিনী, আর জল— ঘটি ঘটি জল ঢালছিলেন মাথায়। তারপর কি হলো, সেই জলের রেখাগুলো উঠোনের সাদা বুকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে তাঁকে কামড়াতে এলো যখন, ছুটে বারান্দায় উঠলেন।

তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। শেষ বোঝাপড়া। ঘরে ঢুকেও সাপগুলো কামড়াতে পারে, তাই দরজা বন্ধ করে দিয়ে হিস্‌হিস্‌ করে উঠলেন, তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি। কোনো দিনই করিনি।

আর তোমার জন্য, কাপড় ছাড়তে গিয়ে মোহন অন্ধকারের নারকীয় সাক্ষীর দিকে নজর পড়তে চিৎকার করে উঠলেন সরোজিনী, মনে মনে ঠোঁট নাড়লেন, আর তোমার জন্য আমার এত কথা। তাকে কাপড়ে ঢাকতে ঢাকতে বললেন, এমনি যত্নে তোমাকে রেখেছি বলেই আজ আমার এত কথা। তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া আমার, তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি। আর তেমনি অবিশ্বাস করি তোমার যে মালিক— তাকে। তাকে আমি ছিঁড়ব। ছিঁড়ে, কুটিকুটি করে, তোমায় কষ্ট দেব। তোমারই লোভে। আমার জন্য নয়।

কখন তোমাকে ঘেন্না করতে শিখলাম আমি? ঠিক কখন?

যে-তোমাকে আমি দিনে দিনে, প্রতি বসন্তে একবার করে সাজাতাম, সেই তোমাকে কখন ঘেন্না করতে শিখলাম? অথচ সেই লোকটা, প্রতিবার তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

নিয়ে নারকীয় তৃপ্তি পেতে তোমার প্রশংসা করত যখন, তখন তোমাকে আরও ভালোবাসতাম। আর সাজাতাম। তাহলে তোমাকে ঘেন্না করতে শিখলাম কখন?

অমূল্য যখন কোলে এলো, তখন? অতুল যখন কোলে এলো, তখন? অনিমা ও অনিতা যখন কোলে এলো, তখন? সাত দুগুণে চৌদ্দ বছরে আরও কতগুলো কোলে এলো যখন– তখন? না, তা নয়। প্রতিবার তোমাকে বেশি করে ভালোবেসেছি আমি।

নাকি অমূল্য স্কুল ছেড়ে দিল, গাঁজা খেতে শিখল, বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, চুরি করে হাজত খাটল আর এখন চোখের ওপর ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেখতে পারবে না বলে দু'দিন বাড়ি নেই যখন, তখন?

নাকি, অনিমার বিয়ে হবার দশ বছর পরেও ভাইয়ের বিয়েতে আসবে না বলে চিঠি পাঠিয়েছে যখন, তখন? নাকি, অতুল দু'বারে ম্যাট্রিক পাস করে, দু'বার আই. এ ফেল করে একশ টাকার চাকরি পেয়ে আজ সকালে বিয়ে করতে গেল যখন, তখন?

নাকি, অপোগণ্ডদের যে-ক'টা আছে তাদেরকে লাথি-ঝাঁটা মারছি যখন, তখন?

কখন তোমাকে ঘেন্না করতে শিখলাম তাহলে? ঠিক কখন? ঠিক কখন? ঠিক কখন?

ফুঁসছিলেন সরোজিনী, যখনই হোক না কেন, এটা তো ঠিক যে, এখন তোমাকে ঘেন্না করি আমি। তাই তোমার সাথে আমার বোঝাপড়া হবে, তোমার মালিকের সাথে।

দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে নাড়তে কপালের দু'পাশের রগগুলো লাফাতে লাগল মনমোহনের। এতবার এত জোরে কড়া নাড়লাম তবুও শব্দ হয় না কেন? কি আশ্চর্য– এই দু'পা এগোলে আমি ঘরে ঢুকতে পারি অথচ মাত্র দরজা বন্ধ বলে আমি দাঁড়িয়ে। তা কেন? আঃ, তা কেন?

ঘরে ঢুকে, সরোজিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন মনমোহন। তারপর ফিসফিস স্বর বেরল তাঁর, এইবার কি তোমার ছেলের বিয়েতে যেতে পারি আমি? এতক্ষণে ফুরসত মিলেছে আমার। যা আমার নেই। যা আমি চাইনি।

সরোজিনীর গলার মোটা শিরা দুটো ফুলল, কথা বলো না আর নির্লজ্জ, তোমায় ঘেন্না করি। আমার ছেলে কে, অতুল আমার কেউ নয়। অমূল্যও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার, তোমার লোভের, আর আর এক জনের– যাকে ঘেন্না করছি আমি। আমার নয়। তোমার লোভের জিভ দিয়ে আমাকেও চাটতে এসো না। কী জঘন্য!

হ্যাঁ, তোমারই ছেলে, আমার নয়। আমার নয়! তাহলে আরও আগে ফুরসত মিলত আমার। তোমার সন্তানের পিতা আমি নই। তুমিই সব। লোভ দেখিয়ে আঁধারের পাঁকে টেনে নিয়ে গেছ। এখন উঠতে পারছি না। কী জঘন্য!

মিথ্যুক, ফুঁসছিলেন সরোজিনী, তোমাকে টানিনি আমি। যে টেনেছে তাকে ঘেন্না করি। তার মানে– তোমাকেও। তোমাদের দুজনকেই। মোটা মোটা নীল শিরাগুলো বারবার ফুলছিল।

চওড়া দাঁত দুটো ঝিকমিক করছিল মনমোহনের।

জামা-কাপড় খুলতে অনেকক্ষণ সময় নিল। তারপর সরোজিনীর দিকে চাইলেন মনমোহন। আর স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সেই দৃষ্টি দেখে কিসের একটা ছায়া ভাসল সরোজিনীর চোখে। সেই আবছা ছায়া দ্রব হলো।

আর পারবে না তুমি। বোঝাপড়ায় হেরে গেছ। তাই এমনি পালিয়ে বেড়াও তুমি, পালিয়ে বেড়াচ্ছ। কিন্তু তাও আর হবে না। পালানো হবে না তোমার।

তাই, আমি হেরেছি, পালিয়ে বেড়াচ্ছি। হেরে, এখন তোমারই সামনে মাটিতে লুটোচ্ছি। তাই আর কখনই ফিরতে পারব না আমি।

ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন মনমোহন, অমূল্য আসেনি?

স্বামীর ছাড়া জামা-কাপড় আলনায় গোছাতে গোছাতে বললেন সরোজিনী না। তারপর একটু থেমে আপন মনে বললেন, হয়তো তুমিও চলে গেলে সে আসবে। আর তোমার এমন পোড়া অফিস, ছেলের বিয়ের দিনও ছুটি দেবে না

গলার স্বর কাঁপছিল মনমোহনের, আস্তে করে বললেন, আমি না গেলে হয় না?

সে আবার কী কথা! মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সরোজিনী, নিজের ছেলের বিয়ে। যার যেমন ভাগ্য। নইলে আমার পেটেই বা ওই কুলাঙ্গার আসবে কেন? ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেখার লজ্জায় পালিয়ে বেড়ায়।

আমার বরাত। হাতটা ওল্টালেন মনমোহন।

না, তোমার বরাত নয়। তোমার কীর্তি! সরোজিনীর মধ্য থেকে সেই আরেক সরোজিনী উঠল আবার, নিজের দোষ ঢাকতে অদৃষ্টকে দোহাই পাড়ো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন নয়? আরেক মনমোহন প্রবল আস্ফালনে শূন্যে তিন-চারটে লাফ দিলেন, কেন নয়, অদৃষ্ট যদি নয় তবে কে আমাকে সারা জীবন এঁদো কুয়োয় ডুবিয়ে রাখল? অদৃষ্ট যদি নয় তবে কে আমাকে সোনার ফলের লোভ দেখিয়ে সারা জীবন ঘোরাল? সবাই আমার অদৃষ্ট! না, না, না, তুমি। মূর্খ, অক্ষম, দুর্বল আর পরাজিত তুমি। এখন হেরে গিয়ে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বাজি জিততে চাও। আমাকে আরও ঠকাতে চাও; তোমায় ঘেন্না করি আমি।

না, অদৃষ্টই। নইলে মূর্খ, কদর্য, অর্ধোন্মাদ, দুশ্চরিত্র সন্তান কেন আমায় দিলে তুমি? উত্তেজনায় কাঁপছিলেন মনমোহন।

আর কতক্ষণ বসে থাকবে? যাও চান করে এসো। আস্তে করে বললেন সরোজিনী।

যাই। শিথিল, এতক্ষণ অবসন্ন হয়ে বসে থাকা মনমোহন চৌকি ছেড়ে উঠলেন। তেল– গামছা নিলেন। দরজার চৌকাঠের কাছে যেখানে গোল একটা পাপোশ রয়েছে তার উপর দাঁড়িয়ে বললেন, আর শোনো, অমূল্য যদি ফেরে তাহলে না-হয় তাকেও–

তাকেও না হয় যেতে বলব? কাঁপছিলেন সরোজিনী।

না, না, তা– নয়। তা নয়। ওরও কোথাও যাওয়া দরকার।

কিন্তু কোথায়?

কেন, তোমার কাছে! অস্ফুট এবং নিঃশব্দে বললেন মনমোহন, কেন, তোমার কাছে। তুমি ওকে নিয়ে নাও। তোমার কীর্তি ফিরিয়ে নাও।

না, পারব না। ঠোঁট নড়ল না সরোজিনীর। না, পারব না। কুকীর্তির ঠাঁই দেওয়ার আমি কেউ নই। আমি সে নই। সে যার গলা টিপছিলাম এতক্ষণ, সে যদি-বা পারে, আমি পারি না। আমার কাছে ঠাঁই নেই।

মনমোহন কলতলায় নেবে যেতে আবার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডাকলেন সরোজিনী, কেমন জব্দ! কেমন জব্দ করেছি তোমায়। বিছানায় মুখ গুঁজে শুলেন সরোজিনী। সর্বাঙ্গ একটি প্রাচীন স্তূপ হয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। এবার তোমাকে দূর করে দেব আমি। আর যাতে আমার কাছে, আমায় জড়িয়ে না থাকতে পার।

এখন যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি না যাওয়া পর্যন্ত ওরা বসে থাকবে। ট্রেনের বেশি দেরিও তো নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'টি ঘর আর একবার খুঁজে দেখে নিলেন সরোজিনী। সকালে ভাই-বোন আর বরযাত্রীদের সঙ্গে বিয়ে করতে যাওয়ার সময় কিছু ফেলে গেছে কিনা অতুল। থাকলে, কথা ছিল, বিকেলের ট্রেনে যাওয়ার সময় মনমোহন নিয়ে যাবেন।

মাঝের ঘরের দেয়ালে কয়েকটা পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কয়েকটা টিকটিকিও আছে সেখানে। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে চোখ বেরিয়ে উঠোনে ঘুরল খানিক। যেখানে কিছু আগে সাপ এঁকেবেঁকে বেরিয়েছিল তার কাছে, খানিক দূরে, মনা-দোনাদের খেলার ভাঙা পুতুলগুলো জমা হয়ে আছে। বারান্দায় বাঁশের আড়ে অতুলের যে লুঙ্গিটা শুকোচ্ছিল, সেটাও আছে। আর সেটা হঠাৎ বিকেলী হাওয়ায় উড়ে এসে সরোজিনীর পায়ের কাছে লুটোপুটি খেতে লাগল। অমূল্যর পুরনো জামাটা, ভাঙা আলনার হুক কামড়ে ধরে যেটা ঝুলছিল, হঠাৎ সেটা খসে পড়ল। সরোজিনী আবার তুলে রাখলেন। বার্মাশেলের ক্যালেন্ডারটা খড়খড় শব্দ তুলল। আর তারই ঠিক নিচে ঝুলিয়ে রাখা অনিমার বিয়ের সময়ে তোলা গ্রুপ ফটোটা হঠাৎ ঢুক করে একটা শব্দ করল। যেন বুকের মধ্যে। ভালো করে দেখেশুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সরোজিনী।

আমি যাই। সদর দরজার শেষে একটু ঘাসে ঢাকা কাঁচা পথ। তারপর একটু মাঠ, রাস্তা। রিকশা পাওয়া যায়।

আমি যাই। ঘরের দরজা পার হতে পারছিলেন না বুঝি মনমোহন।

এ ঘরের টিনের চাল ছেড়ে রোদের বুড়ো টুকরোগুলো ও ঘরের টিনের চালে যাচ্ছিল। উঠোন পেরিয়ে। একটু থেমে থেমে। ভাঙা পুতুলগুলোর কাছে এসেও একটু থমকে দাঁড়াল তারা। যদিও একটু পরেই সরবে ওখান থেকেও

ওদিকের দরজার কাছে চৌকির উপরে কী যেন একটা দেখলেন মনমোহন ছায়া? ছায়া। না অমূল্য? ও যাই হোক, ও অমূল্য। ছুটে ওর কাছে গেলেন মনমোহন। ওকে এমনি করে রেখে যাব না। ওকেও নিয়ে যাই। রুমাল পেতে অমূল্যকে তাতে বাঁধলেন মনমোহন। সবটা অমূল্য ঢুকল না। হাত দুটো বেরিয়ে রইল। তারই একটা হাত থেকে আরও দশটা অমূল্য বেরিয়ে এসে দুজনের গলা ধরে ঝুলতে লাগল। আর একটা হাতে একটা মুগুর গোঁজা, সেটা দুজনের বুকে পড়তে লাগল।

সদর দরজার কাছে পৌঁছে সরোজিনীর মুখের দিকে চাইলেন মনমোহন। সেই মুখের শিথিল বলিরেখাগুলো থিরথির করে কাঁপছিল। ওগুলো আমার দেওয়া। আর পিছনে চাইলেন না তিনি। সদর দরজা পার হয়ে রাস্তাটুকু হেঁটে ঘাসের মাঠে নামলেন তখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আর আমি পরাজিত হৃতপ্রাণ একটা মাটি– কাঠের পুতুল। কেউ আর আমাকে শুনবে না। কেউই না। তোমাকে বলব না আর। কাউকেই না।

শোনো। মনমোহনকে নয়, তাকে ডাকলেন সরোজিনী, তোমাকে দূর করতে পারলাম কই? ঘেন্না করেও পারলাম না। কেননা, তুমি যা নিয়েছ তা তো আমারই। আমারই ভাগ নিয়েছ। আমি আর তুমি মিলে সরোজিনী। সেই সরোজিনীকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে এখানে। তোমাকে ছাড়া থাকবে কী করে সে? আর জব্দ হওয়া, হেরে যাওয়া তো তোমার নতুন নয়। লজ্জা কী!

পায়ের শব্দ যেন বাতাস না শোনে, ভাবছিলেন মনমোহন। এক পা ফেলার শব্দ মিলিয়ে গেলে আর এক পা ফেলছিলেন। ঘাসের ঝোপ মাড়িয়ে। চাপাপড়া ঘাসগুলো পায়ের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর দেখল, পুতুল।

তখন দুচোখ রাঙা করে প্রচণ্ড ধমক দিল তারা, অমন করে কে যায়? কে যায়? কে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন পুরুষ চাই

জনসভার শেষে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো।

সেই বিশাল সমাগমে সে একাকী পরিভ্রমণরত। একটি পরিচিত মুখও তাকে অভ্যর্থনা অথবা প্রীতিসূচক দাক্ষিণ্য প্রকাশে প্রতীক্ষিত ছিল না। পদাঘাতে ধূলি, তুচ্ছ চীনাবাদামের খোসা এবং পদাতিক বাহিনীর মতো চানাচুরের ঠোঙা, প্রচারপত্র যুদ্ধশেষে নিহত অবস্থায় শয়ান। অস্থির কোলাহল, অস্ফুট গুঞ্জন শেষে তাকে দিশেহারা করলে সে স্বগত উচ্চারণে হায়রে, সকলে আমার গ্রামে রয়ে গেছে, ইত্যাকার বিষাদে বলবান হবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলো।

অবশেষে সে উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ করল, বক্তা তার প্রিয় প্রসঙ্গ আলোচনায় অকুণ্ঠ কিনা। বক্তার কণ্ঠস্বর স্বরগ্রামের উঁচুতে ওঠে না। সুখের শব্দের সঙ্গে নেপথ্যে অর্গানের আবহসংগীত নেই। শ্লেষ্মা এবং ভীতিজনিত সেই বক্তা তস্কর

সে বিক্ষুব্ধ হয়ে বললো, তুমি দূর হও। যেখানে আমার প্রিয় প্রসঙ্গ নেই, ভীত কণ্ঠস্বর আমার গ্রাম্য প্রান্তরের অনুপযুক্ত, আমি তোমাকে চাই না সেখানে আমি কেমন করে দাঁড়াই।

বন্ধু সঙ্গে থাকলে উত্তম। অথচ তার বন্ধু কে? অগ্রজের জন্য স্থিরীকৃত পত্নী আপন অঙ্কশায়ী-চিন্তায় উন্মুখ অথবা সুদেহী, সুস্তনা ললনা নির্বিচারে দর্শনমাত্র উল্লসিত মূর্খ যুবকের বন্ধু কে? বন্ধু তাকে এমন কার্যে এবং চিন্তায় প্রণোদিত করে না। পক্ষান্তরে তার প্রতি প্রযুক্ত গ্রামের ননীবালা, সুষমা, শান্তি প্রমুখের শ্রুতিকটু বিশেষণে তারা— যাঃ কেলো, উ-ই ধর ধর বলে সবেগে ধাবমান হয়। অথচ সে জানে, আমার বন্ধুরা, ননীবালা, সুষমা, শান্তি সকলকেই তোমারাও চাও। এবং এ-ও ঠিক, গ্রাম্য যাযাবর কন্যার সম্ভারে তোমারাও লোলুপ।

সজ্জিত বিপণি, ধাবমান অতিকায় যান যদিও তার প্রতিবন্ধক নয়, ফসলকালীন প্রান্তরশোভা অথবা ছায়া, ঘাস, নয়ানজুলি প্রসারিত সড়ক প্রার্থনা সে করে না, কিন্তু দেখা যায়, ললনাকুল এখানেও উপস্থিত। পূর্ণোদরের রক্ষণাবেক্ষণে তারা তার সমস্ত স্নায়ু, শিরা, প্রতঙ্গ প্রভৃতিকে উত্তেজিত করে বিষাদে আচ্ছন্ন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বহুদিনের বাসনা তার কানে ধ্বনি হয়ে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম এবং রাধাকৃষ্ণের কে ছিলেন এই সমস্ত চিন্তার অনুষঙ্গ হয়ে, আমি স্ত্রী চাই, স্ত্রী চাই, বৌ চাই বৌ চাই বলে ক্রমাগত বাজতে থাকে।

ননীবালার দল এবং দৃষ্ট ললনাকুল একত্রে একটি অখণ্ড স্ত্রীপ্রতিমায় উদ্ভাসিত।

সে মূর্খ, নির্বোধ, অশিক্ষিত, বুদ্ধিহীন ও গ্রাম্যবালাবর্গের বিশেষণসমূহ যথার্থ। সে বলবান, দুর্দান্ত গোঁয়ার; ফলে প্রতিবেশীর ভীতি। সে অলস, অকর্মা, জঞ্জাল; ফলে পিতার মনোকষ্ট। সে সাহসী, বেপরোয়া, অকপট, হাস্যমুখ ইত্যাদির জন্য সমশ্রেণির প্রীতি ও ঈর্ষার পাত্র এবং স্ত্রী-সন্ধানী সে কন্যাপক্ষের ঘৃণা, তাচ্ছিল্য এবং বিরক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোত।

প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত অনায়াসলব্ধ গুণরাজিতে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য তার পিতা বাড়ির বাইরে একটি বাঁশের ঘর এবং কিছু অর্থসহ তাকে ব্যবসায়ে প্রলুব্ধ করেন। সে দুষ্ট গরু এবং শূন্য গোয়ালের উপমা শুনে অবশেষে রিক্তহস্তে শূন্য মুড়ি-মুড়কির টিন এবং মশলাপাতির বাক্সের মধ্যে স্থায়ীভাবে দিন কাটাতে থাকে। একদিন রাত্রে সামাজিক শ্মশান-যাত্রার কালে তাকে পাওয়া যায় না। প্রচুর পরিশ্রমে সবলে উন্মোচিত সেই বাঁশের ঘরের বিছানায় কেবল একটি পাশবালিশ লেপে ঢাকা। প্রভাতে সেই রসিক নাগর অবশ্যই চার মাইল দূরের বন্দর থেকে ফিরে এসে যথারীতি 'হরিবোল' ধ্বনিতে সকলকে পরাস্ত করে।

পরে সে পিতার কাছে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্ত্রী-গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে। অগ্রজের অগ্রাধিকার কিসে? অথবা সে কে?

পিতা চিৎকার করে আপন হতাশা, দুঃখ, ক্রোধ প্রকাশ করতে দাদা ছুটে আসে, কেন তুই বাড়ি থেকে দূর হবি না এবং চৌদ্দপুরুষ দশ গ্রামের কলঙ্ক, রে কুলাঙ্গার, বলে তার আস্ফালন অসহ্য হলে সে হাতের কাছে রাখা পিতলের গাড়ু তার দিকে ছুঁড়ে মারল।

পূর্ণ গাড়ুর জল তার পিতার শরীর স্পর্শ করলে সে যথার্থ দুঃখিত, যদিও সেই কারণে প্রাপ্ত ভর্ৎসনা, অভিসম্পাত এবং বজ্রনির্ঘোষ তার কোনো ক্ষতি করে না।

আমাদের সেই আদরের বোন নেই, কাঁচা আম, বেলোয়ারি চুড়ি যার পরম প্রিয়। বহু অতিক্রান্ত দ্বিপ্রহরে কেবলমাত্র তারই দাক্ষিণ্যে অনাহারে থাকতে হয়নি এবং বিবাহের পরের দিন যাত্রাকালে যে এই বাঁশের ঘরে কুলাঙ্গার ভ্রাতার বক্ষে চোখের জল রেখে গেছে, সেই আদরের বোন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মা নেই। আমার মা, কুলাঙ্গার পুত্রের প্রতি আকর্ষণে এবং প্রতিনিয়ত দুঃখবাহী পশুর মতো জীবনান্তে কেবল একটি বেদনার স্মৃতি। অন্যের লাঞ্ছনা এবং কটুবাক্যে যে মা পক্ষীমাতা আর পতনোন্মুখ শাবকের উদ্দেশ্যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ভূমির আশ্রয় নেয়। খাঁ খাঁ প্রান্তর, শুষ্ক ঘাস এবং শূন্য গোয়ালে ক্রন্দনরতা আমার মা।

বলে সে গ্রামের বাইরে ধূলিওড়া পথে– আশশ্যাওড়ার ঝোপ পাশে পাশে অথবা নয়ানজুলিতে পুঁটি মাছের সতত সঞ্চরণ; হায় রে, আমার চোখে জল নেই, আমি কাঁদি না; মুমূর্ষু আর্তনাদে উপবিষ্ট।

আমি কেন এমন অথবা অধঃপতনের সংজ্ঞা কী, পিতৃস্নেহহীনতার, অগ্রজের বিতৃষ্ণার মূল সন্ধান এবং উৎপাটন কিছুই তার মধ্যে প্রবল নয়।

সুসজ্জিত সীমিত রেখায় জীবনের স্থবিরতা, বর্ণাঢ্যতার নামে পাংশুল অবয়ব হেতু সে সহজিয়া। অথচ সে কিছু বোঝে না। গূঢ় কৌশলী তার্কিক কূট শৃগাল জাতির সঙ্গে তার আদৌ কখনো বনিবনাও হয় না। পক্ষান্তরে গ্রামে দাঁতাল শুয়োরের উৎপাত শুরু হলে সে শৃগালের সাহায্য ব্যতীত সুতীক্ষ্ণ সড়কি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়।

মূর্খতা হেতু জীবনের সৃজিত অর্থ, দূর সমুদ্রের যাত্রী কৃত্রিম স্ফটিকাধারে রক্ষিত রঙিন মৎস্যের অর্থ নির্ণয়ে সে অক্ষম। অথবা সুখ কি, দুঃখ জীবন বেয়ে বেয়ে উঠে তারপর দেখ পাগলা ভোলার তাণ্ডব। কেবলমাত্র পাগলা ভোলা প্রিয় তাণ্ডব তথৈবচ।

অতএব প্রমত্ত অজ্ঞান সিংহের মতো উচ্চকণ্ঠে দাবি ঘোষণা কর ঐ ক্ষীণকণ্ঠ তস্কর বক্তার ন্যায় কম্পিত হও কেন?

সে বলপূর্বক ভাবী অগ্রজপত্নীকে গ্রহণ করতে মনস্থ করল। কিন্তু গ্রামের ননীবালা, সুষমা, শান্তিরা তোমাদের ফেলে কী করে যাই! তোমরাও আমার সঙ্গে চলো।

গ্রামের সীমা পার হলে, খররৌদ্রে প্রান্তরের জিহ্বাব্যাদানকারী আহ্বান, সবেগ পুলকে দেহে সঞ্চারিত হয়। স্বেদের প্রাচুর্য বলিষ্ঠ জীবনাবেগে স্বাক্ষরিত। ক্ষীণ পাংশু অবয়বে আনন্দিত স্বেদচিহ্নের খেদোক্তি। হায় রে, আমি হৃতপ্রাণ!

গ্রামের চিহ্ন বিশাল বট প্রকৃতই তার জন্য প্রত্যহ নবতর সম্ভারে উন্মুখ থাকে না। কিন্তু এই বিদায়ের প্রাক্কালে যেন চিরকালের জন্য সাথি হওয়ার উদ্দেশ্যে তার শিষ্যরা সকলে বিদায় সংবর্ধনা জানাবার জন্য ব্যগ্র।

সকলে এগিয়ে এলে সে দেখে, প্রত্যেকের পিঠে-গায়ে ননীবালাদের বাপগোষ্ঠীর পদাঘাতের ক্ষত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

তারা করুণ সুরে বললো, দেখ, ওরা আমাদের কাউকে নিল না। বরাবরের অজন্মার মতোই ওদের বিমুখতা। শূন্য গোলার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেড়ে যান। সে বিষণ্ন, বললো, তোমরা ছিলে কোথায়?

এই তো আমরা তোমার কাছে, তোমার বাইরে বরাবরই আছি। আসলে তোমারই মতন। খালি শিখিয়ে দাও কেমন করে কণ্ঠস্বরের উচ্চতা কর্ণবিদারণকারী এবং আকাঙ্ক্ষায় অমোঘ।

বলে তারা কৃত্রিম স্ফটিকাধারে রক্ষিত রঙিন মৎস্য তার সামনে এনে বললো, তুমি ভেঙে দিয়ে চলে যাও।

সে পুলকে স্নেহময় সর্বাঙ্গলেহনকারী একটি দস্যু!

তারা বললো, তুমি যদি শহরে যাও, আমাদের কথাও সেখানে বলো। মনে থাকবে তো!

একই সঙ্গে পৃথিবী কামরাঙা-লোভী পরিত্যাগী ভগিনী, দুঃখকৃতা মা, স্নেহহীন পিতা এবং বিতৃষ্ণ অগ্রজে পরিপূর্ণ হেতু তার বিষাদ অথবা বলা যাক বিষাদেই সে লুপ্ত। কিন্তু সে সজোর পদাঘাতে রঙিন মৎস্যকুলকে ধরাশায়ী করে বললো, এই আমি বললাম, ভাবী অগ্রজপত্নী হরণ করে শহরে যাবার উদ্দেশ্য তোমাদের প্রতিনিধিত্ব।

সেই খরতপ্ত শূন্যতা তাকে সস্নেহে আলিঙ্গনে প্রলুব্ধ করে না; কেননা দূরপথে আমার মানসিকতা অশ্রুবহী শিরার প্রতিবন্ধক। পদাঘাতে গরম ধূলি নাকে প্রবেশ করতে সে পরিপূর্ণা ধরিত্রীর সতেজ প্রেম অনুভব করে।

শিষ্যরা কিছু দূর তার সঙ্গে এলো। মাঝপথে তারা উত্তেজিত হয়ে বলে, চলো আমরাও যাই তবে। কিন্তু যখন দেখল সাহস কেন্নো হয়ে পথের মাঝামাঝি গণ্ডি টেনেছে তখন বলে, এই তো আমাদের নিষেধ।

তারা সেই গ্রামে অশ্রুমুখরিত, আকাঙ্ক্ষাকারী, করুণ, গালে হাত দিয়ে বসে থাকা কয়েকজন বন্ধুর আশা হয়ে চিরত্বের স্বীকৃতি দিল।

এখন সে এই শহরে উন্মুখ জনসভায় বিক্ষুব্ধ ভ্রাম্যমাণ। তথাকথিত তস্কর বক্তার ম্রিয়মাণতায় সে উত্তেজিত। অথচ তার কী সাধ্য যে সকলে উচ্চকণ্ঠে প্রিয় প্রসঙ্গ আলোচনায় রত হয়।

আর সেই পরিত্যক্ত উষ্ণ দৃশ্যাবলির সঙ্গে বর্তমানের আপতিক বিরোধ। এবং এই দৃশ্য একে একে দুই ভাবনায় সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা বৃথা। এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে কল্পনা সংযোজনা একান্ত আবশ্যক।

তাহলে তার মধ্যে অত্যাবশ্যক প্রজ্বলন সহসা অনুপস্থিত কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে আসার পথে সে অগ্রজের ভাবী শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করে। উদ্দেশ্য, তার কন্যাকে হরণ করা।

সে উঠোনে পা দিতেই বৈঠকখানা ও অন্তঃপুরে নানান রকমের আমোদজনক শব্দ উত্থিত হয়। পরে সেই সবই বিদ্রূপ।

শ্বশুরমশাই ভ্রূ এবং নাসিকা কুঞ্চিত করে আগমনের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হলে সে স্পষ্টতই বুঝতে পারে সমাদর দুরাশা। আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী, অথবা আমার অগ্রজ অপেক্ষা আমি কি যোগ্য নই, এমন বক্তব্যের বিয়োগাত্মক প্রতিক্রিয়া তখন শুরু হয়। কিন্তু তার পূর্বে তাকে দেখা প্রয়োজন হেতু সে সবেগে অন্তঃপুরে ধাবমান হলো।

কিছু উচ্চকিত কণ্ঠস্বর, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভয়াবহ পরিবেশের সম্পূর্ণ সফলতা আনে। যেন সংযুক্তার স্বয়ম্বর এবং পৃথ্বীরাজ হচ্ছেন আমাদের নটবর।

মহতের অপমানবোধ। দুর্বলের অপমানবোধ। অথচ যখন বলিষ্ঠ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত তখন আমি, এই দেবতাজয়ী অসুর, কেন শারীরিক লাঞ্ছনাকে সর্বাংশেই উপেক্ষা করব না। আর এও তো জানা যে, ভিক্ষুকের প্রসারিত হস্তে কেবলমাত্র শূন্য কপর্দকের অস্তিত্ব। এতএব হে রত্নাকর দস্যু, তোমাকেই স্মরণ করি, তুমি তোমার বাল্মীকিত্ব অপসারণ কর। কেননা মহাকাব্য রচনা আপাতত একান্তই অসম্ভব। রামনাম কারণে কেবলমাত্র লম্বোদর হনুমানেরই দশাপ্রাপ্তি ঘটে সেই রাম যিনি একাদিক্রমে সহস্রবর্ষ রতিসুখ ভোগ করেন এবং সেই রাবণ যিনি সবলে সীতাকে আপন রথারূঢ় করেন, আমি তাঁদের স্মরণ করি।

প্রহৃত কুক্কুর যদি সে নয় তবে পরাক্রান্ত পরাজিত হিরণ্যকশিপুর সঙ্গেই সে তুল্য। সুতরাং বিতাড়িত পদক্ষেপ অসমান এবং স্খলিত নয়।

বাইরে এসে সে বীরদর্পে ঘোষণা করে, তুমি এসো।

সে এসে গ্রামপ্রান্তে দাঁড়াল। ভীত নয়, মুগ্ধ নয়। সজল প্রেমময় সে তার দুর্বোধ্য বিশাল হৃদয়ের আলোড়ন। সে তার অন্যায়ী অগ্রজের ভাবী পত্নী। সে তার প্রেমিকা।

তাকে গভীর আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট করে বললো, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, ফেরার পথে নিয়ে যাব।

কিন্তু সে ছাড়ে না। অঙ্কশায়ী পুরুষ তার প্রেমিক। সে এই ধরিত্রীর কন্যা, অতএব পাদ্যঅর্ঘ্য তার প্রাপ্য। তপ্ত ললাটে শীতল বারিসেক, তৃপ্তক আহার্য এবং এই শান্তিময় কুঞ্জ ছেড়ে শহরের পথে অগ্রসরমাণতার মধ্যেই জীবন।

এই সমস্তই তার অন্তরে সযত্নে লালিত একটি কিশোর রজনীগন্ধার গুচ্ছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সর্বাঙ্গ তার কিসের আর্তি এবং আকাঙ্ক্ষায় কম্পমান হয়। একটি পদসঙ্কুলানের স্থান যার নেই তার পক্ষে সমগ্র বিশ্বের আয়ত্তীকরণ একান্ত সম্ভব। কেবল জানা চাই কোথায় আশ্রয়ী সেই সর্বভীতিহর দুর্মর পৌরুষ। অথবা সেই বন্দরের পণ্যাঙ্গনা আপাতত শহরবাসিনী এবংবিধ চিন্তা তার চলায় দ্বিগুণ বেগ সরবরাহ করে।

শহরের পথপার্শ্বে ভিক্ষুকের আস্তানা। সেখানে গৌতম বুদ্ধের নির্বাণচিন্তার উপকরণসমূহের একত্র অবস্থিতি। অবশ্যই নির্বাণ এখন তার চিন্তায় ভিন্নভাবে উদ্দীপিত। সে সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, মৃত যুবক এবং ক্রন্দমান পত্নীকে ওঠো, লুণ্ঠন করো, এই উপদেশ দিতে থাকে।

গুঞ্জন ক্রমে সরব হয় এবং অসন্তুষ্টির চিহ্নসমূহ ক্রমশ পরিস্ফুট। বক্তা তখন আপন অভিজ্ঞতায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আলোচনা করে। এমন সময় বাইরের উঠোনে পিতার তিরস্কারী প্রভুত্বের ভ্রূকুটি এবং পত্নীর অনুযোগ কানে আসতে বক্তা উৎসাহের সঙ্গে জটিলতার অরণ্যে প্রবেশ করে।

জনসভা গুঞ্জন করে, তুমি ইঁদুর, তুমি ইঁদুর।

ক্রমে ক্রমে মঞ্চে ইঁদুর, আরশোলা, চামচিকে, কেঁচো ইত্যাদির আনাগোনা হয়।

তাদের ভীতিমূলক আচরণ কী হাস্যকর! এমনকি পলায়নকালে মুক্তকচ্ছ তারা জনসভাকে হাস্যোদ্বেল করে। তারা শালীনতা, ন্যায়, নীতি এবং প্রকাণ্ড, বিশুদ্ধ অনুভূতির আলোচনায় ক্রমশ অবতরণ করলে সভায় অস্থিরতা দেখা দেয়।

এমন জনসভা আমি দেখিনি। বক্তব্য তাহলে কার কাছে উপস্থিত করা যায়?

ইতোমধ্যে মঞ্চে দুজন বক্তা কোনো কথা বলে না। সে সহসা উৎকর্ণ হলো। তারা দুজন এসে নিঃশব্দে বসে থাকে। মাঝে মাঝে প্রতীক্ষার শক্তিলব্ধ দৃষ্টি ইতস্তত বিচ্ছুরিত হয় এবং নিম্নকণ্ঠের, সে আজ এখানে আসবে, ধ্বনিগুলো জনসভায় মন্ত্রের মতো কাজ করে।

তারা সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসায় ব্যগ্র হয়, কোথায় আমাদের সেই মহান নেতা? সারা জীবন কেমন করে মাঠে বসে থাকি! সে এসে বলুক কোথায় যাওয়া যায়।

জনমণ্ডলীর প্রতিটি রুদ্ধ নিষিদ্ধ কামনা, সুস্থ সাধ পরস্পর কি আহ্লাদেই না কেলিরত হয় যে, সে আসবে।

দুজন বক্তা অনেকক্ষণ মঞ্চে নীরবে বসে থাকে। অস্থির জনমণ্ডলী আর প্রশ্ন করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্বত এবং সমুদ্র থেকে যদি সুর ভেসে আসে তবে তা বরেণ্য। দিক নির্ণয়ে অক্ষম জনমণ্ডলী ইতস্তত দৃষ্টিপাত করে এবং সুদূরের আশায় বিষণ্ন হয়। সে কি আসবে, সে আসে না। কখনো এই ভাঙা ঘরে চাঁদের সমাগম নেই এই নিশ্চিত বোধের কি ব্যতিক্রম ঘটে জীবনে, কেউই তা জানে না।

কেবল সবাই অস্ফুট গুঞ্জনে বলে, তাকে চাই।

পর্বত উত্তুঙ্গতার এবং সমুদ্র যদি বিশালতার প্রতীক হয় তবে তারা আসুক। পর্বত তার প্রতি তরঙ্গে নেতার পদপাত ধারণ করুক।

বায়ুর বেগ এখানে একটি প্রসঙ্গ। সবচেয়ে গতিবান যিনি তিনি তো বায়ুরই প্রভু।

তাদের নেতা অবশেষে পর্বত, সমুদ্র এবং বায়ুকে পরাজিত করবেন। উঁই ঢিবি, গোষ্পদে নীর এবং তালবৃন্ত সঞ্চালিত হওয়া কী পরিমাণেই না তুচ্ছ প্রতীয়মান হয় এমন ক্ষেত্রে।

কেবল তাদের নেতার অসুর শব্দ, কেবল তার রতির শীৎকার, কেবল তার উচ্চহাস্যের লহরি সেই নৈশব্দকে মথিত করে।

সে অযুত কামনার পরিপূরণ সঙ্গে করে, কল্পতরু হয়ে দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন করে আসছে, অতএব সকলে কণ্ঠ মার্জনা করে তার জয় ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হয়।

কেবল সেই নৈশব্দের সৃষ্টিকারী বক্তাদ্বয় ক্রমাগতই উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করতে থাকে। তাদের জ্ঞানসীমায় স্পষ্ট এমন একটি আভাস ভাসে যে, নেতা যথারীতি উপস্থিত– তাঁকে বরণ করা চাই।

এতক্ষণে সে ধীরে জনমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পথ পরিষ্কার করে নেয়। ক্রমান্বয়ে মঞ্চ যত নিকটবর্তী হতে থাকে ততই জনসাধারণের প্রসন্নতা বর্ধিত হয়।

অবশেষে সে প্রচণ্ড চিৎকারে বলে, কোথায় সেই নেতা? সকলে তার কথা শুনতে চায়।

নির্বাক বক্তা দুজন এবারে দুটি আনন্দিত হরিণ শিশু। তারা উজ্জ্বল চোখে বলে, এই তো সে এসেছে, এই তো সে এসেছে। তুমি নেতা, তোমার অনেক কষ্ট। রে কুলাঙ্গার নেতা! প্রিয় ভগিনী, হৃদয়বাসী মাতা পরিত্যাগকারী, আর্ত শিষ্যের সমব্যথী, অগ্রজের পত্নীর প্রেমিক– তুমিই আমাদের নেতা। শোক, মৃত্যু ও জরায় উত্থানের মন্ত্র দিয়ে লুণ্ঠনে উদ্বুদ্ধ করো যে তুমি, সেই তুমিই আমাদের নেতা। জনসাধারণ নেতার আবির্ভাবে সহর্ষ নৃত্যচারী হয়।

গ্রামের প্রান্তে শিষ্যদের কাছে যদি কখনো এর ক্ষীণ রেশটুকুও যায় তারা অমনি খাড়া হয়ে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সে হাস্যমুখে স্বেচ্ছাচারী অঙ্গভঙ্গির কর্তা হয়ে মঞ্চে আরোহণ করে। স্বয়ং প্রিয় প্রসঙ্গ উদ্ঘাটিত করার আকাঙ্ক্ষায় সে তৎক্ষণাৎ ননীবালা, শান্তি ও সুষমাকে মঞ্চে তার কাছে আসতে বলে। প্রেমিকাকেও সে বক্ষে ধারণ করতে চায়।

দ্রুত স্পন্দিত ধমনীতে তখন স্ত্রী চাই, স্ত্রী চাই, বৌ চাই, বৌ চাই, এই সব কামনার অবাধ গতি।

সে উচ্চকণ্ঠে বলে, আমরা সকলে স্ত্রী চাই। তার সঙ্গে সহস্র বর্ষ রতিসুখে কাটাতে চাই। তাকে অন্যের অধিকারের বাইরে আনতে চাই।

জনসাধারণ উল্লাস এবং উল্লাসহেতু ক্রমশই মানুষ। এতএব, তারাও স্ত্রী চাই, স্ত্রী চাই, চাই চাই বলে সমর্থন জানাতে থাকে।

তারা বলে, এই কথা আমরা এত দিন বলতে পারিনি।

সে বললো, বিবাহে আমাদের ন্যায্য অধিকার, কিন্তু দেখ, মূর্খ হয়ে বাঁশের ঘরে রাত্রি অবসান হয়।

জনসভায় অনুভূত যন্ত্রণা একটি তরঙ্গ তুলে বোধকে আরও তীব্রতর করে। এই সমস্তে কেবল অভাবের শব্দ। শূন্য মাঠ, চীনাবাদামের খোসা কেমন করে বলো সারা জীবনের সঙ্গী হয়!

আমরা হতভাগ্য বলে জনমণ্ডলী দুঃখিত হয়। শেষে এই আমাদের ভবিতব্য— এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তারা হাত উল্টিয়ে সমাপ্তিসূচক ইঙ্গিত করতে চায়।

তখন সে প্রচণ্ড গর্জনে নিজের অসুরত্বকে সবলে তুলে ধরে বলে, তোমরা মানুষ, হতভাগ্য নও, ভবিতব্য নেই। লুণ্ঠন করো।

সকলে তাকে পরম স্নেহ দিলে শিষ্যদের কথা তার মনে পড়ে। সে সকলকে সম্বোধন করে মঞ্চের উপরে একে একে স্ত্রীলোকদের ডাকতে থাকে।

এই দেখো ননীবালা, শান্তি এবং সুষমা এবং অবশেষে এই দেখ আমার সে।

মণ্ডলী ঘনিষ্ঠ হয়, পরম সাবধানতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে করতে তাদের মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। বলে, এরা সকলেই আমাদের স্ত্রী হবার উপযুক্ত। দিব্য, সুলক্ষণা এবং সম্ভারে অবনতা— এরা সকলেই মহীয়সী, এরা আমাদের হোক।

কিন্তু দেখ, এদের কাছে আসতে দেওয়া হয় না। আমার শিষ্যরা সর্বাঙ্গে ক্ষত নিয়ে রাস্তায় বসে আছে।

সকলে এ অন্যায়, এ অন্যায় এই রকম ধ্বনি দিতে থাকে। আমরা চাই আমরা চাই, এই রকম ধ্বনিও অবিরত শোনা যায়।

কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই প্রার্থিত কন্যারা অদৃশ্য হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনচিত্ত প্রতিক্রিয়ার একটি মূল কেন্দ্র। তারা কোথায় গেল, কেন এমন করে তারা চলে যায়! সারা জীবন এমন শূন্য মাঠে বসে থাকা যায় না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই আক্ষেপ পিতার আদেশ-অমান্যতায়, অগ্রজের স্নেহহীনতায় সেই আক্ষেপ ক্রমাগত বলবান হতে থাকে। অবশেষে একটি মহৎ প্রতিবাদে তার সামগ্রিক রূপ।

আর আমরা সইবো না, আমরা লুণ্ঠনকারী দস্যু, আমরা অসুর এ সমস্তই তাদের বহু বৎসরের নিরুদ্ধ কামনা।

প্রকৃতই তখন এদের মঙ্গল কামনায় বিপুল জনসমাগম হয় না এবং এ যথার্থ পথ নয়, অমঙ্গল-অশুভ।

কিন্তু সেই কুলাঙ্গারের দৃষ্টান্ত তাদের কাছে এমনই প্রিয় যে তাই তাদের জীবন। সে তাদের সহোদর।

সকলে আমরা লুণ্ঠকারী দস্যু, আমরা অসুর বলে অগ্রসর হয়।

তার দুই চোখে বহু বৎসরের আকাঙ্ক্ষার সফলতা দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকলে সে মহা উৎসাহের একটি আধার।

ততক্ষণে ভাবী অগ্রজপত্নী প্রেমিকার পিতা এবং কন্যাদের পিতৃপক্ষ বিপুল বিক্রমে মঞ্চের উপরে এসে পৌঁছে গেছে। তারা কৃতসঙ্কল্প যে, এই হচ্ছে একত্রে সমস্ত বিক্ষোভ।

কটুবাক্য, বিদ্রূপ, ভর্ৎসনার পরে তারা স্বমূর্তিতে প্রকাশিত। জিজ্ঞসা করে, তুমি এদের নেতা?

পরম গৌরব বোধহয় সম্মতিতে।

তুমি এদের বিক্ষুব্ধ করেছ?

আর তুমি এই সকলকে কেন স্ত্রীর অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছে? অতএব, তুমি পুরুষ, অতএব তুমি বধ্য। এই পৃথিবীতে আমরা স্ত্রীকামী পুরুষ রাখতে চাই না। পিতৃপক্ষের সে কি সফলতার হাসি অথবা এই চিরকালের হাসি। বলা যাক অট্টহাসি।

উত্তপ্ত শোণিত তার বক্ষের সুন্দর পবিত্র প্রস্রবণ। তার বঙ্কিম রেখা ক্রমে সেই গ্রামপ্রান্তে আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান মেদুর বটচ্ছায়ায়, প্রায়ান্ধকার বনপথে, নয়ানজুলির নীল বদ্ধ জলে; সর্বত্র প্রবাহিত নদীর অঙ্গীকার দেয়।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই সর্বকালের পরিত্যক্ত কুলাঙ্গার বললো, এই প্রবাহিত নদীই গ্রামবাসীকে আমার সন্ধান দেবে। তারা এই শোণিত ললাটের তিলক করুক। একবার তারা শহরে আসুক।

কেননা এখনও আমরা একজন পুরুষ চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

গোলাপের নির্বাসন

আত্মার আত্মীয় গোলাপ আমার সহোদরা।

আমাদের পিতা ছিল না, মাতা ছিল না, কেবল সতেজ রৌদ্রকরে এবং পবনের দাক্ষিণ্যে আমরা সুসলিলা পৃথিবীতে আশৈশব স্পন্দিত হয়েছিলাম।

পরস্পরের বাইরে আমরা কাউকে জানতাম না তখন। ফলত, গোলাপকে আমি দেবীর মতো হৃদয়ে স্থাপন করেছিলাম তার মধ্যে আপনার ছায়া দেখব বলে এবং সযত্নে সঙ্গোপনে লালন করেছিলাম সে আমার আনন্দ হবে বলে।

গোলাপ কোনোদিন পিতৃস্নেহ বা জননী-সান্নিধ্যের অভাব অনুভব করতে পারেনি। বরং বলা যাক, একাধারে আমাতেই সে মাতা এবং পিতাকে প্রত্যক্ষ করেছিল। আমি তাকে স্নিগ্ধ প্রদীপশিখার মতো প্রজ্বলনের ক্ষমতা দিয়ে অন্যায়ী বায়ুর প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ রেখেছিলাম, যেন সে সহসা কৃতকার্য না হয়।

অন্ধকার উদ্যানে সমুজ্জ্বল পুষ্প আমার গোলাপ।

জানালার খড়খড়ি তুলে আমি গোলাপকে দেখলাম। দিনের আলোয় ছায়াচ্ছন্ন পথে তার দেহ সে কী মোহন দৃশ্যের অবতারণা করে। তার সুঠাম দেহ, সুগঠিত যৌবন, অপূর্ব মুখশ্রী, বঙ্কিম চাহনি প্রতি পদক্ষেপে পদচারীকে স্তম্ভিত ও উপাসক করে দিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আগে সে আমার পাশে ছিল। তার দেহের সুবাস এখনও এই কক্ষের পরিসরকে ছাড়িয়ে যায়নি। দরজার বাইরের পা দেওয়ার মুহূর্তে সে পরম মমতায় আমার ললাট স্পর্শ করলে আমি তার মস্তকে ওষ্ঠ রাখি। আলো, ছায়া, পথ মানুষের নক্‌শা সমস্ত কিছুর ওপারে আমরা তখন শৈশবনিহিত স্মৃতির দাস। মুহূর্তে সেই নদী দেখা দেয় যে প্রমত্তা নয়, নবদূর্বাদল যার প্রান্ত সযত্নে ধারণ করেছে। আমরা চপল হরিণশিশু, আবেগে ক্রীড়ামত্ত। দূরে ভাসমান একাকী কচুরিপানার ঝোপ, কয়েকটা জলপোকা কেবল নদীর ঘোলাজলের সৌন্দর্য বাড়ায়। স্মৃতি ক্রমে আসে, ক্রমে যায়।

বৃক্ষলতার সবুজ আমাদের মনোহরণ করলে, কোনো নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমরা বনবাসী হতাম। সেখানে কালানুযায়ী কোকিল বা বউ-কথা-কও পাখির স্বরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিধ্বনি অথবা ঝোপের মাঝে হঠাৎ পরিষ্কার কিছুটা ফাঁকা জায়গা পরম রসভোগের কারণ হয়। কোনো বিগত-মধ্যাহ্নকালে ঘরের পিছনের শ্যাওড়া ঝোপে লাউডগা সাপের স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গি কি আঁস্তাকুড়ে অকস্মাৎ গো-সাপের আবির্ভাব অবশ্যই রহস্যের অবতারণা করত। এবং কোনো আসন্ন সন্ধ্যায় নোঙরের মতো শিকড়ওলা ডুমুরগাছ হঠাৎ আশ্রয়ের মতো বোধ হয়।

এই সমস্তই আমাদের সঙ্গে নির্বোধ কুমির, চতুর মর্কট, ধূর্ত শৃগাল প্রভৃতির পরিচয়ের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং পরিশেষে সুবচনীয় হাঁস, টুনটুনি, অরুণ-বরুণ এদের সঙ্গে যোগ দিলে আমরা চট্টগ্রাম-মেদিনীপুর-বাঁশের কেল্লা স্মরণ করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি।

সেই মোহন শৈশব-কৈশোরে আমাদের কোনো নাম ছিল না। আমি এবং গোলাপ তখন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে নিহিত ছিলাম। বর্ষায় দিগন্তপ্লাবী সমুদ্রে ডিঙ্গি নৌকার আরোহী আমরা এখন, কালক্রমে পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকার করেও কেউ কাউকে পরিত্যাগ করতে পারি না। ত্যাগের চিন্তা বাতুলতা প্রতিভাত হলে বক্ষ আনন্দের শ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গোলাপের কোনো বাসনাই আমি অপূর্ণ থাকতে দিতাম না। প্রাক্‌যৌবনে মিছিলে চিৎকার করে স্বর ভেঙে গেলেও স্লোগানের সুরে আমার সর্বাঙ্গ কম্পিত হতো। রাত্রিতে প্রাচীরপত্র লাগাতে গিয়ে প্রহরীর হুমকিও আমায় বিচলিত করত না, কেননা, আমি জানতাম, গোলাপ এর সবই পছন্দ করে। সমস্ত শহর ঘুরে খবরের কাগজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কালে মলিন জামার আস্তিনে ললাটের স্বেদকণা মুছতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হতাম না। কেননা, আমি জানতাম, গোলাপ আছে।

কেবল কখনো প্রচণ্ড বর্ষণ আমায় কিছু সময়ের জন্য কোনো গৃহবাসীর বারান্দায় বিশ্রাম নিতে বাধ্য করলে এবং সে ভ্রুকুটি করলে, ক্ষণিকের জন্য গোলাপকে ভুলে যেতাম এবং হায়রে জীবন, হায়রে পৃথিবী— এই সব কথা আশপাশে স্বনিত হতো।

অবশেষে আমি সমস্ত পথ পার হয়ে এলাম। কোথাও থেমে যাইনি; হতোদ্যম হয়েও ক্ষান্ত হইনি; ভেবেছি জয়মাল্য অবশ্যই আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ভাবতাম, তাকে আমি সুখী করবই।

সেই জন্যই আমার ভবিষ্যৎ প্রায় নির্ধারিতই ছিল। সরকারি আমলা, স্থূলোদর ব্যবসায়ী, হৃদয়হীন চিকিৎসক, অন্যায়ী কারিগর— কোনোরূপেই আমাকে মানায় না। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্যাগত আইনজীবী আমি গোলাপকে সম্মুখে রেখে অগ্রসরমাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

দেখলাম স্থলপদ্মের শোভা। হালকা গোলাপি রং কেমন করে ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয় এ লক্ষযোগ্য। রজনীগন্ধার আনন্দ বর্ষায় কিন্তু প্রিয়তম যেহেতু সুদূরগত নন অতএব তার পার্শ্ববর্তীও হওয়া চলে বৈকি এবং ওখানে ওই শিউলি। কেবল গোলাপের কার্পণ্য।

আমি ফুলবাগানে ঘুরে বেড়াতে থাকলেও তাকে সর্বদাই দেখতে পাই। আহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জন সব যথানিয়মে চলে এবং চলে আমার ফুলবাগানে পসরা সাজানো।

আমার হাতে কিছু যন্ত্রপাতি। কিছু মাটি তাতে লীন হয়ে আছে– কিছু আমার বসনেও আছে। যে-ক'জন ফুলবালার পরিচর্যা করেছিলাম তারা আমার দিকে তাকালে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি, কেউ-ই অকৃতজ্ঞ নয়।

আমার ছায়া ক্ষুদ্রতর হতে থাকলে গোলাপ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার শাসনের ভ্রূভঙ্গি পরম রমণীয় বোধ হলে যুগপৎ আমার মনে বেদনার সঞ্চার হয়।

আমি তাকে চিত্র-কাহিনীর পিতার মতো করে বললাম, গোলাপ, তুই চলে গেলে আমায় কে দেখবে!

সে তো নায়িকা নয়। অতএব, মনি, তুমি পাগল হয়ো না, আমি আছি, এই কথা বলে না। সে বলে, আমি গেলে তোমার আর কেউ থাকবে না। তার জন্য এখন থেকে ভেবে লাভ কী? বরং তুমি উঠে এসে তৈরি হয়ে নাও।

আমি লক্ষ করলাম, কথাগুলো উচ্চারণকালে তার সমগ্র অবয়ব দ্রব হয়ে স্বচ্ছ কুলুকুলু তটিনীর মতো বহতা হতে চায়।

ধ্রুপদী গানের মতো তার ব্যবহার আমায় আদৌ বিস্মিত করে না। আমি কেবল তার সম্মুখে স্বরলিপির পাতা উলটে সমগ্র রাগিণীকে প্রস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করি।

বাগান থেকে উঠে এসে ঘরে ঢুকলাম। সেখানে ক'জন লোক বসে ছিল, তারা আমার ভব-বৈতরণীতে গাভীর পুচ্ছ। সিনিয়র চৌধুরী এদের পাঠিয়েছেন, যেন আদালতে বেরনোর আগে নথিগুলো আর একবার দেখে নিই।

চৌধুরী স্থির করছেন, আমাকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছিয়ে দেবেনই। এবং যোগ্য সহকারী এই খ্যাতিতে আমি শীর্ষনিম্নে প্রায় পৌঁছেই গেছি, এখন কেবল আরোহণ বাকি। এই অবসরে ফেলে আসা পথ ইত্যাদি জরিপ করে ফেলবার চেষ্টা করি।

অখিলবাবুর কথা স্মরণে আনা যায়। মলিন বস্ত্র, জীর্ণ ছাতা ও উকিলের পোশাক এবং তাঁর সারা মুখে ঘামের প্রসাধন আমতলায় আনন্দ সঞ্চার করত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর নবীনদের জন্য ভীতি ও সংশয়। অথচ আমরা জানতাম, দশ হাজার টাকার বিনিময়েও তিনি দত্ত স্টেটের পিতৃব্যপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে রাজি হননি; নাবালক উত্তরাধিকারীর স্বার্থহানির ভয়ে।

যাই হোক, এ-সমস্ত আমার জন্য খুব সাধারণ কথা। আমি স্থির করে নিয়েছিলাম যে, অখিলবাবু না হয়েও অখিলবাবুই থাকব। গোলাপকে আমি বাঁচাবই, তাকে কখনো শুকিয়ে যেতে দেব না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম। গোলাপ আবার বাইরে এসে দাঁড়াল, সে আমার যাওয়া দেখতে চায়, দূরে এক দল দেখে বুঝলাম, গোলাপও এখনই বেরিয়ে যাবে। ওর সহপাঠিনীদের সকলকে আমি চিনি না, তবুও কাউকে চেনার চেষ্টা করতে হয়। সবাই গোলাপের সতীর্থ, আমার আদরের।

খানিক দূরে হেঁটে এলাম। আগের রাতের সেই যে মাতালের দল, লক্ষ কোটি কোটি মাতালের দল, শুঁড়িখানায় জায়গা না পেয়ে পথের নিচু জায়গাগুলোতে পড়ে আছে। সামান্য স্পর্শেই তাদের বেসামাল অবস্থা। কোনো ভারী যানের চাকা তাদের অঙ্গশায়ী হলে তারা এমন ছোটাছুটি করে যে, পথচলা ভার। তাই আমায় সাবধানে এগোতে হয়।

মোড়ে এসে দেখলাম তারা সবাই দলে দলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কৈশোরের প্রতিমূর্তি সব। তেমনি রুক্ষ চুল হাওয়ায় ওড়ে— ওমনিবাস-সাহিত্যিক রচিত উপন্যাসের নায়কের মতো। তাদের অযত্নপোষিত বেশ, বেপরোয়া গতিভঙ্গি সব আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার সান্ত্বনা যে গোলাপ আছে, সে এদেরই একজন।

ওরা ক্রমে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। অধিক লোকের সমাবেশ ঘটলেই বুঝি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়— জনসমুদ্র। সে সবখানেই— এখানেও জনসমুদ্র আর বিমানবন্দরে কোনো গদিনসীন নেতার অভ্যর্থনাকালে অর্থবশ দরিদ্রসমাবেশও জনসমুদ্র।

আমি প্রতিদিনই কিছুক্ষণ দাঁড়াই এখানে। সিনিয়র চৌধুরী একটু ঘোরাপথে হলেও আমায় তুলে নিয়ে যান এবং আমি শীর্ষে আরোহণের আশায় মোটে বাক্যব্যয় করি না। যদিও এই সব সময়ে হীনম্মন্যতা পীড়িত করলে গোলাপের কথা স্মরণ হয়।

চৌধুরী ওদের সমাবেশ দেখে পথে আমায় কিছু কথা বলেন, যেমন অনুন্নত দেশে ছাত্র-আন্দোলনের অনিবার্যতা, রাজনীতিতে তাদের স্থান এবং সমগ্র অবস্থার ফলশ্রুতি। তিনি জনসমাজে এই উচ্ছৃঙ্খল, পরম বিবেচক, দরদি দুলালদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখের অংশভাগী বলে পরিচিত এবং আমার সন্দেহ, তাঁর শীর্ষারোহণের জন্য এরাই দায়ী।

আমি সকাল বেলায় কাগজের খবর উল্লেখ করে বলি, শান্তিপ্রাপ্ত সতীর্থদের জন্য এদের ভালোবাসাই এখনকার সমাবেশ। এরা স্পষ্ট জানে, মৃত্যুকে সকলে ভাগ করে নেব, এতএব, সুখ অথবা দুঃখ সকলের। বিতাড়িত বন্ধুদের জন্য এদের চক্ষু সজল।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে আমি যোগ করি, আইনের আশ্রয় এ-ক্ষেত্রে নেওয়া চলে। আর ওদের তা করা উচিত।

তিনি অন্যমনস্ক স্বরে বলেন, হ্যাঁ।

তাঁর ঔদাসীন্য আমায় বিস্মিত করলে বিগত কোনো বর্ষে অনুরূপ ঘটনার কথা স্মরণ করি, তখন কেবলমাত্র এঁরই উৎসাহে ওরা জয়ী হয়।

আমি বললাম, সম্ভবত ওরা আমাদেরই শরণ নেবে।

এই উক্তি তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে দেখা যায়, ওরা কি তোমার কাছে এসেছিল?

আমার বুকে গভীর শব্দ হতে থাকে। সকালে গোলাপের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ হয়। তার বন্ধুদের জন্য আমি সবসময় রয়েছি– এই বিশ্বাসে তার বুক এখনও ভরে আছে স্মরণ রেখে বলি, না, ওরা কেউ আসেনি, তবে এ-ই সকলের ধারণা যে, আপনি একমাত্র ব্যক্তি।

তিনি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকেন, কিছুক্ষণ আমার দিকে। এই বয়সে তাঁকে গাড়ির চামড়া-মোড়া আসনের কোণ ছেঁড়বার বৃথা চেষ্টায় নিয়োজিত দেখে আমার প্রকৃতই মমতাবোধ হয়, না মনি, আমরা এবারে এ-সবের মধ্যে যাচ্ছি না।

তাঁর সিদ্ধান্ত আমায় হতবাক করে দেয়, কিন্তু কত আশা, কত বড় বিপদ–।

না, বিপদ এমন কিছু নয়, তিনি বলেন, কিছু কষ্ট হবে ওদের। অ্যাডভোকেট আহমেদ বা খান রাজি হয়ে যেতেও পারেন।

কিন্তু ওদের অর্থবল তো–

চুপ করো। ওঁর করুণ অনুনয়ে আমার থামতে হয়, তুমি তো জানো, বড় খোকা দু'বছর পরে বাইরে এসে কত কষ্ট করে কাগজটাকে দাঁড় করাল– ওরও তো ভবিষ্যৎ চাই; বলো, এমন অবস্থায়–

আমি কিছু না বুঝে তাঁর চোখে চোখ রাখলে তিনি বললেন, তুমি জানো না, লোক এসেছিল এরই মধ্যে, আমায় তো কিছু করতে পারে না, বলছিল, স্যার, আপনার কাগজের জন্য আমরা খুব ফিল করি স্যার, কিন্তু স্যার,– ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই আর অবোধ্য থাকে না। কিন্তু এ আমি কী করে মেলাব? গোলাপকে বোঝাব কী দিয়ে? কোনোদিন তার কোনো ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখতে পারি না। যদি সে আমায় ঘৃণা করে!

প্রায়-আগত শীতসকালে আমি দারুণ গ্রীষ্মের সরব উপস্থিতি অনুভব করি। তারা আমায় কী নির্যাতন শুরু করে। আমি প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হতে পারি না। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন গোলাপকে পুরোভাগে রেখে মিছিল করে এগিয়ে আসতে থাকে।

প্রতি মুহূর্তে তাদের আগমনসম্ভাবনায় আমি সশঙ্কিত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যক্রমে ক্রমাগতই প্রমাদ ঘটা স্বাভাবিক। সিনিয়র চৌধুরী আমায় কেন্দ্রচ্যুত লক্ষ করে সে-দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি কোথায় যাই? সর্বত্রই তাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে থাকে। যেকোনো গোপন স্থান থেকে তারা আমায় টুঁড়ে আনতে পারবে। কেননা, গোলাপের সহোদর আমি কখনো আত্মবঞ্চনা বা প্রতারণা শিখিনি।

ভীতিকর সেই বিশাল ভবনের বাইরে এসে দেখলাম, বৃক্ষকুল আর ছায়া দিতে চায় না। তাদের ছায়া কেবল তাদের পদপ্রান্তে পড়ে থাকে। যদিও জানা আছে, ক্রমাগতই তারা বিস্তৃত হতে থাকলে আমার কোনো প্রয়োজনে আসে না।

এখানে-সেখানে ইতস্তত জনসমাগম কেবল আমার অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে তোলে। অনুভূতি এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, বৃক্ষপত্র পতনের শব্দও, মনে হয়, কান এড়াবে না।

দূর থেকে আমায় দেখতে পেয়ে ওরা দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে। প্রত্যেকের মুখে দুশ্চিন্তা এবং আশা পাশাপাশি রয়েছে। বর্ণময় গোলাপকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে ওদের সঙ্গে আসবে, আমি জানতাম। সেই মুহূর্তে আমার কেমন ক্রোধ হয়। কেন সে ওদের সঙ্গে আছে? এ কি আমাকে ঘৃণা করার, আমাকে ত্যাগ করার কৌশল মাত্র?

আমার বিবর্ণ মুখমণ্ডল তাদের কাছে কোনো কথাই গোপন রাখে না। ফলে আমি যখন উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টায় বলি, মনে হয় অ্যাডভোকেট আহমেদ তোমাদের আরও বেশি কাজে আসবেন, তখন সেখানে বিন্দুমাত্র আনন্দের সঞ্চার হয় না। আমি গোলাপকে লক্ষ করতে থাকি। সে বিস্মিত, বিভ্রান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি বুঝি ওর অপরিচিত অথবা এ আমার পরিহাস, সম্ভবত সে এসব কথাই ভাবে।

এমন করে চলে না, ওদের মধ্যে কে একজন বললো। আমি দেখি তাদের মুখে রক্তবর্ণ উঁকি মারে। আর সেই অগ্নির সম্মুখে দণ্ডায়মান আমি দগ্ধ হতে থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কিন্তু কেন এমন হবে, আর একজন বলে।

তাদের প্রত্যেক চোখে অবিশ্বাসীর দৃষ্টি। ঘৃণাও বুঝি আছে। কিন্তু আমি সে-সব লক্ষ করি না, যেহেতু জানা আছে, ওরা কত সংবেদনশীল, অতএব আমি সব বুঝিয়ে বলতে থাকি।

অসন্তোষ নীরব হয়, ক্রোধ বিদূরিত। কেবল যোজনব্যাপী হতাশায় তারা আচ্ছন্ন হয়। কী উপায়!

গোলাপের মুখাকৃতিতে তখন আর কোনো বিস্ময় ছিল না। বিষণ্নবদন সে ধিক্কারে গ্লানিতে ক্রমে সকলের পিছনে সরে যায়। মনে হয়, আমার অগৌরব, অপমান, অক্ষমতা সমস্ত তাকেই বিদ্ধ করছে। সে যদি পারত, তাহলে এই মুহূর্তে আপন অবয়বকে ধূলিহীন করে দিত।

অথচ তার এই ভাব আমাকে কেবলই প্রাণহীন করে দিতে চায়। সে যদি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করে ধিক্কার দিয়ে বলত, ছিঃ মনি, তুমি এই! এই তোমাকে আজীবন জেনেছি, এই তোমাতে আমি আশ্রয় খুঁজেছি। তাহলে বরং আমি তার হাতে হাত রেখে অনুনয় করে বলতাম, গোলাপ আমায় ক্ষমা কর ভাই।

কিন্তু সে তেমন কিছুই বলে না, কেবল বোঝা যায়, আমাদের মাঝে শূন্যতা দিগন্তবিস্তারী হচ্ছে যা কেবল বিচ্ছেদের ইঙ্গিত বহন করে।

আমি বাইরে রয়ে গেলাম। গোলাপকে যতবার চোখে দেখা যায় তত বেদনা বাড়ে। সে এখন গমনোন্মুখ অতএব তার সঙ্গে এখানেই শেষ সাক্ষাৎ করা যাক। আমি স্থির জানি যে, এই বিদায়কালে সে-ও কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না। ফলে, আমাদের আবাল্য অবস্থানের স্মৃতি উভয়কে বিমনা করে দিলে আপন অপরাধবোধ আরও তীব্র হবে।

আমি হৃদয়ে অনুভব করেছিলাম, গোলাপকে আর রাখা যাবে না। কেবল আত্মগ্লানির জন্য নয়, তার বাসনা পূর্ণ করতে পারা যায়নি বলে নয়, প্রতিদিন তার সম্মুখে নিজেকে ধিক্কার দিতে পারব না বলেই একটি সহজ বিচ্ছেদ বরং অধিকতর সহনীয়, যদিও জানা আছে গোলাপহীন আমার পরিচয় জনসমক্ষে উচ্চারণ করা যাবে না।

আমি এ-ও জানতাম, যদি ইচ্ছা করি, গোলাপ আমার ভালোবাসার জন্য নিজের অবয়ব বদলাবে, বাসনার পরিবর্তন ঘটাবে, পরিবর্তিত অবস্থার দাসত্বেও সে আমার মানসপ্রতিমা থাকতে পারে, কিন্তু আমি তা চাই না। অক্ষুণ্ন, অখণ্ড, অপরিবর্তিত গোলাপ যেন অপরেরই মনোলীনা হয়, সে যেন অন্যের হৃদয়ে বাস করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লৌকিক অর্থে এ আমার কর্তব্যও ছিল যেহেতু সকলেই স্বীকার করেন, গোলাপরা চিরকাল থাকে না, কোনো এককালে অপরের হস্তগত হয়ই।

সে-জন্যই আমার এই উদ্যোগ এবং তখন আমি তার পদধ্বনি শুনে চকিতে ফিরে দাঁড়ালাম। সখীজনপরিবেষ্টিতা গোলাপ আমার সম্মুখে আসতে থাকে। তার পদক্ষেপ অসমান এবং বিলম্বিত। জ্বলন্ত প্রদীপশিখা বায়ুতাড়িত হয়ে আপন অঙ্গকে অনবরত অত্যাচারীর ইচ্ছার অভিমুখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরলে সেখানে যেমন এই আলো এই আঁধারের সৃষ্টি হয় আর পরস্পরের মুখমণ্ডল বিস্মৃতি ও স্মরণের পারে এসে খেলা করতে থাকে, এখন এখানেও তেমনি ঘটে চলে।

তাকে আমি দেখলাম বিষাদময়ী প্রতিমা; যদিও নবসাজে সজ্জিতা তাকে রাজেশ্বরী মনে হয়। সে সজলাশ্রু, কম্পিতা, নিরালম্ব আর আমার কণ্ঠ শেষ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ প্রস্তুত করতে চায়, আর আমি পারি না, গোলাপ ক্ষমা কর্, গোলাপ যাস্ না।

সে আমার কাছে এলে আমি তাকে বক্ষে ধারণ করি। সেই ক্লান্ত, প্রভাহীন মুখশ্রী আবার আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি আবেগে, দুঃখে, স্নেহে, ভালোবাসায় তার মস্তকে আপন কপোল ন্যস্ত করি।

কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নেই। সে অপরের মনোবাসিতা। আমি ধিক্কৃত। আমি অস্ফুট, অব্যক্ত, ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করি, আর দেখা হবে না গোলাপ।

যাওয়ার মুহূর্তে, আমার বক্ষ ত্যাগ করে সে দাঁড়াল আর আমি হাহাকারের মতো শুনতে পেলাম, মনি, তুমি কি আমায় নির্বাসনে পাঠাচ্ছ?

আমি বললাম, না গোলাপ, বনবাসী হলাম আমি। এই মরুময় উদ্যানে একটিমাত্র পুষ্প বিকশিত ছিল। তার অভাবে উদ্যান এখন অরণ্যে পরিণত হলো; আমি অরণ্যবাসী হলাম। কেবল ভয়াল শ্বাপদ আর স্থবির বৃক্ষের রাজত্ব স্থাপিত হলো এখন।

তবে গোলাপ, যদি কখনো আকস্মিক এক ঝড়ের শেষে বৃক্ষপত্রের অন্তরাল থেকে সুনীল আকাশ মুখ বাড়ায়, তখন মনে পড়বে, তুমি ছিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ক্রীতদাসী বাসনা

মাত্র তিন দিন আগে যে-প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করে কৃতার্থ ছিলাম, এইমাত্র তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি।

কোনো শব্দ ব্যবহার করে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারি? সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ওলটপালট করেও কিছু মিলবে না জানি, তাহলে বরং বলি, এই ভীষণ শোক-সংবাদ অবিশ্বাস্য! আমাদের একমাত্র সুহৃদ যে স্বপ্নের গাড়িতে, ঘুমের দোলনায় বসিয়ে এই স্বল্পকেশকাল অবধি সকলকে সঙ্গে করে এনেছে তাকে হারিয়ে ফেলেছি ভাবতে পারি না।

সম্ভবত আরও স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন কেন তাঁর মৃত্যু রহস্যজনক। কেননা, আমরা জানতাম, তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান না করলে মৃত্যু কখনো তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি নিমন্ত্রণ না জানালে ব্যাধি কখনো তাঁর অঙ্গে আসন পাততে পারবে না। তিনি স্বাগত না জানালে দুর্ঘটনা তাঁর পরিচিত ব্যক্তিটিরও ত্বক স্পর্শ করতে পারবে না। তাহলে তিনি গতাসু কেন?

কেন, কিসের, কার শক্তিতে তিনি কালজয়ী হয়েছেন? কেউ আমাদের এমন প্রশ্ন করলে সমস্বরে উত্তর দোব,— বাসনার! দীপ্তিময়ী বাসনার! হৃদয়েশ্বরী বাসনার। সেই বাসনা, যাকে তিনি আমাদের সকলের সম্মুখে, সকলকে পরাজিত করে, হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। সেই বাসনা, যে আমাদের প্রত্যেকের বক্ষে মস্তক ন্যস্ত করতে চেয়েছিল, প্রত্যেকের অধর স্পর্শ করতে চেয়েছিল, প্রত্যেককে রক্ত থেকে বীর্য আহরণের প্রেরণা দিয়েছিল আর অবশেষে এই ক্লীবকুলের সম্মুখ দিয়ে তার নগ্ন, আলৌকিক, দ্যুতিময় দেহ নিয়ে প্রিয় বন্ধুর কণ্ঠলগ্না হয়েছিল।

না, সেই দাহিকা, চিত্তময়ী বাসনার কথা পরে বলা যাবে। এই মুহূর্তে আমার স্মরণ হচ্ছে, বিগত কিছুকাল থেকে আমি তাঁকে সাময়িকভাবে হলেও অন্যমনা সন্দেহ করে শিহরিত হয়ে উঠেছি কখনো কখনো। বিদ্যুল্লতার ন্যায় স্মরণ হলো, কখন যেন তাঁর অক্ষিপটলে বীতস্পৃহার ছায়া ভাসতে দেখে আশঙ্কায় হিম হয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যুকে এবার ডাকা প্রয়োজন? না, তা কখনো সম্ভব নয়। বাসনাময় পুরুষের মৃত্যু কখনো সম্ভব নয়। তবে?

রাত গাঢ় হয়ে আসছে। সন্ধের দিকে তিনি মারা গেছেন শুনেছি। তারপর থেকে যেন অচেতন হয়ে বসে আছি। রাস্তা দিয়ে নিঃশব্দ চাপা চিৎকার তুলে মাঝে মাঝে অটোরিক্সা ছুটে যাচ্ছে। কখনো বড় রাস্তা থেকে হর্নের আওয়াজ শোনা যায়। দূরের রেলওয়ে ট্র্যাকে ডিজেল ইঞ্জিনের কণ্ঠরুদ্ধ গর্জন রাতের শেষ ট্রেন চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এই সব শব্দের কথা এত বেশি করে বলা এই জন্য যে, নিঃশব্দ চরাচরেই কেবল রাত্রির কর্ণবিদারণকারী স্তব্ধতা বিরাজ করে। আর ঠিক এই সময়েই এতকাল ধরে তাঁর বাড়িতে আমাদের নৈমিত্তিক সম্মেলন হতো। আজও হওয়ার কথা ছিল।

আমি এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কারণ, তাঁর অনুপস্থিতিতে সমস্ত নিয়ম পালটে যাবে এ কেউ চায় না।

রোজকার মতন তাই আমি উঠে সব ঘর ঘুরে দেখলাম। না, কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই। আমার ধর্ম সাক্ষী রেখে বিবাহিতা স্ত্রী যথারীতি টেলিভিশনের পর্দা নিভিয়ে রেখেছেন। জ্যেষ্ঠ কন্যার কৃতিত্বের বাহক সেতারটি কাপড়ের মোড়কে আবদ্ধ হয়ে দিব্যশরীরে দেয়াল আলো করে রেখেছে। মেধাবী পুত্রদ্বয় পরীক্ষার পড়া শেষ করে ঠিক ঠিক আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আবছা নীল আলোয়, সূক্ষ্ম জালের মোহে আবদ্ধ রমণী বহুব্যবহৃত নিতম্ব উন্মুখ রেখে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে তৃপ্তি দিয়ে, নিরবয়ব প্রশান্তির হাসি তার আপাত-অচেতন দেহের ওষ্ঠে বিকশিত রেখে তবেই আমি ঘর থেকে বেরোতে পারি।

রাস্তায় নামতে প্রতিদিনের মতোই উত্তরের সেই হাওয়া এসে আমার পথ আটকাল। তারপর, আমার খেলা দেখো, এই কথা বলে শূন্য মুড়ির ঠোঙাটা তুলে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে সামনে এগিয়ে রাস্তার মাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাত জাগা পাখিটা 'কুক্ কুক্' শব্দ করতে করতে মাঝরাস্তায় শুয়ে থাকা নেড়ি গলা তুলে দীর্ঘ, চিকন, কাঁপা স্বরে অনেকক্ষণ ধরে ঘে-এ-এ-এ-উ-উ-উ রব তুলল। ভীত পাহারাওয়ালা তৎক্ষণাৎ কোনো প্রাসাদের পেছন থেকে হে-এ-এ-ই করে তার ভয়কে সাবধান করে দিল।

সবই প্রতিদিনের মতো ঘটে যাচ্ছে অথচ তিনি নেই, তাঁকে গিয়ে দেখতে পাব না ভাবা যায় কী করে।

এইখানে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। 'তিনি', 'তাঁকে' প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করছি বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, মৃত বন্ধুর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমাদের সম্পর্ক এমনি সাজানো ছিল। না, আদৌ না। আমরা পরস্পরকে যত রকম ঘনিষ্ঠতম সম্বোধনে ডাকা যায় ডেকে শেষ করে দিয়েছি। বর্তমান ব্যবহার কেবলমাত্র মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা আর আমাদের ভালোবাসার চিহ্ন।

শৈশবকাল থেকেই বাসনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। শক্ত রশি দিয়ে যে বয়সে ইজের কোমরে আটকে রাখতে হতো, বলতে কী, সেই বয়সেই বাসনার সঙ্গে আমরা সম্মিলিত হয়েছিলাম, তারপর ক্রমে ক্রমে আমাদের বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে প্রত্যেকের দৃষ্টিতে ঈর্ষা আর অন্তরে অক্ষমতার বীজ বপন করে সে অপরের মনোবাসিতা হয়েছে। দু'একটি স্মৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

আমাদের শৈশব-নিকেতন প্রকৃতই সকলের জন্য আদর্শ হতে পারে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, গোলাপজাম, পেয়ারা, নোনাফলের বেষ্টনীতে আবদ্ধ কুটিরনিচয় অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বহির্বাটিতে সযত্নে রক্ষিত বাঁশের ঝোপ, পাথরকুচি ও মেহেদির বেড়া, কালকাসুন্দী আর ভাঁট ফুলের জঙ্গল, সুউচ্চ ঘোড়ানিমের শীর্ষে কনকলতার বাহার যেন একটি স্বর্গ নির্মাণ করেছিল। আর এমন পরিবেশে যে-ভাবে বেড়ে ওঠা প্রয়োজন তেমনি করেই বেড়ে উঠেছিলাম সকলে। বুদ্ধিমান, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, শান্ত, পিতামাতার গর্ব। পক্ষান্তরে, মৃত বন্ধু সমগ্র গ্রামপঞ্চায়েতের বিরাগভাজন ক্রীড়াসঙ্গিনীবর্গের চোখের মণি এবং সমবয়স্কের আদর্শস্থল ছিলেন।

একবার তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কয়েক গুচ্ছ লিচুর উৎকোচে বশীভূত করে দ্বিপ্রহরের দুই ক্রীড়াসঙ্গিনীকে আসন্ন সন্ধ্যায় গৃহস্থালির মহড়া দিতে রাজি করিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের এই দুর্দান্ত, অদান্ত বন্ধু সমগ্র ক্রীড়াকালে একবারও আমাকে স্বামীর পদ অধিকার করতে দেননি।

আর একবার, পাকা নারকোল-কুলের সম্ভারে অবনত বিষবৃক্ষে আরোহণ না-করে ফল পাওয়া যায় কি-না অথবা কাঁটার বিষ শরীরে কী পরিমাণ জ্বালা ধরায় এমন ভাবছিলাম। ঠিক এই সময় কোথা থেকে ছুটে এসে বন্ধুবর কয়েক মুহূর্তে গাছের মগডালে চড়ে বীজগুলো কেবল আমার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

এই সব অতি সাধারণ ঘটনা আর উল্লেখ করে কী হবে! সমগ্র জীবনে এই সব উদাহরণ এত ছড়ানো যে, তার মাত্র কয়েকটি বিবৃত করলেও বিরক্তি উৎপাদন করবে অপরের।

যৌবনে পদার্পণ করে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, শৈশবের সঙ্গিনী– বলা যাক জন্মসঙ্গিনী বাসনা, সর্বাপেক্ষা সহজলভ্যা বাসনা আর আমাদের মাঝে দুস্তর পরিখা। অপর পারে যাওয়ার অধিকার কেবলমাত্র বন্ধুবরেই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে এমন দিন উপস্থিত হলো যখন স্পষ্ট করে বাসনাকে জানানোর প্রয়োজন দেখা দিল যে, আমরা কে বাসনার জন্য কী করতে রাজি আছি। সার্থক ব্যবসায়ী, পসারসমৃদ্ধ আইনজীবী, উচ্চপদাসীন রাজকর্মচারী, প্রথিতযশা সাহিত্যিক সকলেই আমরা বাসনাতে নিহিত ছিলাম। এই জন্য, আমরা এই সব সম্ভাবনাই তার সামনে প্রসারিত করলাম যখন বাসনা প্রশ্ন করেছিল, তুমি আমায় কী দেবে? আমার ইচ্ছা ছিল বলি, 'ছিন্ন বাধা পলাতক বালকের মতো' সমস্ত দ্বিপ্রহরের বনে-বনান্তরে ফিরে সেই রৌদ্রদগ্ধ অবয়বই কেবল উপহার দিতে পারি। কিন্তু আমি তা বলিনি, পরিবর্তে এই কয়েক মুহূর্ত পূর্বে পরিত্যক্ত রমণীসহ আবেষ্টনের অঙ্গীকার করেছিলাম। সকলেই একই পথে বিচরণকারী অতএব বলতে বাধা নেই, পরবর্তী জীবনেও আমরা আমাদের প্রতিশ্রুত আত্মবঞ্চনা থেকে বিচ্যুত হইনি।

অবশেষে বরমাল্য নিয়ে বাসনা তাঁর সম্মুখে এলে তিনি সহাস্যে বললেন, আমি সমগ্র জীবন কেবল পরস্ব লুণ্ঠন ও পরদা হরণ করব, আমার শীৎকারধ্বনি ত্রিভুনব্যাপী হবে এবং আমি কখনো নগ্ন, কখনো সুবেশ প্রভৃতি অবস্থায় জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করব!

বাসনা তৎক্ষণাৎ সেই মাল্য তাঁর কণ্ঠে অর্পণ করেছিল।

এইভাবেই বাসনাকে হারিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু তিনি তো স্বার্থপর, নিষ্ঠুর নন। তিনি বুঝেছিলেন, বাসনাহীন জীবন মৃত্যুকে আহ্বান করে, কেউই সেই অবস্থায় দীর্ঘজীবী হয় না অথচ তাকে জয় করবার ক্ষমতাও নেই কারো। তখন নিজেই তিনি এই নিশীথ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। কাছে না পেলেও তাঁরই মধ্য দিয়ে বাসনার সান্নিধ্য উপভোগ করতাম আমরা।

প্রতিদিন তাই একই সময়ে শুরু হতো আমাদের সকলের নিশীথ অভিসার। বাতাস তার খেলা দেখিয়ে চলে গেলে ডাক পড়ত অন্ধকারের। সে পত্রবহুল বৃক্ষের শীর্ষে, নিরেট দেয়ালের আড়ালে, রাস্তার কালো অ্যাসফল্টের সহযোগিতায় আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করত। আমরা সব খেলার শেষেই হাততালি দিয়ে তাঁকে বাহবা জানাতাম। তারপর তুড়ি মেরে, সশব্দ হাস্যে অমানিশাকে কম্পিত করে পথ অতিক্রম করতাম।

আরও ছিল নিদ্রা ও ভয়কাতর প্রহরীর দৌরাত্ম্য। প্রথম আমাদের পরমাত্মীয়া যদিও, দ্বিতীয় কোনোদিন আমাদের বস্ত্রের রঙটুকুও দেখতে পেত না, তবুও তার সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের গায়ে প্রস্ফুটিত গোলাপশাখার ছায়া দুলত, তার আড়ালে আত্মগোপন করতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বন্ধুর বাসস্থানে পৌঁছবামাত্র আমাদের একান্ত সংবর্ধনালাভ হতো। বাসনা স্বহস্তে গোলাপের পাপড়ি বিছিয়ে, আমাদের জন্য আসন প্রস্তুত করে রাখত। কোনোদিন হয়তো সম্পূর্ণ ফুলটিই প্রত্যেকের রাজাসন হয়ে উঠত। আমরা এক একজন কাণ্ড থেকে শাখায়, শাখা থেকে বৃন্তে, তারপর কোরকটির মধ্যে গিয়ে জাঁকিয়ে বসতাম।

পরবর্তী কার্যকলাপ আরও হৃদয়গ্রাহী, আরও মনোরম হতো। দীর্ঘদিনের সাহচর্যে তিনি আমাদের সবই জেনে ফেলেছিলেন। আমরা যে বাসনাকে লাভ করার জন্য আত্মপ্রবঞ্চনা করেছিলাম অবশ্যই তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। ফলে, আমরা অবাধে আমাদের সেই সব অপূর্ণ কামনার শিখাকে আরও লেলিহান করতে পারতাম। সেই গভীর নিশীথে আমাদের জন্য একান্ত উদ্যানে নদী, সূর্যের গোপন প্রখর কিরণ, উন্মুক্ত উদার প্রান্তর, কুঞ্জছায়া এবং মনোনীতা শত রমণীর সন্নিবেশ ঘটাতে তিনি কখনো কার্পণ্য করতেন না। বস্তুত, আমরা এই সবই তাঁর কাছে চাইতাম। আর চাইতাম বলেই আমাদের সমাদর। কেননা, কামনাহীন, তৃপ্ত কোনো পুরুষের ঠাঁই বাসনার কাছে ছিল না।

এই হচ্ছেন আমাদের বন্ধুবর যিনি এখন মৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে। না, এ কখনোই সম্ভব নয়। আমি অমোঘ সত্যের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করলাম এ কখনোই সম্ভব নয়। পাছে আমার এই বিশ্বাস ভেঙে যায়, এই ভয়ে, এই প্রথম, সুদীর্ঘকালে সর্বপ্রথম মাঝপথ থেকে ফিরে এলাম।

অথচ ঘুম আসে না। এই ধরনের রাত্রিজাগরণ আমাদের কাছে আদৌ নতুন নয়। কবে থেকে ঠিক স্মরণ নেই, বার্বিচুরেটের মহিমা আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। যে সময়টুকু বন্ধুবরের আশ্রয়ে কাটানো যেত সেটুকু ছাড়া সমস্তটাই কাটত তারই নিগ্রহে।

আজকেও সেইরকম কিছু একটা করব ভাবছিলাম। কিন্তু হাত ওঠে না, শরীরটাও তোলা যায় না।

এমন অবসাদ বহুকাল ধরেই দেখা দিচ্ছে। অফিসে ডিরেক্টরস্ বোর্ড-এর সভায় ভাষণ দেবার পর সমস্ত শরীর যেন কুঁকড়ে আসতে চায়, চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারি না। বান্ধবকুলের মুখমণ্ডল সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থের পুস্তানি-পৃষ্ঠার মতো দেখায়। ক্লাবের টেনিস লনে, বিলিয়ার্ডস-এর টেবিলে, ব্রিজের আসরে, হলের লাউঞ্জে, ড্যান্সের ফ্লোরে সর্বত্রই একই ব্যাপার। বছরে একাধিকবার স্টেডিয়ামে ক্রিকেট-পিকনিক হয়, আমাদের নিয়মিত উইকলি, মান্থলি, ইয়ারলি পিকনিক ছাড়াও কিন্তু আমাদের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা কেবল নিশীথ অভিসারের। একদিনের ব্যতিক্রম, মনে হতো, নিরবয়ব করে দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন আগে আমরা শেষ সাপ্তাহিক ভোজে মিলিত হয়েছিলাম। সেখানেও একই ব্যাপারের মুখদর্শন।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা পরস্পর কুশলবিনিময় করলাম। পরস্পরের পুত্র-কলত্রের খোঁজখবর নিলাম, তারপর আর কোনো কথা খুঁজে পাওয়া যায় না যা অপরকে উদ্বেলিত করে। প্রখর আলোয় কিছুতেই বাসনার কথা আলোচনা করা যায় না। সহস্র চক্ষু সর্বত্র, বিশেষত বাসনাকে যখন আমরা প্রকৃতপক্ষে ত্যাগই করেছি।

দীর্ঘকাল টেবিলে স্থির হয়ে বসে কেবল কাটলারির শোভা দেখলাম। তারপর কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে উঠে পড়লাম।

এইরকম ঘটে চলেছে অনেক কাল, তবু শেষ আশ্রয় ছিল বাসনা। রাত্রির কায়াহীন প্রশান্তিতে, শৈশবের কুয়াশায়, কৈশোরের বকুলতলে, যৌবনের দগ্ধভূমিতে বিচরণ করে কেবলমাত্র তারই কথা স্মরণ করে বক্ষের স্পন্দনকে উৎসাহ দিয়েছি।

রাত্রি আরও ক্ষণজীবী হচ্ছে। শব্দের প্রভাব এখন আর কিছু নেই। ভয়ঙ্কর গরম লাগছিল। এয়ারকুলারটা সম্ভবত ঠিকমতো কাজ দিচ্ছে না। ঘামে ভিজে উঠছি মনে হলো।

গাউনের রশিটা পুরো খুলে দিলাম। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালে রাত্রির মলিন ফুলদল অদূর উদ্যানে প্রায় মুখ দেখাতেই চায় না।

তিনি কেন চলে যাবেন? আমরা না হয় যাকে চেয়েছি তাকে পাইনি— সে অপরের আয়ত্তে গেছে কিন্তু তিনি তো বিজয়ী!

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তার হিসাবের প্রবৃত্তি ছিল না। এরপর কী করি ভাবছি যখন, চকিতে মুহূর্তের তীব্র শিখার মতো অচিন্ত্য, অসম্ভব, কৃতান্ততুল্য কথাটি ভেসে গেল। তাহলে কি তিনি সত্যিই মৃত? তাহলে কি বাসনা তাঁকে—?

মুহূর্তে ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে বাগানে পড়লাম। গুরুভার পতন শব্দে ভৃত্য ও মালাকরের দল ঘুম ভেঙে 'কে' 'কে' চিৎকার সমাপ্ত করার পূর্বেই আমি রাস্তা দিয়ে ছুটতে শুরু করেছি। অনিদ্রা, স্বেদ, নৈশব্দ কিছু তখন মনে নেই।

মণিময় হর্ম্যের দ্বারে পৌঁছে গেলাম ক্ষণিকেই। ঠিক আমারই মতন সেই একই বিন্দুতে ছুটে এসেছেন আর সকলে, দেখলাম। তেমনি অনিদ্র, স্বেদকম্পিত, ধূলিলিপ্ত বসন।

বিশাল ভবনের কোথাও আজ দীপ নেই, দীপান্বিতা কেবল স্মৃতি। সমগ্র চরাচরের মতোই তার অন্তর ধ্বনিশূন্য, দীপ্তিশূন্য, জনশূন্য!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

খোলা দ্বারপথে বাতাসের হা হা রব আছড়ে পড়ে।

বাগানে আজ কোনো গোলাপ নেই, একটি পাপাড়িও লভ্য নয় কোথাও। একটি বৃক্ষও যেন আমূলপ্রোথিত নয়।

আর সেই তরুহীন, পুষ্পহীন উদ্যানে ক্ষীয়মাণ চাঁদের আলোয় শায়িত তাঁর অলৌকিক দেহ!

সমস্ত ধমনীতে রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জানলাম, কেবল জানুর অস্থি নয়, সমগ্র দেহ সহস্রবার বিচ্ছিন্ন করে আবার নির্মাণ করা যেত যে চিরদাসী বাসনার, সে সকলকে ছেড়ে চলে গেছে!

অকস্মাৎ প্রবল বর্ষণ তারপর ক্রামগত রোদন করে চলে, হায় বাসনা! হায় বাসনা!!

আমি জেনেছিলাম, পরিপূর্ণ যৌবনকালেই মা একাকী হয়েছিলেন। আমার পিতা, যাঁর মুখাবয়বও এখন আমি স্মরণে আনতে পারি না, অন্তত এটুকু আত্মজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যার বলে তিনি আমাকে মা-র কোল থেকে সরিয়ে নেননি। সম্ভবত, পরবর্তী বিবাহিত জীবনে আমার অনুপস্থিতি তাঁর কাম্যও ছিল।

যাই হোক, নিসঙ্গ জীবনে আমিই আমার মা-র একমাত্র সঙ্গী ছিলাম। এ-কথা আমি বলব না যে, তিনি আবার বিবাহ না-করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। অত কৃতজ্ঞ আমি হতে পারব না। বরং পরিণত বয়সে আমি ভাবতাম, যদি সেইকালে আমার সমস্ত ব্যাপার বুঝবার ক্ষমতা থাকত তাহলে স্বেচ্ছায় তাঁকে সুখী করার দায়িত্ব নিতাম। যে-কালে সেই জ্ঞান আমার হলো তখন আর কিছু করার ছিল না।

পাছে এই সব ভেবে আমি কষ্ট পাই এবং নিজেকে অপরাধী মনে করি সেই জন্য সেই পরম বিবেচক, সম্মানী মহিলা– আমার মা, বুঝবার মতো ক্ষমতা হবার পরই আমায় জানিয়েছিলেন যে, আসলে আমার জন্য তাঁর ত্যাগ স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বিশুদ্ধভাবে নিজের জন্য, আপন ইচ্ছা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য, এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। আমি বরং তাঁর উপকারই করেছি একাকী জীবনের সঙ্গী হিসেবে।

ঠিক সর্বজয়ার মতন করে তিনি আমায় মানুষ করেননি এ তো দেখাই যাচ্ছে। এবং আমারও ইচ্ছা ছিল না যে, এককালে অপুর মতনই আমি তাঁকে নিশ্চিন্দিপুরের কুঁড়েঘরে একলা ফেলে যাব। তবুও ম্যাট্রিক পাস করবার পর আরও বড় শহরে না-গিয়ে উপায় ছিল না। অপুর সঙ্গে আমার তফাত হলো এই, আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মামা আমাদের দুজনের খুব কাছাকাছি এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছিলেন। এবং শহরে যাবার আগে আমার দ্বিধাহীন বিশ্বাস ছিল, পুত্রের অবর্তমানে মামা তাঁর ভগ্নীর কোনোরকম অসুবিধা ঘটতে দেবেন না।

শহরে যাবার আগে মা আমার হাতে জনৈক অধ্যাপক চৌধুরী-র নামে একখানা চিঠি– তাঁর ঠিকানাসহ, দিয়ে দিয়েছিলেন। সারা জীবনে যিনি কারো কাছে সামান্যতম করুণা প্রার্থনা করেননি তিনি কেন জানি না, কয়েক ছত্র লেখার মধ্য দিয়ে আপন পুত্রের শুভাশুভ অপরের হস্তে ন্যস্ত করলেন। তবে জানতাম, অধ্যাপক চৌধুরী এই শহরের অধিবাসী ছিলেন এককালে।

বড় শহরে এসে অধ্যাপক চৌধুরীকে খুঁজে পেতে আমায় মোটেই কষ্ট করতে হয়নি। তাঁরই সুচারু ব্যবস্থায় অন্যান্য সমস্যাও আমার কাছে অনেক সহজ হয়ে এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে, উচ্চশিক্ষার জীবনে অধ্যাপক চৌধুরী আমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন যে, বয়সের অসমতা সত্ত্বেও তাঁকে আমার পরম বন্ধু বলে ভাবতে ইচ্ছা করে। আমি অসঙ্কোচে এবং কোনোরকম গ্লানিবোধ না করে বলতে পারি, তিনি না-থাকলে আমার পক্ষে আদৌ কোনো পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না। তাঁর সঙ্গে আমার দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি, কেবল তাঁর উপদেশ, নির্দেশ, প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্বল করেই আমি যেহেতু সমস্ত পথ পাড়ি দিয়েছি, সেই জন্যই আমাদের সম্পর্কে কোনো গ্লানিমার ঠাঁই রইল না।

অতএব আমি সমগ্র জীবনে আমার মা ও অধ্যাপক চৌধুরী এই দুজনের প্রিয় থাকার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলাম। কোনো হঠকারী চিন্তা, চিত্তদৌর্বল্য প্রভৃতিকে স্থান দিয়ে আমি এঁদের মনোবেদনার কারণ হতে চাইনি। এবং এই জন্যই প্রিয় রমণীর প্রসঙ্গে আমি এত দ্বিধান্বিত।

আমি নিজেকে কখনো অসাধারণ ভাবতে পারি না। অধ্যাপক চৌধুরী আমায় শিখিয়েছেন, তোমার চিন্তা, কাজ আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা– এ-সমস্ত যে একান্তভাবে তোমারই এ-কথা ভেবো না। তুমি বলতে পার না, তোমার আগে– তোমারই পথে ভ্রমণ করে আরও কত জন যন্ত্রণা অথবা আনন্দ অনুভব করেছেন।

এই সমস্ত কথাই আমি প্রিয়তমাকে বোঝাচ্ছিলাম। আপাতত যদিও সে আমার সামনেই বসে আছে কিন্তু আমি জানি, এই দিন এবং এই সান্নিধ্য বহুবিলম্বিত করা যাবে না। আর 'করা যাবে না' এই কথা ভাবতেই আর্ত বেদনায় সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর অসুস্থতা অনুভূত হতে থাকে।

তবুও আমি ওকে বললাম, দেখো, আজ আমরা মনে করছি আমাদের দুজনের সম্মিলিত পৃথিবী সর্বোত্তম সুখের স্থান হবে। কিন্তু তুমিও জানো না, আমিও বলতে পারব না, সেই সুখ কতকাল স্থায়ী হবে। এমন তো হতে পারে যে, ক্ষণজীবী সুখকাল অতিক্রান্ত হবার পরে তুমি আমাকে অথবা আমি তোমাকে ঘৃণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে শিখব! তোমার আরও আলাপী আছে, আমারও অনেক আলাপিতা আছে, তাই কোনো সময়ে আমরা তো ভাবতেও পারি, এ না হয়ে অমুক যদি আমার জীবনে আসত তাহলে জীবনের চেহারাটা পালটে যেত। তখন সর্বাপেক্ষা বেশি যাকে ভালোবাসা যাচ্ছে সে-ই হবে আমাদের চোখে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। অত বড় কদর্যতার মুখোমুখি হতে আমরা কেউই পারব না। সেই জন্য বরং আমাদের পরিচয়কে অস্বীকার করাই শ্রেয়। আমরা নিজেদের পছন্দ-অনুযায়ী কাউকে নয়, সামাজিক পথে যে কাছে আসবে তাকেই বরণ করে নেব।

আমি সমস্ত কথা শেষ করে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করলাম। কারণ এইসব সময়ে নিজেকে কেমন অপরাধী আর দুর্বল বলে মনে হয়।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আমার চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। গ্লাসের পানীয়ে আঙুল ডুবিয়ে নানারকম নকশা আঁকল কিছুক্ষণ টেবিলের রঙিন কাপড়ে। তারপর নিঃশ্বাস মুক্ত করে বললো, তুমি বড় বেশি সামনের দিকে চেয়ে আছ। অতদূরে মানুষের দৃষ্টি যায় না।

আমি বললাম, কিন্তু হাতের কাছে যা আছে তাই কি তুমি নিঃসংশয়ে হৃদয়ে ধারণ করতে পার?

এবারে ও আর কোনোরকম বিচলিত ভাব দেখাল না, শেষ কথা বললো, তা ঠিক। তবু সব শেষের কথা হচ্ছে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, যার দাম আপাতত অনেক। তুমি সবকিছু আবার ভেবে দেখো। বলে সেদিনের মতো নিজের পথে চলে গেল।

তুমি তো আমায় ভাবতে বলে গেলে, এখন নতুন করে আমি কী ভাবব? এপিঠ ও ওপিঠ দু-পিঠই আমি ভালো করে দেখে রেখেছি। তোমায়ও বলেছি, এখন আবার কী করা যায়?

আমার আর ভাবনা করবার ক্ষমতা ছিল না বলে আর একজনের কাঁধে এই দায়িত্ব চাপাব স্থির করলাম। অধ্যাপক চৌধুরীর অজ্ঞাতে কোনো কিছু করবার প্রয়োজন কখনো দেখা দেয়নি। মনোবাসিনী মহিলার সম্পর্কে তাঁকে আমি বলেছি। কেবল তাকে নিয়ে আমার ভাবনার কথাগুলো এখনও গোপন রয়ে গেছে। অবশ্য আমি তাঁর পরামর্শ চাইনি বলেই তিনি তাঁর মতামত আমায় জানাননি, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

আমি যখন পৌঁছলাম অকৃতদার, প্রৌঢ় অধ্যাপক তখনও প্রায়ন্ধকার ঘরে বাতি জ্বালাননি। টেবিলের সামনে চুপ করে বসে ছিলেন। ওঁর নিশ্চয়ই স্মৃতির সায়র আছে, এমন সময়ে সেখানেই তিনি ডুবে যান বলে আমার বিশ্বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বিষণ্ন আবহাওয়াকে বিষণ্নতর করে তুলতে চাইছিলাম না। সেজন্য পেছন দিকের দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। রান্নাঘরের আলো এবং উনুন উভয় জ্বলছিল। পাচকের সঙ্গে বিভিন্ন রকম কথাবার্তায় সময় কাটাতে চেষ্টা করলাম।

তিনি বোধহয় আমার গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলেন। একটু পরে উঠে ভিতরে এসে এখানে-সেখানে কয়েকটা আলো জ্বাললেন। তারপর আমার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। আমিও হাসিতেই জবাব দিয়ে বললাম, খুব গভীর কিছু ভাবছিলেন নিশ্চয়ই।

কী করে বুঝলে?

এ সময়ে আপনি লেখাপড়া করেন না, আমি জানি।

হুঁ, ঠিকই। ভাবছিলাম, বুঝলে মানুষ কী বিচিত্র। কেউ কামনার উদ্দামতায় কাম্যকে জোর করে আয়ত্ত করে, কেউ বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে তাকে আত্মস্থ করে, আবার কেউ কেবল বাসনার নির্বাসন, কেবল স্বার্থত্যাগ, কেবল মঙ্গলেচ্ছা নিয়েই বেঁচে থাকে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনার জন্য এসব তো খুব জটিল সমস্যা নয়, তাছাড়া আমি আজ মানবচরিত্র নিয়ে আলোচনা করতেও আসিনি। বরং মানবজীবন সম্পর্কে কিছু গভীর তথ্য আলোচনা করবার আছে।

তাঁর সঙ্গে আবার আমি বসবার ঘরে গেলাম। তারপর সাধ্যানুযায়ী গুছিয়ে সব কথা ও সমস্যা তাঁকে বলবার চেষ্টা করলাম। শেষে তাঁর কী ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত জানতে চাইলাম।

কথা বলতে বলতে লক্ষ করলাম একটু আগের সেই হাসি আর ওষ্ঠপ্রান্তে নেই। অকস্মাৎ ক্লান্ত, অস্থির ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে। মুখমণ্ডলে কয়েকটি কঠিন, ভারাক্রান্ত রেখা স্পষ্ট লক্ষ করা যাচ্ছিল।

আসন ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ। আমি নিস্তব্ধ, অনড় হয়ে বসে রইলাম।

তিনি যে উত্তেজিত তা তাঁর আচরণ থেকেও বোঝা যাচ্ছিল। এই রকম উত্তেজনা তাঁর মধ্যে আমি খুব বেশি লক্ষ করিনি। প্রথম সাক্ষাতের দিন সম্ভবত তিনি এর চেয়েও বেশি বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমার বয়স ও তাঁর চেষ্টা সেই ভাবকে প্রকট করে তোলেনি।

একটু পরে তিনি বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। কিছু সময় আমি তেমনি বসে থাকলাম, তারপর উঠে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বারান্দার আলোটা জ্বালা ছিল না বলে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তাঁকে এক মহান মূর্তির মতো দেখা যাচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ফিরে তাকালেন না তিনি, বললেন, তাহলে তুমি ভাবছ ওকে তোমার জীবনের সাথে না জড়ানোই ভালো হবে?

হ্যাঁ, ভাবছি। তবে,– বলে আমি চুপ করে থাকলাম।

তাঁর নিঃশ্বাসপতনের শব্দ একটু দ্রুত শোনা যাচ্ছিল। বললেন, তোমার মনে হচ্ছে না যে, যা করতে চাইছ তেমন আর কেউ করে না অথবা তুমি অনন্য, একক?

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, না, তেমন ভাবি না। আপনার কছে জেনেছি, আরও অনেকে একই পথে হেঁটে গেছেন যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ে।

কেননা, তাঁরা কেউ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নন, বলে আবার তিনি হাঁটতে লাগলেন বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। মনে হলো, কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। একবার জোর করে গলায় শব্দ তুললেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, এমন মনে হচ্ছে না যে এই সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে?

ততক্ষণে তাঁর আবেগ আমাকেও স্পর্শ করেছে, জবাব দিতে গিয়ে আমারও গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেল, বহুদিনে আয়ত্ত করা স্থির চেতনা আর কিছুতেই বজায় রাখা যাচ্ছিল না। বললাম, ভাবছি, এমনও তো হতে পারে যে অল্পকাল পরেই আমরা বুঝব–

তিনি আমার মুখ থেকে কথা তুলে নিয়ে বললেন, যা ভাবা গেছিল তা হয়নি। কিসের শূন্যতা দিগন্তবিস্তারী। আর তখন–, এইখানে তিনি প্রাণপণে গলার স্বরকে সহজ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, আর তখন আপনাপন মূঢ়তাজনিত পরস্পরের প্রতি অভিমান সমস্ত জীবনের পরম দুঃখ বলে বিবেচিত হবে। সমস্ত সংসারকে উপেক্ষা করে সে হবে নিঃসঙ্গ, নির্বাসিতা, আর তুমি–

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না, শেষ করা সম্ভবও ছিল না, তাই আমিই সজল আবেগে, রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, আমি সারা জীবন নিয়তির মতো তাকেই ভালোবেসে যাব।

আর সেই ভালোবাসার প্রমাণ দেবার জন্য অনেক কাল তোমায় অপেক্ষা করতে হবে, যত দিন না সেই সামান্য অনুরোধের সুযোগ–

বলতে বলতে তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দা ছেড়ে বাগানে নেমে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাজীবন

রজব আলী বললো হুজুর, আপনার ঘরে বড় অন্ধকার!

আমি বললাম, বাইরে যে অন্ধকার সেটা বুঝি তোমার চোখে পড়ল না, রজব আলী?

রজব আলী জানালার পাশে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। দু'হাত দিয়ে চোখ মুছে নিচ্ছে তা-ও দেখতে পেলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, তাই তো, আগে ভালো করে ঠাহর করতে পারিনি। কিন্তু যখন ঘরে ঢুকলাম বাইরে বেশ দগ্‌দগে আলো ছিল হুজুর, নিজ চোখে দেখেছি।

সে বেশ ঘাবড়ে গেছে মনে হলো।

আমি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, ও চোখ আর বেশিদিন থাকবে না। বাইরে যতই আলো দেখে আসো না কেন, আমার ঘরে ঢুকলেই আঁধার! আসলে জানো, ঐ যে কালো মতো ট্রাঙ্কটা দেখা যাচ্ছে, ওটার জন্যই এত সব কাণ্ড। এইটুকু ঘর, অত বড় ট্রাঙ্ক!

রজব আলী চারদিক ভালো করে জরিপ করে নিয়ে বললো, আপনি বড় মজার কথা বলেন হুজুর, ঐ তো পুঁচকে বাক্সো, তার জন্য কি আর এত বড় ঘর অন্ধকার হয়ে যায়, না যেতে পারে।

আমি মাথাটাথা চুলকে বললাম, সত্যিই তো রজব আলী, কিন্তু তুমি তো নিজেই দেখছ ঘরটা কেমন অন্ধকার! আচ্ছা চলো, একবার বাইরে চলো দেখি।

দুজনে মিলে বাইরে বেরোতেই সেই দগ্‌দগে আলো চারদিক কুৎসিত করে রেখেছে দেখতে পাই।

আবার ঘরে ঢুকতে তেমনি আঁধার।

রজব আলী খুব চিন্তিত হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইল। খোলা জানালা-দরজাগুলো ভালো করে দেখল, তারপর আবার বসে রইল।

আমি বললাম, তা রজব আলী, তোমার ঘরে এমন হয় না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়ে সে বলতে চাইল, কক্ষনো না। কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, ভালো করে লক্ষ করিনি তো।

তুমি একবার ভালো করে দেখে এসে আমায় বলবে।

তা আর বলতে কী, নিশ্চয় বলে যাব। রজব আলী উঠে পড়তে চায়।

আর একটু বসে গেলে হয় না?

না, মাথাটা কেমন ঘুরছে।

আমি আবার রজব আলীর পিঠ চাপড়ে বললাম, আর বেশিদিন ঘুরবে না।

বনের ধারে মাঠে বসে রজব আলী 'ওরে ও নিঠুর কালা অন্তরে বিষম জ্বালা' গাইছিল। দিনের কাজ শেষ করে বসে ছিল সে। সেখান থেকেই আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে এনেছিলাম–

আমাকে দেখে প্রথমে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, আরে, হুজুর, আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন।

কোথায় যে ছিলাম দু'এক কথায় বুঝিয়ে বলা বড় শক্ত। তাই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে আমগাছের ছায়ার নিচে বসে পড়লাম। রজব আলী মাঠ থেকে উঠে আমার পাশে বসল।

আমি বললাম, অন্তরে জ্বালাটা কিসের রজব আলী? আর নিঠুর কালা কি সেই জ্বালার খবর রাখে?

লজ্জা পেয়ে সে বলে, এই হুজুর, গান হলো গিয়ে গান। মনে হলো গেয়ে নিলাম।

আমি বললাম, তা কি হয়! এই ধরো না, আমার তো মনে হয় না গানের কথা।

কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তখন আমার। পেছনে ফেলে আসা খাঁ খাঁ পাথার, শূন্য বাগিচা, ধুলো-ওড়া পথ আমাকে ছাড়তে চায় না তখনও।

রজব আলী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার মুখটায় বড় দুঃখ দেখা যাচ্ছে, হুজুর, চলুন গাঁয়ে ফিরি।

তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, তোমার দুঃখ নেই রজব আলী?

রজব আলী অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে বললো, ফসল পুড়ে গেলে, বানে ভেসে গেলে, ফসলের দাম না পাওয়া গেলে যখন পেটে ভাত ওঠে না, বউয়ের পরনে কাপড় থাকে না; কিস্তির টাকা না দিতে পারলে বরগাদার যখন জমি ফিরিয়ে নিয়ে যায়, আর আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকি– সেই সব কি দুঃখ হুজুর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, না, রজব আলী, ও সব কষ্ট, দুঃখ আরও অনেক বেশি।

রজব আলী বললো, তাহলে কি আমার দুঃখ নেই? আচ্ছা ভেবে দেখব।

ডানার আড়ালে মুখ লুকিয়ে বসে ছিলাম। চারদিকে সব পথ বন্ধ, এখন যাই কোথায়? বসে বসে ভাবছিলাম।

রজব আলী ঘরে ঢুকল। রজব আলীর গলায় গান নেই। সে আর নিঠুর কালাকে ডাকে না।

এই যে, এসো এসো রজব আলী। আমি তাকে আদর করে বসতে দিলাম। সে দঁড়িয়েই থাকল তবু। মুখটা বড় গম্ভীর। বড় অন্যমনস্ক।

হুজুর, গলা সাফ করে নিল রজব আলী, হুজুর, বিনা চিকিৎসায় বাপটা মরে গেলে, আর বউয়ের বুকে দুধ না পেয়ে বাচ্চাটা কাঁদলে কি মনে খুব দুঃখ হয়?

আমি বললাম, না, রজব আলী, দুঃখ আরও অনেক উঁচুতে থাকে।

রজব আলী চুপ করে গেল।

দুজনে অনেকক্ষণ বসে কালকাসুন্দির জঙ্গল, আশশ্যাওড়ার ঝোপ, তারপর মাঠ, তারপর মাঠ, তারপর মাঠ, তারপর বন দেখলাম জানালা দিয়ে। হাওয়া চলে গেল জানালায় শব্দ তুলে।

রজব আলী আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললো, আপনার বড় দুঃখ হুজুর।

কেমন করে?

মা-টা মরে গেল, বাপ থেকেও নাই। ভাই-বোন কে কোথায় কোন বিদেশ বিভূঁইয়ে। বাড়ি নেই, ঘর নেই। দেশ থেকেও নেই। বন্ধু বিশ্বাস করে না। সত্যি কথা বললে লোকে ভাবে মিথ্যে, মিথ্যে বললে মাপ করে না– আপনার বড় দুঃখ।

এসব কিছুই দুঃখ নয় রজব আলী, দুঃখ আরও দূরে থাকে। হেসে বললাম।

যাওয়ার সময় রজব আলী বললো, ওই কালো বাক্সটার মধ্যে কী আছে?

আমি নিজেই জানি না কী আছে।

একবার দেখা যায় না?

কিন্তু রজব আলী। ওতে যে তালা দেওয়া!

খুলে ফেলুন।

চাবি আমার কাছে নেই। দুঃখী লোক ছাড়া আর কারো কাছে ওর চাবি থাকে না। আমরা কেউই তো দুঃখী নই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কখনো কি দেখা যাবে না তাহলে?

যাবে, যেদিন আমরা দুঃখী হবো।

রজব আলী ভাবতে ভাবতে ফিরে গেল।

ক'দিন রজব আলীর দেখা নেই। আমি তাকে পথে, মাঠে, নদীর ধারে সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে বেড়ালাম। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এভাবে আর অপেক্ষা করা যায় না। রজব আলীকে খুঁজে পেতেই হবে।

খুঁজতে খুঁজতে পচা পুকুরের ঘাটে গিয়ে রজব আলীকে পেলাম।

এই যে তুমি এখানে।

সে ভয়ানক চমকে আমার দিকে তাকাল, তাই তো, আমি এখানে কেন?

জানো না, এখানে বসে আছ কেন?

না!

তার চোখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কিছু মনে হচ্ছে রজব আলী?

মনে হচ্ছে, বুকের নিচ থেকে, তলপেটের ওপর থেকে কী যেন গলার কাছে উঠে আসতে চায়। দম বন্ধ হয়ে যায় যেন।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললাম, আমার সঙ্গে চলো তো, চাবিটা এবার পাওয়া যেতে পারে।

ঘরে ঢুকে বললাম, ট্রাঙ্কটার উপরে হাত রাখো, দেখো তো খোলে কি-না!

রজব আলী ট্রাঙ্কটার তালায় হাত রাখতেই সেটা শব্দ করে খুলে যায়।

রজব আলী, এবার দেখো তো কী আছে এর মধ্যে!

কিছু দেখা যায় না, হুজুর। বড় অন্ধকার।

ভালো করে দেখো।

রজব আলী ভালো করে দেখার জন্য ট্রাঙ্কটার মধ্যে প্রথমে হাত রাখল, তারপর মাথা, তারপর পা, তারপর সবটা রজব আলী ঢুকে গেল।

আমি জোরে বললাম, রজব আলী কী দেখছ?

অনেক দূর থেকে রজব আলীর আওয়াজ ভেসে এলো, যেন কোথায় কোন্ পাতালে সে নেমে গেছে, কিছু দেখা যায় না হুজুর, তল নেই, শেষ নেই, বড় অন্ধকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চিৎকার করে বললাম, আর কিছুই নেই, আর কিছুই নেই, রজব আলী? ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে এলো, আর কিছুই নেই!

আমি আকুল স্বরে বললাম, আরও কিছু বলো রজব আলী। আমিও যে ট্রাঙ্কে কী আছে জানতে চাই।

বাতাসের শব্দের মতো রজব আলী বললো, হুজুর, মনে হচ্ছে এই আমাদের জীবন।

দু'হাত বুকে চেপে ধরে বললাম, আর কী রজব আলী?

হুজুর, জীবনটা যদি এমন না হতো! আমাদের বড় দুঃখ।

রজব আলীর স্বর বাতাসের সঙ্গে ফিরে চলে গেল।

তারপর সেখানে অনন্ত নৈশব্দ আর বাক্সের শূন্যতা ক্রমে চরাচর গ্রাস করে নিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বিচার চাই, সম্রাট

আমরা নিজ নিজ আসনে স্থির বসে থেকে কঠিন দৃষ্টিপাত করতে থাকি। যুবকটি আপাতস্থির কিন্তু তার চক্ষুতারকা ঘূর্ণায়মান। সে ক্রমাগত আমাদের দিকে এবং সুরূপা কন্যাটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকে। একপর্যায়ে সে, যুবকটি, কন্যার পাণি গ্রহণ করতে গেলে তাকে নিরস্ত করা হয়। তখন তার বহ্ন্যুদ্গারী অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। কী তার দোষ অথবা কিসে সে অযোগ্য এই প্রশ্নের সদুত্তর এত সহজে দেওয়া যায় না।

বিবাহে সকলের অধিকার থাকে না, এই কথাটি আমি কোমল স্বরে যুবকটিকে বুঝিয়ে বলি। জাগতিক সৌন্দর্য ও ধনসম্পদ আবশ্যিক শর্তাবলি। কন্যার মনোহরণের কোনো অধিকার তার নেই এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হলে সে বলে, আমার সমস্ত আছে। এই কন্যাকে আমি অপার তৃপ্তি দিতে সক্ষম। তার এই দাবী গ্রাহ্য করা হয় না।

মুহূর্তে যেন যুবক উঠে আসে। সে ওই দেহকে নিজের শরীরে মিশিয়ে নিয়ে দ্রুত পলায়নে তৎপর হলে আমরা বাধা দিই।

মুহূর্তে যেন যুবক উঠে আসে। সে ওই রমণীর সর্বাঙ্গে উপচার প্রয়োগ করতে থাকে কিন্তু তার শীৎকারধ্বনি স্পষ্ট হবার পূর্বেই তাকে নিরস্ত করা হয়।

মুহূর্তে যেন যুবক উঠে আসে। সে ওই রমণীর ক্রোড়ে একটি সন্তান অক্লেশে রেখে দিলে আমরা আতঙ্কে চিৎকার করে তাকে টেনে আনি।

যুবকটি নতমুখে বসে ছিল। অন্নদাতা গৃহস্বামী আমায় বললেন, তা' তুমিই স্থির করো কন্যাটি দেবো কি না। তুমি বরং এর সঙ্গে যাও। তার শোবার ঘর, পালঙ্ক ইত্যাদি দেখে আসো। কন্যাটি যেন সুখে, আয়াসে গর্ভধারণ করতে পারে। তার মাঠ, বাগিচা এবং পুকুর দেখো, কন্যাটি যেন স্তনভারে শিশুকে আবৃত করে রাখতে পারে। তুমি তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন এসবও দেখো যেন কন্যাটি অশ্রুমুখী না হয়।

এ কথা শুনে, প্রাণিপ্রার্থী যুবক বজ্রাহত হয়, কিন্তু মুহূর্তের জন্য। সে কিয়ৎকালে সহজেই বলে ওঠে, তবে তাই হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি পাখি উড়ে যায়। মাঠ থেকে উড়ে তারা পথে উঠে আসে। সকলে দল বেঁধে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। যুবকটির মুখ এখন প্রফুল্ল। সে বলে, আমাদের পাখিরা সুখ আহ্বান করে। একটি পাখি বিচিত্র বর্ণের ছিল। সে সুন্দর নাচ দেখায়।

চারপাশের দৃশ্যাবলি মনোরম। রাস্তার সাদা ধূলিকণা বায়ুসংযোগে কখনো কখনো দৃষ্টিপথ বন্ধ করে দেয়। আবার চোখ খুলে ঐ দূরে শীর্ণকায়া নদীটি প্রকৃত মোহ বিস্তার করে।

দৃশ্যে বড় সুখ। যুবক সেই কথা বোঝে। তখন সে দৌড়ে রাস্তার অপর পারে জলা থেকে দুটি শালুক তুলে আনে। বৈঁচির ঝাড়ে ঢুকে সে সুপক্ব ফলগুলোও নিয়ে আসে।

পরে আমরা বিশাল বটের নিচে বিশ্রাম নিই। স্পষ্টতই আমি ক্লান্ত। একবার ভাবি আমিই তো সব। এই যুবকের প্রার্থনা মঞ্জুর করা আমার সাধ্যে, তাকে বিমুখ করাও আমার ইচ্ছায়, তাহলে ফিরে যাই না কেন? কিন্তু সে অনেক মিনতি করে। আমার সমস্ত সন্দেহের নিরসন হোক এই সে চায়।

সুদূর সেই গ্রামে যানের প্রবেশ অসম্ভব। পথে যে নদীটি পড়ে সেটি পারাপারের কোনো সুব্যবস্থা নেই। অবশ্য বিশাল নয়। তবুও সমস্ত পোশাক খুলে সাঁতরে নদী পার হওয়া আমার মর্যাদাহানিকর বিবেচনা করি এবং ফিরে যেতে চাই।

যুবক সাশ্রুনেত্রে, কাতর বচনে বলে, এই আর সামান্য পথ। আপনি আমার সৌভাগ্য বহন করে আনবেন, আমি কী করে আপনাকে ফিরে যেতে দিই বলুন?

আমার কিছু বলার ছিল না। গামছাটি পরে নদী পার হতে যাই। ঠিক মাঝনদীতে আমার মনে হয় যেন ওই যুবকের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির দ্যুতি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। প্রবল সন্দেহে পরপারে পৌঁছে যাই।

এপারের শ্যামছায়া এবং বৃক্ষের ঘনতা দেখিয়ে সে আমায় বলেছিল, এটিই আমাদের গ্রাম। এপারে এসে ক্রমে সেই ছায়ার সমীপে গেলে দেখি ছায়া, কেবলই ছায়া। গ্রামের চিহ্ন নেই। আশশ্যাওড়া, ভাঁট, কসাড় জঙ্গল সামান্য পথরেখাকেও মুছে দিতে চায়। আমি বলি, কোথায় গ্রাম?

আমার সন্দেহ সত্য হয়। যুবক হেসে বলে, এই তো সামনে।

আমি বললাম, দেখতে পাই না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ও, তাহলে বোধহয় নেই।

তার এই জবাবে আমি ফিরে যেতে চাই। সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয় না। কেবল বলে, আপনি আর ফিরে যেতে পারছেন না। পেছনে ফেলে আসা পথ ঘন জঙ্গলে ডুবে গেছে। পাহাড়ি নদীতে হঠাৎ ঢল নেমেছে, প্রবল স্রোত আপনাকে ভাসিয়ে নেবে।

তার এই সব অর্থহীন শিশুসুলভ বাক্যাবলি আমায় আদৌ বিস্মিত করে না। তাই আমি তার সঙ্গে শেষ প্রান্তে যেতে চাই।

এতক্ষণ আলো ছিল। কিন্তু বৃক্ষলতার ঘনতা আলোর পথ রুদ্ধ করে দিতে চায় বলে এখানে দিবসে আঁধার মনে হয়। অথবা আসলেই কি এখন দিন? সূর্য মাথার উপরে নয় তাই দেখা যায় না।

আমি তাকে অনুসরণ করি। আলোছায়ার জাফরি-কাটা বনপথে সে দ্রুত একটি হরিণের মতো চলে যেতে থাকে। শুকনো পাতার রাশে শব্দ তুলে আমি তার পেছনে যাই।

বোধহয় সন্ধ্যা আসে। অন্ধকার বৃক্ষচূড়ে বসে পথ দেখানো পাখিরা বিশ্রাম খোঁজে, বোঝা যায়। রাত্রিচর প্রাণী কিছুক্ষণের মধ্যেই পথ রোধ করে দাঁড়াবে।

পথ আর দেখা যায় না। জোনাকির আলো সুদূর শহরের মতো জ্বলে নেভে। মাত্র কিছু দূরে যুবকের শরীর অন্ধকারে ছায়া হয়ে যায়।

এই সময় সে হঠাৎ থেমে যায়। তারপর আমার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। নিচুগলায় সে বলে, আমরা এসে গেছি। এই আমাদের গ্রাম।

আমি কিছুই দেখতে পারি না। প্রস্তাব করি, জ্যোৎস্নার জন্য না হয় অপেক্ষা করা যাক।

তার দরকার নেই। বলে, সে বাঁ-পাশে অন্ধকারে মেশানো একটি উঁচুমতো জায়গা দেখায়। ওইখানে আমাদের প্রাসাদ। আমার হাত ধরে সে টেনে নিয়ে যায়, ইঁটের ভগ্নস্তূপ আমি খুব মনোযোগে দেখতে থাকি— কারণ, আমায় তার শয়নকক্ষ, পালঙ্ক ইত্যাদি খুঁজে বের করতে হবে। সে বোধহয় বুঝতে পারে, তাই বলে এখন আর আমরা এখানে থাকি না।

আবার পথে নেমে আসা হয়। জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ তখন সামনে, অন্ধকার ভেদ করে ভেসে ওঠে। সে বলে, ওর নাম সুখী। একটি শেয়াল। আমি চিনি। এরাই এখন ওই প্রসাদে থাকে।

আপনাকে সবই দেখানো দরকার। কিন্তু আপনি তো ভোরে উঠেই চলে যাবেন, আচ্ছা চলুন, আপনাকে আমাদের মাঠ, বাগিচা, পুকুর দেখাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঠে কোনো ফসল ছিল না। অথবা বলা যায়, সেটি আদৌ কোনো মাঠ নয়। আর আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না যে, ওই দুটি বিগতজীবন আমগাছ বাগিচা। কিছু পরিষ্কার দেখা গেল না ঠিকই, তবু পুকুর নিশ্চয়ই এই ডোবার চাইতে অনেক বড় হয়।

কি রকম দেখছেন সব? সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে আমি সন্তোষজনক জনাব দিই। এবং ফসলের পরিমাণ, ফলের সম্ভার, মাছের আনাগোনা এই সবের খবর নিতে থাকি।

সে ততক্ষণে খুবই স্বচ্ছন্দ। অবলীলায় সে সব খবর বলে যায়। তার শরীরের পেশিগুলো আমার হাতে স্পষ্ট হতে থাকে। গায়ের জামা খুলে ফেলে হাতে নেয় সে। আমি অনুভব করি কামুকপুরুষের স্বেদে তার সমস্ত শরীর ক্রমে পিচ্ছিল হয়ে আসছে।

চলুন এইবার আপনাকে আমার আত্মীয়স্বজন দেখাই। পাড়াপ্রতিবেশী দেখাই।

ভগ্নপ্রায় একটি কুটিরের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ভিতর থেকে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের কাশির শব্দ পাই। তৈলহীন প্রদীপের আলোয় যে-বৃদ্ধা স্বামীর সেবারতা ছিল সে অকস্মাৎ প্রশ্ন করে, এ কেডা? আমার সঙ্গী তড়িৎ প্রত্যুত্তর দেয়, আমি। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ঘর থেকে ছুটে বেরোয়। শ্বাস টানতে টানতে বৃদ্ধ মাথা উঁচু করে, তারপর তারা যুগপৎ প্রশ্ন করে, বিয়া হইলো?

যুবক বলে, নিশ্চয়। ওই ঘরটি পার হয়ে যুবক বলে, ওরা আমার প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনী। কিন্তু আমার বাবা-মার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া একটু দুরূহ। তাঁরা নদীর ধারে আছেন আজ দশ বছর হলো। কি, দেখতে যাবেন?

আমি বলি, না-না, তাঁরা শান্তিতে থাকুন। পরে একদিন তাঁদের সাথে দেখা করা যাবে।

যুবক ভয়ানক খুশি হয়। আনন্দে সে বলে, দেখলেন তো আমার সবই আছে।

এইখানে গাছপালার ঘনতা কিছু কম। বুঝি আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে আসে। সেই অস্পষ্টতায় একসারি দালান দৃশ্যমান হলে সে বলে ওঠে এটি আমাদের স্কুল। "আওয়ার স্কুল" বলে সে তার সমস্ত বিদ্যাবত্তা জাহির করে। তার এই গুণপনায় আমি পরিতুষ্ট হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ভিতরে গিয়ে দেখলে হতো না? আমার প্রস্তাব সে সানন্দে গ্রহণ করে এবং স্কুলের ইঁটতোলা বারান্দায় উঠে দরজায় ক্যাঁচ শব্দ তোলে। ওইখানে আমি বসতাম বলে অন্ধকার নির্দেশ করে। আপমি তার কৃতিত্বের বিবরণ চাই। সে অম্লানবদনে স্কুল উঠে গেছে বলে বারান্দা থেকে নেমে আসে।

রাস্তায় নামতেই পথ হারিয়ে যায়। কৃষ্ণবর্ণ আরও গাঢ়তর হয়। আর তখন আমার হাত ছাড়িয়ে সে সরে যায়। আমি আর অগ্রসর হতে পারি না। হঠাৎ অন্ধকারের আড়াল থেকে তার গলার স্বর ভেসে আসে, কি, সব দেখলেন তো, বলুন কন্যাটি দেবেন কিনা।

আমি বলি, আগে আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো।

সে তখন কাছে এসে হাত ধরে।

দুজনে এগোতে থাকি। হঠাৎ বাতাসে কিসের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। গন্ধটি খুবই ভীতিকর।

সে আবার হাত ছেড়ে দেয়, বলে, এবার বলুন, এই রমণী আমার কি-না।

আমি বলি, আগে আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো।

সে আবার হাত ধরে। আমরা গল্প করতে থাকি। সে বলে, এটি এক বিশাল জনপদ। খুব সুখী জনপদ। আসলে খুবই সুখী। দেখুন, সকলে কী আনন্দে নদীর ধারে চলে গেছে। দেখুন, সকলে কী আনন্দে ভিন্নদেশে চলে গেছে। আর দেখুন আমার প্রতিবেশী ওই দম্পত্তি কী আনন্দে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে সাধের বাসর রচনা করেছে।

এই সময় সম্মুখে কয়েকটি কুটিরের আভাস পাওয়া যায়। এই আমার দৌলতখানা বিনয়বচনে সে বলে। উঠোনটি তকতকে নিকোনো বলে মনে হয়। মুখোমুখি দুটি কুটিরের একটিতে প্রদীপ জ্বলে। যে প্রদীপের আলোয় শীর্ণ শিশু তার পড়া মুখস্থ করে। শিশুর মাতা তার অকালবৃদ্ধ স্বামীকে সোহাগ করে। অনুমানে বুঝে নিই এরা সহোদর নয়।

শিকল খুলে আমরা অন্য কুটিরে ঢুকি। মৃদু শব্দের সঙ্গে শলাকা জ্বলে ওঠে এবং একটি প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে।

আপনি বড় ক্লান্ত, আরাম করুন। তার এই স্বস্তিবাক্যে পাশ ফিরে দেখি বাঁশের মাচার দিকে তার নির্দেশাঙ্গুলি। বুঝি, এটিই সেই শয়নকক্ষ এবং ওই তার পালঙ্ক। বিছানা কোথায়? আমাদের কন্যার আয়াসে গর্ভধারণ করা প্রয়োজন। আমার কথা শুনে সে নিচু হয়ে মাচার নিচে থেকে একটি তোরঙ্গ বের করে আনে। সেই তোরঙ্গ খুলে সে বাসনামাখা নকশিকাঁথাটি বের করে মাচার উপরে বিছিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় চুপিসারে সেই পুরুষ ও রমণী ঘরে ঢুকে পড়ে। শিশুটিকেও তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তারা একসঙ্গে বলে ওঠে, কি বিয়া হইলো, বউ কই?

যুবক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, নিশ্চয়। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, এরাই আমার আত্মীয়, আমার কাছে আছে। আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন তো? দেখলেন তো, আমার সবই আছে। অট্টালিকা, মাঠ, বাগিচা, পুকুর সবই। দেখুন, স্বহস্তে কী চমৎকার শয্যা প্রস্তুত করেছি আমি। আমার বিবাহে অধিকার আছে কি-না?

আমি বলি, মূর্খ, জীর্ণ ইঁটের স্তূপ তোমার অট্টালিকা, ফসলহীন একখণ্ড ভূমি তোমার মাঠ, মৃত দুটি বৃক্ষের সমাহার তোমার বাগিচা, পচা ডোবা তোমার পুকুর, মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ-দম্পতি তোমার প্রতিবেশী। আর এই উলঙ্গ শিশুর মাতা-পিতা তোমার আত্মীয়। আমি তোমাকে কিছুতেই সালঙ্কারা কন্যা দেব না।

আমার কথায় মুহূর্তের জন্য সে নিশ্চল হয়ে যায়। তাহলে আমি কী করি, এই আমার সব— বলে সে চিৎকার করে ওঠে। এক লাফে সে আমার শরীরে উঠে গলা টিপে ধরে। আমার শ্বাস রুদ্ধ হতে চায়।

কিন্তু আমি কিছু বলি না। আমি জানি সে আমাকে হত্যা করতে পারে না। আমি চরাচরের সম্রাট। ক্ষুদ্র পক্ষীশাবকের মতো তার প্রাণ এখন আমার হাতের মুঠোয়।

আমি তাকে জীবন দেব কি দেব না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবিপ্লবী

হাট থেকে ফেরা পথে মতির দোকানে চা খেতে এসেই কথাটি আবার শুনল সে। সারাদিনের ব্যবহৃত কয়েক টুকরো কাগজ খুঁজে খবরটা বের করে পড়ে নিল। ঠিকই। আগামীকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা 'কর্মসূচি'। বাস, মিনিবাস, স্কুটার, টেম্পো কিছুই চলার কথা নয়। যদিও টেম্পো কখনো-কখনো চলে কিন্তু তাতে করে তিনটে ফেরি পার ও পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা যাওয়া যায় না।

গুজবের মতোই খবরটি তার কানে এসেছিল, এক সপ্তাহ আগে। অনেক কিছুর মতো 'কর্মসূচি'ও এখন দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু তখনও চিঠিটি হাতে পৌঁছয়নি। আজ ছ'মাস পরে আর একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক, তা-ও কাল সকাল দশটায়।

হাটের মধ্যে শরিফ পিওন চিঠিটি যখন তার হাতে দেয় তখন খামের উপরে ছাপানো কোম্পানির নাম দেখে উৎফুল্ল সে তক্ষনি তাকে দশ টাকা পান খাবার জন্য দিয়ে দিত, কিন্তু পকেটে ছিল না। ঘর থেকে আনা সব ক'টি টাকাই প্রায় খরচ হয়েছে। চা খাবার জন্য দুটি টাকা অনেক কষ্টে সে রেখে দিয়েছিল।

কিন্তু চিঠি খুলে পড়ে দেখার সময়ে শরিফ তার হাতের কাছে ছিল না। নাহলে সাত দিন আগে পৌঁছানো চিঠি হাটে বিলি করার জন্য শরিফকে রক্তাক্ত নাক নিয়ে ঘরে ফিরতে হতো।

মফিদুল তাকে সারা হাট খুঁজে অবশেষে এখানে দেখে হাসিমুখে পাশে এসে বসে। মফিদুলের পোশাক থেকে, শরীর থেকে চমৎকার গন্ধ ভেসে আসে। সে ম্লান হেসে 'তোর জন্যই বসে আছি' বললেও মফিদুলের বিশ্বাস হতে চায় না। শঙ্কিত মুখে কী ঘটেছে জানতে চাইলে বন্ধু তার হাতে চিঠিটি তুলে দেয়। চিঠিটি পড়ে প্রথমে মফিদুল কিছু বুঝতে পারে না, 'এ তো খুব ভালো খবর' বলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সে খবরের কাগজের দিকে নির্দেশ করে বলে, "ঢাকায় যাবো কেমন করে?"

মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয় কিন্তু মফিদুলের মুখে কোনো কালো ছায়া নামে না। অনেক টাকা খরচ করে, ধানী জমি বিক্রি করে সে আমেরিকা গিয়েছিল বেড়াতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সেখানেই থাকে। চার বছর পরে তিন সপ্তাহের জন্য ফিরেছে। বন্ধুর জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, পরিজনের জন্য দুটি বিশাল স্যুটকেসে উপহার নিয়ে এয়ারপোর্টে নেমেছিল সে।

'এত ভাববার কী আছে, দেখি কারো মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে অন্তত ফেরি অব্দি তোকে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আর নাহলে ভোর পাঁচটায়– অন্তত সাইকেলে করে হলেও, ফেরিঘাটে যাওয়ার জন্য চার ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

সে বোঝে সবই। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মোটরসাইকেলও অনেক সময় আপত্তির কারণ হয়। ফেরি চলে না। তাছাড়া ইউনিয়ন ইলেকশনের সময় মোটরসাইকেলওয়ালা কখন কাকে ঘরে পাওয়া যাবে বলা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা যাদের মোটরসাইকেল আছে, যারা ইলেকশন করে তাদের সঙ্গে অনেকদিন হলো ওঠাবসা বন্ধ তার। মফিদুল ভালো করে সে-সব জানে না।

'তাছাড়া এই হরতালের কথা তো সবাই জানবে। কাল মনে হয় না ওরা ইন্টারভিউ নেবে। নিলেও যারা যেতে পারবে না তাদের জন্য আবার দিন দেবে', মফিদুল উৎসাহের সঙ্গে বলে।

সে ঘাড় নাড়ে, 'না, বরং তারা খুশিই হবে ক্যান্ডিডেট কম হলে। সারাদিন শুধু শুধু কথা বলে কাটাতে কে-ই বা চায়।"

চার বছরে মফিদুল অনেক কিছু ভুলে গেছে। মায়ের গহনা বেচা টাকা দিয়ে দুজনের একসঙ্গে জ্বালানি কাঠের ব্যবসায় করার কথা, সেটা ফেল হলে, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের হাতে-পায়ে ধরে কাঠের পুল তৈরি করার ঠিকাদারি নেওয়ার কথা, তারপরে বর্ষায় সে পুল ধসে যাওয়ায় পাওনা টাকাটা বন্ধ হওয়ার কথা। মফিদুল সবই ভুলে গেছে। জ্বালানি কাঠ আর কাঠের পুলের মাঝে ঐ রকম চিঠি হাতে কতবার উর্ধ্বশ্বাসে ঢাকা ছুটেছে তারা দুজনে তাও ভুলে গেছে।

বাইরের ঘরে হলুদ লণ্ঠনের আলোয় শ্বেতকেশ পিতা বসে ছিলেন। সে বাজারের থলি ভিতরে দিয়ে এসে তাঁর কাছে এসে বসে। পিতা-পুত্রে এমন বসা ক্বচিৎ ঘটে বলে তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত। সে সব কথা বলে, তার চিঠিটি দেখায়।

'এইরকম চিঠি কতই পাও, কিছুই তো হয় না। ধরাধরির লোক না থাকলে আজকাল কি চাকরি হয়?' তাঁর গলায় স্পষ্ট হতাশা।

'ধরাধরিতেও আর হয় না আজকাল, টাকার দরকার', সে নিচুমুখে জবাব দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'টাকা তো সব শেষ তোমার হাতেই—' তিনি কথা শেষ করেন না। চুপ করে থাকেন। তারপর 'দেখো, সকালবেলা যাওয়া সম্ভব হয় কিনা' বলে উঠে দাঁড়ান। জিজ্ঞাসা করেন, 'কী চাকরি?'

'এমন কিছু না, অফিস সহকারী, তা-ও হবে না।'

ভোরে ছ'টায় মফিদুল মোটরসাইকেল নিয়ে হাজির। সে তৈরিই ছিল। মফিদুলকে দেখে বেরিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করে, 'কার গাড়ি?'

'মহিউদ্দিনের', মফিদুল বলে 'ওর কাছে নাকি খুব ভোরেই লোক আসবে। তাই আমি চলে এলাম। ন'টা-দশটার মধ্যে ফেরত দিলেই হবে। চল্, ওঠ।' সে সাইকেলের পেছনে উঠে বসে, হাতের ফোলিও ব্যাগটি নিয়ে একটু অসুবিধে হয়। দুজনের শরীরের মাঝখানে গুঁজে দিয়ে সে সমস্যা মেটায়।

বাড়ির রাস্তা থেকে বেরিয়ে তারা বড় রাস্তায় আসে। কাঠের পুলটি আবার তৈরি করা হলেও যথেষ্ট মজবুত মনে হয় না। এই পুলের নিচেই তার ভবিষ্যৎ।

পুলের ঢালু থেকে নেমে এগোতেই একজন একটু দূরে হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত দেয়। দূর থেকেই বুঝেছিল, কাছে এসে সবাহিনী ওসি সাহেবকে চিনতে তার ভুল হয় না। এই ভোরে তাঁকে রাস্তায় সচরাচর দেখা যায় না। তবে চাকরি বড় দায়।

'এত সকালে কোথায় যান', বলে ওসি সাহেব কাছে এসে ওদের চিনতে পারেন। মফিদুলকে দেখে, 'আরে আপনি যে, কোথায় যাচ্ছেন', বলে অমায়িক হবার চেষ্টা করে। মফিদুলের বাবা তার ঘরে ফেরা উপলক্ষে ক'দিন আগে বাড়িতে লোক ডেকেছিলেন। দারোগা সাহেবও নিমন্ত্রিত হন।

'ওর একটা ইন্টারভিউ আছে বেলা দশটায়। ফেরি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি', মফিদুল বলে।

'আপনি সত্যি-সত্যি চাকরি খুঁজছেন নাকি?' বলে ওসি তার হাতের ব্যাগটির দিকে ভালো করে তাকান। তাঁর গলায় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ।

'আপনার তো আর কিছু করতে দিলেন না', সে-ও তামাশা করেই জবাব দেয়।

মফিদুল কিছু বোঝে না। মাঝখানে 'লাগেজ পার্টির' সদস্য হিসেবে সে যে কয়েকবার বেনাপোল পার হয়েছে মফিদুল জানে না। বেআইনি মিছিল করার জন্য থানায় একত্রে রাত্রিবাসই কেবল তার স্মরণে আছে।

'আচ্ছা, আপনারা যান' বলে ওসি সরে দাঁড়ালে কনস্টেবল হাত নাড়িয়ে তাদের চলে যেতে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ ও ধোঁয়ায় তারা এগিয়ে যায়।

তার গায়ে একটি সোয়েটার আছে, একটি মাফলার গলায় জড়ানো। সকালবেলা তখনও ঠাণ্ডা আছে। মফিদুলের গায়ে উলের জ্যাকেট। কনুইয়ের কাছে চামড়ার তালি দেওয়া। এসব বিদেশের ফ্যাশান, মফিদল বলেছে।

শীতলক্ষ্যার প্রথম ফেরির কাছে এসে দেখে ফেরিটি ওপারে দাঁড়ানো। এপারে কোনো বাস, মিনিবাস, টেম্পো কিছু নেই। ওপারেও নেই। সম্ভবত ফেরির চালক এখনও ঘুমে। নদী থেকে হিম বাতাস উঠে আসে, সে মাফলারটিকে গলায় আর একটু ভালো করে জড়ায়। এতক্ষণের লাল আকাশে এখন কিছু সাদা আভা, গাছের ডগায় সামান্য হলুদের ছোঁয়া। মফিদুল ক্রমাগত তার হর্ন বাজাতে থাকে।

অবশেষে ফেরিতে ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ পাওয়া যায়। ততক্ষণে সূর্য দিগন্ত ছেড়ে অনেকটা উপরে উঠে এসেছে।

ফেরিতে পার করে সাইকেলটিকে ঢালু পাড় দিয়ে টেনে তুলতে একটু কষ্ট হয়। নরম বালিমাটিতে চাকা বসে যেতে চায়।

পাড়ে উঠে মফিদুল সাইকেলটিতে আর স্টার্ট দিতে পারে না, বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর তার সন্দেহ হয়। পেট্রোল আছে তো? মহিউদ্দিনের কথা অনুযায়ী সে বিকেলেই ট্যাঙ্ক ভর্তি করে রেখেছে। ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে দেখে জ্বালানি কম, কিন্তু স্টার্ট না নেওয়ার মতো নয়। যানটিকে এদিকে কাত করে দু'চার মিনিট পর পর চেষ্টা করতে অবশেষে প্রচণ্ড শব্দে ইঞ্জিন চালু হয়।

শীতলক্ষ্যার দ্বিতীয় ফেরি পার হয়ে দুজনে ছুটে এসে যখন বুড়িগঙ্গার পাড়ে পৌঁছল বেলা তখন নটা। মফিদুল এবার মতিঝিল অব্দি আসার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু সে রাজি হয়নি। ঢাকার কথা কিছু বলা যায় না। বিশেষত সকাল বেলাই সবারই উৎসাহ বেশি। অন্যের জিনিস, দরকার নেই।

বুড়িগঙ্গার ফেরিতে তাকে তুলে দিয়ে মফিদুল হাত নাড়িয়ে বিদায় দিল। ফেরি ছেড়ে মাঝনদীতে এলে সে দেখে মফিদুল ফিরে যাচ্ছে।

বুড়িগঙ্গার ব্রিজ একসময় হয়তো বিপ্লব আনবে কিন্তু এই মুহূর্তে কেবল লোহা সিমেন্ট ভাঙা রাস্তা আর ধুলোবালি ছাড়া কিছু নয়। সেই সব পার হয়ে সে যখন রিক্শার কাছে এসে দাঁড়ায় তখন দশটা বাজার পাঁচ মিনিট বাকি।

রিক্শাওলা যা ভাড়া চাইল তাতেই রাজি হয়ে সে রিক্শাওলাকে কেবলই তাড়াতাড়ি যেতে বলে। মিলব্যারাক-এর পাশ দিয়ে, গেণ্ডারিয়া, ধূপখোলা মাঠ, স্বামীবাগের মধ্য দিয়ে যখন রিক্শা এসে মতিঝিল পৌঁছল তখন দশটা পঁচিশ। আজকের দিনেও সময় নিয়ে নিশ্চয়ই তারা কথা তুলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

নিচে রিসেপশনিস্টের কাছে খবর নিয়ে সে কিছুই বুঝতে পারে না। অফিসটি চৌদ্দ তলার ওপরে, ইন্টারভিউ হবে কিনা কেউ জানে না, তবে এত দূর থেকে আজকের দিনে কী করে আসা সম্ভব তা নিয়ে কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করে রিসেপশনের মেয়েটি।

'ওই দিকে লিফট– কিন্তু এই একটু আগে পাওয়ার চলে গেছে। দেখুন গিয়ে–।'

নির্দেশিত স্থানে এসে সব ক'টি লিফটের দরজা বন্ধ দেখতে পায়। বোতাম টিপে সে কিছু বুঝতে পারে না। লিফটের সামনে দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে চলে যেতে যেতে কোনো অফিসের পিয়ন 'কখন পাওয়ার আইবো কে জানে, সিঁড়ি দিয়া উইঠ্যা যান স্যার' বলে অদৃশ্য হয়ে যায়। ইতোমধ্যে দু'এক জনকে সিঁড়ির দিকে যেতে ও সেখান থেকে বেরতে দেখে ঘড়ির দিকে তাকায়– এগারোটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।

দোতলার সিঁড়ির দরজা দিয়ে একজন অপেক্ষাকৃত পদস্থ কর্মচারী বেরিয়ে নিচের দিকে যাচ্ছিলেন। তাকে কিছু বিপর্যস্ত দেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় যাবেন?' তারপরে সব শুনে 'পারবেন না হেঁটে উঠতে– একটু অপেক্ষা করুন, ইলেকট্রিসিটি এই চলে আসবে' বলে সিঁড়ি-দরজা খুলে চলে যান। সে দোতলায় লিফটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এগারোটা পনেরো। সে সিঁড়িতে ফিরে এসে আবার উঠতে শুরু করে।

দোতলা থেকে তিনতলা, তারপরে চারতলায় উঠে যায় অক্লেশে, পাঁচতলায় পৌঁছে নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে আসে, পা ভারি মনে হয় একটু। ছ'তলায় উঠে তাই আবার সিঁড়ি থেকে বেরিয়ে লিফটের সামনে আসে। দু'তিন জন মলিন অফিসকর্মী লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে। তারা চিন্তিত মনে হলো।

কাছে এসে জানতে পারে একজন সহকর্মী আটকে আছে। সে দরজার সামনে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকার গুহার মতো ঐ লিফটের মধ্যে কেমন লাগে ভাববার চেষ্টা করে। ততক্ষণে নিঃশ্বাস আর একটু সহজ হয়ে এসেছে। সিঁড়ির দিকে আবার পা বাড়ায়। আটকে পড়া কর্মীর বন্ধুরা শঙ্কিত। বলে, 'আর উঠবেন না স্যার, আর পারবেন না।' কিন্তু সে তাদের কথা শোনে না।

আটতলায় উঠে আবার লিফটের সামনে আসে। সেখানে কোনো লোক নেই কিন্তু আরো দুজন অফিস-পিয়ন পাশের অফিসের খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখতে থাকে। সে একটু অপেক্ষা করে তারপর আবার সিঁড়িতে ফিরে আসে। ঘড়ির দিকে আর তাকায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঁড়িতে পা দেওয়ার মুখে ঐ দরজায় অফিসকর্মী দুজনের একজন দ্রুত তার সামনে দিয়ে উপরে উঠে যায়, আর একজন পেছনে পেছনে উঠতে থাকে। ন'তলা থেকে দশতলায় সে থামতে চায় না। বুকের মধ্যে তখন কেবল শ্বাসকষ্ট নয়, কেমন এক অস্থিরতা জন্মাচ্ছে কিন্তু তার বুক ফেটে হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে এলেও সে থামবে না।

এগারোতলায় সিঁড়ির মুখে পৌঁছে দেখে সেই অফিসকর্মী আর দু'তিন জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে এক গ্লাস জল। সে গ্লাসটি নিয়ে সম্পূর্ণ পানীয় শুষে নেয়। গ্লাসটি উপকারীকে স্মিতহাস্যে ফিরিয়ে দেয়।

তার গতি ততক্ষণে ধীর। একটি সিঁড়ি পার হতে যেন কত সময় লেগে যাচ্ছে। পা দুটো অসম্ভব ভারি। হাঁটুর উপর প্রচণ্ড যন্ত্রণা। কিন্তু সে তখন আর থামতে পারে না। প্রচণ্ড ক্রোধ হয়। কিন্তু দেয়ালে শূন্য হাতের আঘাত কোনো কাজের নয়, সে জানে।

বারোতলার সিঁড়ির মুখে ততক্ষণে একদল কর্মী তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সিঁড়ির মাথায় উঠে আসতেই তারা নিম্নস্বরে সহর্ষ ধ্বনি করে। একসঙ্গে হাততালি দেয়। ফলে, তার পায়ে নতুন শক্তি আসে যেন এবং সে না দাঁড়িয়ে আবার উপরে উঠার উদ্যোগ করে। অন্য সবাই তার পেছনে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ সীমায় আবদ্ধ বলে তার সঙ্গে উপরে উঠতে পারে না।

তেরোতলার মুখে তার জন্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল। ফুলের তোড়াটি হাতে নিয়ে সে তার সৌন্দর্য দেখে। 'তোমরা আমার বন্ধু' বলে তোড়াটি তাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে শেষ পথটুকু পার হবার জন্য তৈরি হয় সে। উপরে উঠার সিঁড়িতে পা দিতেই সবাই হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

অবশেষে প্রার্থিত স্থানটিতে পৌঁছে যায়। নির্দিষ্ট ঘর খুঁজে পেতে একটুও কষ্ট হয় না। কেননা লাল কার্পেট কেবল একদিকে গেছে। সুদৃশ্য ধাতব পাত্রে বেলি, গন্ধরাজ, ফুটে আছে কার্পেটে মোড়া রাস্তার পাশে-পাশে। দরজার দু'পাশে লম্বা বিশাল ফুলদানিতে রজনীগন্ধা।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে সে। সুবেশা রমণী প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাইলেও সেই দৃষ্টিতে স্মিত হাস্য ছিল।

রমণী এসে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। তারপর 'আসুন' বলে তাকে নিয়ে দূরের দেয়ালে বিশাল একটি দরজা খুলে দেয়।

টেবিলের তিন দিক ঘিরে বসেছিলেন তাঁরা সবাই। স্বেদাক্ত, সে টেবিলের খালি দিকটাতে দাঁড়ায়। সামনে তাকালে ধূসর দিগন্ত, ধূলিময় প্রান্তর এবং ক্রমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বৃক্ষরাজি, জলাভূমি, সবই দেখতে পায়। কিন্তু সে পরিশ্রান্ত, হাপরের মাতো তার বুক ওঠানামা করছে।

পরীক্ষকদের একজন সামনে রাখা চশমা তুলে নেন, তারপর আঙ্গুল উঁচু করে ঘড়ির দিকে নির্দেশ করেন।

সবচাইতে যিনি ক্ষমতাশালী তিনি তখন কোয়ান্টাম থিয়োরীর ওপর প্রশ্নটা করেন। সে তখনও দাঁড়ানো। কোয়ান্টাম থিয়োরির পরেই থিয়োরি অব রিলেটিভিটি এবং তারপর জেনারেল সিস্টেমস থিয়োরির ওপরে প্রশ্নগুলো পর-পর তাঁর সামনে সাজানো।

সে তখন ঘুরে সুবেশা মহিলার দিকে তাকায়। সুবেশা মহিলা ধীরে কোণের টেবিল থেকে কারুকাজ করা থালা হাতে তুলে তার সামনে নিয়ে আসে। সূক্ষ্ম মসলিনের থালাটা ঢাকা। ঢাকনা খুলে দিলে ক্ষুদ্রাকার অস্ত্রটি স্পষ্ট হয়।

কোয়ান্টাম থিয়োরির জবাব দিতে সে সেই অস্ত্রটি তুলে নিয়ে অধীশ্বরের দিকে উঁচু করে ধরে। আর তখন বিশালবপু চরাচরের মালিকও হেসে সুবেশা মহিলাকে ইঙ্গিতে কাচের দেয়ালে বসানো একটি জানালা খুলে দিতে বলেন।

সে একটু সরে খোলা জানালা দিয়ে দেখে জলাভূমির শেষে মৌচাকের মতো বস্তির সারি, তারপর ক্রমে দালানকোঠা, বাড়ি-ঘর, তারপর অট্টালিকা। বড় বড় রাস্তা সরু গলির মতন দেখায়। মাটির উপরে আর একটা উঁচু-নিচু সিমেন্টের মাঠ। অনেক দূরের রুক্ষ লাল মাটিতে ধোঁয়ার আকাশ।

তাক করা অস্ত্রের নলটির দিকে তাকিয়ে সেই সর্বশক্তিমান তখন বলেন, 'এছাড়া আর কি উপায় ছিল না?'

সে আবার নিচে তাকায়। মনে হয় যেন উপর থেকে শত মণের একটি লোহার বল ফেলে দিলেও গুঁড়িয়ে যাবে।

সে তার দিকে চোখ ফিরিয়ে স্থির কণ্ঠে বলে, 'না'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছায়া দাও

এমন অলক্ষ্যে, চোখের আড়ালে, শুকিয়ে যাওয়া চারাগাছ মহীরুহ হতে পারে, আকাশের দিকে ডালপালা ছড়িয়ে, কে জানত । কথা ছিল শুকনো পাতাটিকে ছাড়িয়ে আনবে ডাল থেকে, যোগাবে নিয়মিত জীবনী, জানালার পাশে টেনে দেবে টবটিকে যখন বাইরে রোদ্দুর। সে এসবের কিছুই করেনি। পরে যখন দেখা গেল সবকিছুর মতোই সাজিয়ে রাখার গাছটিও এমন ব্যবহার মেনে নেবে না, তখন ঘর ছাড়ার মুখে ঐ গাছটিকেও সে রেখে এসেছিল অন্যের কাছে।

আবার ঘরে ফিরেছে খবর পেয়ে বৃক্ষের আশ্রয়দাতা টেলিফোনে হেসে বলেছিলেন, "দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আপনার গাছের মাথা তোলবার জন্য আমার ঘরের ছাদ ফুটো করতে হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে এই ঘর ছাড়িয়ে, উপরতলার ভাড়াটের ছাদ ফুঁড়ে বেরবে সে। তারপর— না না, আপনার গাছ আপনি নিয়ে যান"।

দেখতে গিয়েছিল সে। পুরনো আশ্রয়টিকে ফেলে নতুন বড় আধারে নরম মাটিতে শেকড় ঢোকানো তার— ঘরের কোণায় সিলিং-এ মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বসবার ঘরের অনেকটা জায়গা তার দখলে। গৃহস্বামী খোলা জায়গা চান, বন্ধ ঘরে সবুজ নয়। সে তাকে দোষ দিতে পারে না।

বন্ধুর শিশুপুত্র গাছের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে 'জ্যাক অ্যান্ড দ্য বিনস্টকে'র গল্প শুনিয়ে যায়। মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া শিমের বীজ থেকে গাছ সোজা উঠে গিয়েছিল আকাশে। গাছ বেয়ে বেয়ে উপরে ওঠে, মেঘের আড়ালে উঠে গিয়ে জ্যাক দেখে সেখানে বাস করে চিরকালের শত্রু সেই দৈত্য। দৈত্যের নিধন শেষে রাজ্যলাভ ঘটেছিল রূপকথার নায়কের। কিন্তু তার জন্য নয়। হলে নিজের ঘরেই তো গাছটি ডালপালা ছড়াতে পারত। সে পাতা ধরে ডাল বেয়ে উঠে যেতে পারত মেঘের আড়ালে। রাজত্ব লাভ হতো তারও। তাহলে এই ঘর না ঐ ঘর, এই বাড়ি না ঐ বাড়ি, এই দেশ না ঐ দেশ করে ছুটে বেড়াত না সে। কৃতিত্বহীন, সাহসহীন, কোন্ পথে যাওয়া দরকার কখনো যে ঠিক করতে পারে না, এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মানুষের গ্লানি বইতে হতো না। তাহলে শূন্য ঘরে খবরের কাগজের স্তূপ জমত না, গালিচায় আরশোলা ঘুরে বেড়াত না।

এখন গাছটিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল সে। বলতে পারত টুকরো করে কেটে, ডগা ভেঙে মুচড়ে ফেলে দিয়ে আসুন। কিন্তু সমাজে, বন্ধুর কাছে এমন কথা বলা যায় না। বন্ধুর শেষ কথা, "এমন একলা থাকা ভালো নয়" এবং শেষে হাসির সঙ্গে "অন্তত ঘরের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকবে তো", তার কানে বাজে। 'জ্যাক অ্যান্ড দ্য বিনস্টকে'র গল্পের সঙ্গে ভিন্ন রাজ্যে নিজ পুত্রের মুখ চোখে ভাসে। শিম গাছের নিচে বিহ্বল দাঁড়িয়ে সে, উঠতে জানে না।

হাওয়ার শরীরে আর একটু ঠাণ্ডা থাকলে এই নভেম্বরের প্রায় অদৃশ্য বৃষ্টিকণা পেঁজা তুলোর আঁশ হয়ে শূন্য থেকে ঘুরে ঘুরে নামত। এখন ঐ বাতাস তাকে সামান্য কাঁপাচ্ছে। ঘর থেকে বেরনোর মুখে ভারী কোটটি নেবে কি নেবে না এই সমস্যার সমাধান ঠিকমতো হয়নি।

এখান থেকে তাকালে নদীর বুক ছুঁয়ে চোখ অতিকায় পাওয়ার প্ল্যান্টের পাম্পহাউসে আটকে যায়। নদীর হালকা কালো ঢেউ চক্‌চক্ করে। মোহনা থেকে বার্জগুলো ঢুকে এই নদী বেয়ে বড় নদীতে পড়বার সময় কিছু পোড়া জ্বালানি ছাড়ে নিশ্চয়ই। দাঁড়ালে আদিগন্ত যেন সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো মনে হয়, বাঁয়ে ঘোলাটে আকাশের গায়ে মহাশূন্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পারাপারের সেতু।

নদীর ধারে গাড়ি রাখবার কোনো জায়গা খুঁজে পায় না। ল্যাম্পপোস্টের গায়ে সাঁটা নিষেধের আঙুল উপেক্ষা করলে কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু সে তা পারে না। পঁচিশ থেকে তিরিশ, অতি দ্রুত ষাটে পৌঁছে যায় জরিমানা বেআইনি গাড়ি রাখার জন্য। তার ভাগ্যে কখনো অন্যরকম ঘটে না। টহলী পুলিশের চোখ কেবল বুঝি তার শেভ্রলের তোবড়ানো দরজার দিকেই। নদীর দিক থেকে সরে পাঁচতলা সব চারকোণা দালানের ছকবাঁধা সারির মধ্যে সোজা সোজা রাস্তা, সবখানে নিষেধের বেড়া। শেষে অনেকটা দূরে গাড়ি রেখে এসেছে।

একরকম আলো তখনও আছে। কিছু স্বাস্থ্যান্বেষীও। নদীর পাড় দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় কেউ কেউ দৌড়ে চলে যাচ্ছে। কয়েকটি গাড়ি রেলিং ঘেঁষে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। ভিতরে লোক দেখা যায়। সে নিশ্চিত জানে একটু আগেও তারা বাঁদিকে পার্ক মতন জায়গাটুকুর বেঞ্চে বসে ছিল। তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায় স্বপ্নরাজ্যে এলেও রবিবারের সন্ধ্যায় এর বেশি মনোরম কোনো স্থানে তাদের বসবার উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ি দূরে রেখে আসতে হলো বলে মনে তার বিরক্তি। শূন্য হাতে হলে কথা ছিল না, কিন্তু সে জানে ফেরার সময়ে এমন থাকবে না। কৃতকর্মের ফল তাকে ঘরে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। নদীর তীরে যতক্ষণই দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন, একটু পরে হলেও পিছু ফিরে, ঐ সোজা ছকবাঁধা রাস্তা ধরে কোণের পাঁচতলা দালানে তাকে উঠতে হবে।

আরও খানিকক্ষণ নদীর দিকে, ওপারে সারি সারি দালান, সামান্য ক'টি গাছপালা, নদীর পাড় দিয়ে চলে-যাওয়া যানবাহনের দিকে তাকিয়ে থাকে। আলো জ্বলেনি এখনও। জ্বললে ওপারের মায়াপুরী চোখ ভোলাত।

নদীর দিকে পেছনে ফিরে ঘুরে দাঁড়ায় সে। আর ঠিক তখনই তাকে চমকে দিয়ে ঠিক তার সামনে পেছন-খোলা ছোট ট্রাকটি এসে শব্দ করে থেমে যায়। রেলিং-এর বাধা থাকলেও পাড়ের এত কাছে কেউ গাড়ি নিয়ে আসে না। একবার চোখ তুলে দেখেই সে বুঝে যায় এরা কেমন। এই রকম বেপরোয়া যারা তাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোও ঠিক নয়, সাবধানবাণী উচ্চারণ করার তো কথাই আসে না।

সেই ভেবেই ডাইনে সরে যায় সে, আর তখনই দরজা খুলে আরোহীরা বেরিয়ে আসে। স্বভাবের নিয়মে চোখ তোলে সে। কপালের মাঝখানে টুপি টেনে দেওয়া সকলের। এই প্রায়-সন্ধ্যায়, শহরের সীমানা-ঘেঁষা নদীর ধারে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় জোর আসবে যখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এমন সময়ে গায়ের উপর গাড়ি তুলে দিচ্ছে কোনো বন্ধু নয়। চোখে চোখ পড়তেই তিনজনই একসঙ্গে হেসে ওঠে, তারপরে প্রায় তার পথ আটকে দাঁড়ায় একজন। কোনো কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায় সে। কিন্তু ভিন্ন বিবেচনা বাধা দেয়। এবং যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

গাড়ি থেকে নেমে হাসির গর্‌রা তুলে তারা ছোটাছুটি করে খানিকক্ষণ। একটা বল নিয়ে লোফালুফি করে। একজন ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে পানীয় ঠাণ্ডা রাখবার বাক্সটি নিয়ে আসে।

সে তখনও চুপ করে দাঁড়ানো। আইসবক্স খোলার ব্যস্ততার ফাঁকে চলে যাবে ভেবে দু'পা এগিয়ে যায় সে, আর ঠিক তখনই একজন এগিয়ে আসে, তার হাতে একটি বোতল গুঁজে দিতে চায়, "হ্যাভ এ বিয়র"। সে অবাক হয় না। ভালো করে জানে অপরিচিতজনকে নিয়ে যা খুশি করা যায়, মজা করা তো যায়ই। সে হাত সরিয়ে নেয়, "ইটস্ গেটিং এ লিটল্ কোল্ড ফর মি", হাসিমুখেই বলার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। বুকের মধ্যে কেমন অস্বস্তি জমা হচ্ছে টের পায়, আর কোন্ কাজ কোন্ সময়ে করা উচিত কোনোদিন জানে না বলে ছুটে চলে যেতে গিয়েও সে থেমে যায়। কেন ভয় কী? ভয় কিসের? ভেবে সে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে স্থির চোখে বলে, "থ্যাঙ্কস্ এনিওয়ে।" তারা তিনজন হাসির গর্‌রা তুলে নদীর ধারে সরে আসে। বোতলের মুখ খুলে ঠোঁঠের কাছে তোলে, তারপর একযোগে বলে ওঠে, "চিয়ার্‌স্"।

সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় ওঠার সময়ে কয়েকবার ফিরে যাওয়ার কথা মনে এসেছে। নিচে দিশেহারা যেন, দাঁড়িয়েছিল কতক্ষণ। না, পা টলছে না, কথাও স্পষ্টই বেরবে। কিন্তু চোখের কোণে লাল আভা সকলের কাছে স্বাভাবিক না-ও মনে হতে পারে। যেমন চিরকাল, ক্রোধ জন্মায় মনে, কী প্রয়োজন ছিল অমন সাহস দেখাবার?

অন্যদিন হলে হয়তো এমন সময়ে ঘরের সব আলো জ্বালাতে হতো না। কিন্তু পরিচিত মুখও আবছায়ায় প্রিয় হয় না বলে সবগুলো ল্যাম্পই জ্বালানো। ঘরের কোণে আকাশছোঁয়া 'বিন্‌স্টক' চোখ পড়ে। ঘরে একজন অতিথি আছেন। গৃহকর্তা পরিচয় করিয়ে দেন, "আমার বন্ধু। ঐ যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিল" বলে তার দিকে তাকান। ঐ এক কথাতেই তাঁকে চিনে নেওয়া উচিত ছিল তার, কিন্তু সে পারে না, সঙ্কোচের সঙ্গে "ও, হ্যাঁ", বলে চেয়ারে বসে।

"গত সপ্তাহেই দেশ থেকে এসেছে" বলে গৃহকর্তা অতিথির পরিচয় দেওয়া শেষ করেন।

"আপনার ঐ গাছের কথা শুনছিলাম", আমোদের স্বরে অতিথি বলেন, "আপনার ঘরে নাকি দু'বছরেও বাড়েনি, আর এখানে আট মাসেই এমন।"

"আমি তো তেমন যত্ন করতে পারিনি", হেসে যে-কথা উড়িয়ে দিতে হয়, তার জবাবে নিচু গলায় বলে সে, "এই প্লান্টের চরিত্রই অমন। ঠিকমতো জল, আলো পেলে দ্রুত বেড়ে যায়।" অমন চিংড়ি ব্যবসায়ী, পোর্টে জাহাজ বোঝাই মাল আসবে আর দু'দিন বাদে, মিলিয়ন ডলারের চালান, তার সামনে বলাবার মতো আর কোনো কথা খুঁজে পায় না।

আলাপের মাঝখানে একবার অতিথি বলেন, আট মাসের মাথায় তার ফিরে আসার প্রসঙ্গ টেনে এনে, "আপনাকে দোষ দিই না, দেশে থাকবার মতো আর অবস্থা নেই", এবং একটু থেমে "তবে এক রকমের কমিটমেন্টও থাকা চাই, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদেরই দেখুন না, ইচ্ছা করলেই তো এদেশে থেকে যেতে পারি, যেকোনো সময়ে", বলে কথা শেষ করেন।

সে উঠে দাঁড়ায়, অস্থির, "আমি, চলি এবারে।"

কয়েকবার মাটিতে নামাতে হয়েছে হাতের ভার। বইতে পারছিল না বলে নয়, হাওয়ায় সরু বাঁশের মতো গাছটি ক্রমে এদিক-ওদিক কাত হয়ে পড়ে যেতে চায়। কিছুতেই সোজা পা ফেলে এগোতে পারে না। এই রাস্তার পাশে বাঁধানো ফুটপাত নেই। সব রাস্তায় থাকে না। শুকনো পাতার রাশি মাড়িয়ে ঘাসের উপর দিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছিল, ফলে প্রায় রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটে সে। দু'পাশে সারিবাঁধা মেপ্‌ল্‌, আকাশিয়া, ওয়ালনাট পাতা ঝরাতে শুরু করেছে অনেক আগেই, তবুও কিছু পাতা ছিল তাদের শরীরে তখনও। দু'পাশে ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলো মাঝে মাঝে ভেঙে যায় তাতে। হাওয়ায় বেগ একটু বেড়েছে মনে হয়। বাতাসে ঠাণ্ডার ধারও। দু'হাতে শক্ত করে পাত্রটি ধরে রাখার জন্য আঙুলগুলো বেশ অবশ হয়ে আসতে চায়। মাঝে মাঝে মাটিতে নামালেও লাভ হয় না। দমকা হাওয়া গাছ পাত্র সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। সিঁড়ি দিয়ে অতি সাবধানে নামবার সময়ে ভাবছিল ঘরে নিয়ে যাবে কী করে। ট্রাঙ্কের ভিতরে শুইয়ে শরীরটাকে হয়তো বাঁকিয়ে দিতে পারা যাবে, না হয় পেছনে বসিয়ে পাতাসুদ্ধ মাথা কোনোমতে ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া। গাড়ির বন্ধ ট্রাঙ্কের উপরে যখন হাতের ভার নামাল তখন নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে তার। কান গরম, সম্ভবত কপালে ঘামও। আর তখনই তার মনে পড়ল ট্রাঙ্ক বন্ধ। খোলবার উপায় নেই। ক'দিন আগে তালা ভেঙে ট্রাঙ্ক খুলেছিল যারা তাদের লাভ কিছু না হলেও, তার অসুবিধে হচ্ছে অনেকই। ভাঙা তালায় চাবি কাজ করে না। খেয়াল হয় আসবার পথে তুলে আনা লন্ড্রির ব্যাগ দুটো পেছনের আসন দখল করে আছে। নদীর পাড়ের ঐ পার্ক থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসার জন্য এই দিক দিয়েই যেতে হয়। একমুখো রাস্তা সব। মাঝে মাঝে দু'একটি গাড়ি তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল হর্ন বাজিয়ে, তাকে সাবধান করার জন্যই।

হাওয়ায় উড়ে না যায় ট্রাঙ্কের উপর থেকে এই জন্য প্ল্যান্টারটি দু'হাতে তার ধরা, কী করবে ভেবে পায় না, অথচ ব্যবস্থা কিছু দরকার। ঝড়ই কেবল নয়, বৃষ্টির ফোঁটাও পড়তে শুরু করেছে। পাড়ার পেছন দিক, দোকানপাট নেই, কোনো দরজা, ছাউনি কিছু দেখা যায় না, কেবল নিচু গাড়ি রাখবার জায়গা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হর্ন বাজিয়ে ট্রাকটি তার পেছনে এসে দাঁড়ালে চমকে ওঠে সে, বিস্মিত হয় না। জানালার কাচ নামিয়ে চিৎকার করে ওঠে তারা, পুরনো বন্ধুকে দেখলে যেমন, এক পাত্রের ইয়ারের সঙ্গে যেমন, "হে ম্যান, হোয়াট্‌স আপ?"

দ্রুত দরজা খুলে বেরিয়ে আসে দুজন। পলকে সব বুঝে নেয় সে। গাড়ির চালক ভিতরে বসা, ইঞ্জিনের শব্দ। "নাইস প্ল্যান্ট" একজন বলে, "এ লিটল বিগ দ্যো" এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে "লেটস টেক ইট", বলে তাকে কোনো রকম কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে পাত্রটি ধরে টান দেয়।

বৃষ্টির ফোঁটা ঘন ঘন পড়তে শুরু করেছে, হাওয়ায় গাছে ডালে পাতায় শব্দ, হাতে-ধরা গাছের পাতায় সর্‌সর্‌, হেডলাইটের আলো তার শরীরে। কিছু যেন একটা ঘটে যায়, ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে কিছু, বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে যেন চোখে আগুনের হল্‌কা, শক্ত করে পাত্রটিকে দু'হাতে ধরে বলে সে, "লীভ মি অ্যালোন।"

"কাম অন" চিৎকার করে গাড়ির চালক। তার হাত ঝটকা টানে সরিয়ে দেয় একজন, আর একজন দ্রুত তুলে নেয় পাত্রটি, উঁচুতে তুলে ধরে ছুঁড়ে মারে সিমেন্টের রাস্তায় এবং মুহূর্তে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝাঁপ দিয়ে গাড়িতে উঠে যায়। গাড়ির পেছনে লাল আলো ও মিলিয়ে যাওয়া সম্মিলিত হাসির দিকে স্তম্ভিত চেয়ে থাকে সে।

মাথায় উপর শূন্যপত্র ডালপালার ফাঁক দিয়ে পড়া আলো কাঁপছে রাস্তায়। নিচু হয়ে সে দেখে কয়েকটি টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে বৃক্ষের আধার। বৃক্ষটি ভূমিলীন। চাপ চাপ মাটিতে জড়িয়ে আছে সরু-মোটা দড়ির মতো অসংখ্য শেকড়ের জাল। যেন লম্বা হয়ে রাস্তায় আড়াআড়ি শুয়ে আছে সে। বৃষ্টির তোড়ে দিশেহারা ছুটে আসা ভিন্ন এক যান এবারে আর কিছু দেখে না, ছুটে চলে যাওয়ার সময়ে ঐ শরীর সহস্র টুকরো করে দিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়

খেলার সাথিদের উপহাসে, অপমানে, সে কিছু নয়, ভীতু, কুঁকড়ে থাকে এই সব কথায় সে যদি জেদ করে, না-বুঝে বনে ঢুকেই থাকে তবু ঐ জ্যোৎস্না রাত্রিতে কেন পথ হারাবে?

স্পষ্ট মনে আছে গুলঞ্চ লতার শক্ত বাঁধনে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আশশ্যাওড়ার ডাল, সারি সারি গর্তের ঠিক মুখে। যদি ভিতরে থাকে সে ঘৃণা ও ত্রাসের জীব, ধরা পড়বেই। এই বেড়া ভেঙে বেরবে কী করে? আর যদি বাইরে থাকে তাহলে ঢুকবে কী করে? গৃহহারা প্রাণী এই বনে ছটফট করে বেড়াবে। গুলঞ্চ লতার বাঁধন, মাটির গভীরে পুঁতে দেওয়া ডালের বেড়া ভাঙে সাধ্য কী? সে স্বচ্ছন্দে শিকার পাহারা দেবে, সকালে উড়বে তার সাহস আর তেজের নিশান।

ক'দিন আগে পড়ন্ত বিকেলে তারা এই বনেই ঢুকেছিলো। নদীটির বুকে ক্ষীণ স্রোত সারা দিনের হাওয়ায় নকশা-কাটা বালিয়াড়ির সীমায় মিশে বয়ে যাচ্ছিল। স্বচ্ছন্দে হেঁটে ঐ স্রোত পার হওয়া কিছু নয়। ডাইনে তাকালে নদীর বাঁক নেওয়ার মুখে ধু-ধু বালুর চর। সেখানে খর দুপুরে এক বজ্রাহত অস্বাথ দাঁড়িয়ে ছিল একদা। লোভী ব্যবসায়ী জ্বালানির জন্য আমূল তাকে তুলে নিয়ে সেখানে রেখে গেছে পাতালস্পর্শী গহ্বর। কিনারায় দাঁড়ালে যেন নিচে মাটি দেখা যায় না। নদীর বাঁক ফিরলে আছে ওপারে হলুদ সরষের খেত, এই জ্যোৎস্নায় বর্ণহীন, তারপর ভিন্ন গ্রামের কৃষ্ণরেখা বুঝি।

বাঁয়ে তাকালে দেখা যায় শিমুলতলার নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া এই নদীরই আর এক চেহারা। নৌকায় পার হয় ওয়ার্ডেনের বাগানে কর্মী কয়েদি, জেলখানার প্রাচীর। সোজা দেখা যায় আদালতপাড়ার বাঁধানো ঘাট, নদীর বুক থেকে বড় বাজারের দালানকোঠার দেয়াল উঠে যাওয়া। যেন ঐ দালানের মাথায় পা রেখে উড়াল দিচ্ছে রেললাইনের পুল, কাঁধে ধরা আছে পায়ে চলার কাঠের রেলিংঘেরা রাস্তাও।

তাই স্বচ্ছন্দে হাঁটুর উপরে কাপড়টুকু তুলে নদী পার হয়ে বনে ঢুকেছিল তারা। এবং এই না-কিশোর না-বালক না-তরুণ দল প্রায় খেলাচ্ছলেই, যে খেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

তাদের মানায় না, বুনো দাঁতাল, অন্ধকারে নীল চোখ শৃগাল, কী সামান্য শজারুর বাসাও হতে পারে বুঝেও গর্তের মুখে পর পর তিন পরতে গুলঞ্চ-আশশ্যাওড়ার বেড়া দিয়েছিল। কোনো প্রয়োজন ছিল না, শিকারের জন্য নয়– এ বনে বাঘ থাকে না, চিতাও না, বড়জোর ডাঁশ কী বনবেড়াল। শুধুই খেলা, কেবল কোলাহল, যদি ধরা পড়ে, যদি আটকায়, এই তুচ্ছ ভাবনায় খড়কুটোর খেলায় মেতেছিল তারা। ফিরে যাওয়ার সময়ে বারবার টেনে দেখেছিল– শক্ত, মজবুত।

অথচ এখন সেই বেড়ার চিহ্নও দেখতে পায় না সে। কেবল একলা বলেই কী? পথের চিহ্ন হারিয়ে গেছে বলেই কী? ছড়ানো-ছিটানো, কখনো মাথা উঁচু, কখনো নিচে পড়ে-থাকা গাছের জঙ্গল, যাকে আদৌ 'বন' বলা যায় না, সেখানে সে কেন পথ হারাবে? হালকা পাতার ফাঁক দিয়ে তরল জ্যোৎস্নার রাশি রাশি ছবি ছড়ানো চারপাশে, হাঁটলে তার গা পিছলে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে কিছু কিছু। স্পষ্ট দেখে সে পায়ে-হাঁটা পথ স্বচ্ছন্দে চলে গেছে নদীর দিকে। সে জানে আর খানিক এগোলেই বাঁশবাগানের সীমানায় আছে বসতি, আছে অড়হরের খেত, আছে বাবলার ঝোপের পাশ দিয়ে ফুলপুরের লালমাটির রাস্তা, সে কেন পথ হারাবে?

ভয়ে চোখ বন্ধ নয় তার। স্পষ্ট সে চারপাশ দেখে, যা দেখা যায়, যতদূর দেখা যায়। অন্ধকারে মিশে দাঁড়ানো গাছের ডালে, কী পাতায়, কী শেকড়ে, জ্যোৎস্নার ছায়া। ঝরাপাতা পড়ে আছে পায়ের নিচে, চারপাশে ছোট ছোট শুকনো ডালপালা, সবই দেখে সে। কান পাতলে সে শুনতে পাচ্ছে ঝিঁঝিঁর আওয়াজ, ক্বচিৎ ঘুমে পাশ-ফেরা ডাল থেকে ডালে আরামের খোঁজে উড়ে যাওয়া পাখির শব্দ, কী দূরে নিশাচর তক্ষকের ভীত আওয়াজ।

সে কেন ভয় পাবে? সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎস্পর্শ। রোমকূপেও উত্তেজনা, ভিন্ন বোধে শিহরিত না-বালক, না-কিশোর, না-তরুণ, না-যুবক সে কেন ভয় পাবে? কিন্তু তখনই সে দেখেছিল নদীর দিকে তারই পথ ধরে চলে যাচ্ছে অশরীরী মূর্তি, লোকালয়ের দিকে।

ছায়া তখনই উঠে এসেছিল। সাদা কাপড়ে মোড়ানো। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ দ্রুত আসে, দ্রুত যায়, ফসল কাটা মাঠে কুয়াশার হালকা চাদর, সেখান থেকে উঠে এসেছিল অশরীরী। জ্যোৎস্নার আলোয় হয়তো তার শ্বেতবসন ঝলসাত, কিন্তু তখন আলো নেই বলে বিমূঢ় দৃষ্টি কোনো রঙ ধরতে পারেনি। মাঠের রাস্তা থেকে দ্রুত পুকুরের পাড় ধরে, বেঁকে, পুকুরের ঐ পার বরাবর চলে যায় মধ্যনিশার কুহক, বিদেহী রমণীই নিশ্চয়। তারপর মিশে যায় দুই বাড়ির মাঝখানে ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গল, উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ঝাঁকড়া তেঁতুল আর কামরাঙ্গার বনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁটু সোনার গুণিন নয়। গুণিন হলে অত বড় ভুল সে করত না। অন্তত প্রথমেই চোখ পড়ত পায়ের দিকে। শরীরহীন যারা বাতাসের সঙ্গে কখনো ভাসে, কানের পাশে হিমশ্বাস ফেলে, মুহূর্তে মিশে যায় শূন্যে যারা, তারা মাটিতে পা ফেলে না, এই কথা তার শোনা ছিল। মাটির অন্তত এক হাত উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়।

পলোর মুখে হাত ঢোকানো তার, সদ্য পোনা মৃগেলটির মাথা চেপে ধরেছে সে, শক্ত হাতে তুলে নিয়ে তীরে ছুঁড়ে দেবে, সঙ্গী তীরে দাঁড়ানো, খলুই হাতে। আবছা আলোয় দাপানো মাছটিকে সে চিনে নেবে স্থির, তারপর নিঃশব্দে তুলে নিয়ে রাখবে কুকীর্তি ঢাকার পাত্রে। অনেক কষ্টের, অনেক খরচের পোনা, সবে পাখনা দুলিয়ে চলতে শুরু করেছে যারা, তাদের ঝাড়েবংশে শেষ করবে কেউ দ্বিতীয়ার অন্ধকারে, কোনো গৃহস্থই তা মানবে না।

মাছের পোনা তার হাতে ধরা ছিল, সঙ্গীর অবশ হাত থেকে খসে পড়েছিল খলুইটি। চোখে পলক পড়েনি কারো, আর ঠিক তখন জোনাকিগুলোও উড়ছিল না, মধ্যপ্রহরের ঘোষণা দিচ্ছিল না শিবাকুল, গাছের ডগায়, ঝোপে, তেঁতুলতলায়, দূরের জঙ্গলে যেসব নিশাচর ক্রমাগত শব্দে রাত্রির শাসন অগ্রাহ্য করে তারাও যেন চুপ ছিল।

অশরীরী কায়া হাওয়ায় মিলিয়ে গেলে, বাঁটু সোনার প্রায় লাফ দিয়ে তীরে উঠেছিল। সামান্য দাঁতে দাঁতে শব্দও হচ্ছিল বুঝি তার, সঙ্গীকে বলে, "চল, ঘরে চল।"

"ওটা কী?" প্রশ্নের জবাবে সে "কইতে নাই" বলে ভাগ্নেকে হাত ধরে টান দিয়ে বাঁশবনের ছায়ায় দ্রুত ঘরে ফিরেছিল। সেই রাতে বাঁটু সোনারের গায়ে বেশ তাপ দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু কেন, কী জন্য? হোক সে অশরীরী কুহক, কী জিন, সামান্য ক'টি মৃগেলের পোনা অন্যের পুকুর থেকে না বলে তুলে নেওয়ার অপরাধে অমন শাস্তি দেবে?

ঘরের দরজা ঈষৎ ভেজানো ছিল কেটু সরকারের। কেটু এক সময়ে দূরদেশে ছিল। এখন কেবল অশান্ত বয়স, অতৃপ্ত বাসনা, রমণীসঙ্গের আকুতি নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

পাড়ার স্বৈরিণীকে খবর দিয়েছিল সে। স্বামী পরিত্যক্তা, দরিদ্র পিতার কন্যা বলেই সে স্বৈরিণী অপবাদ একথা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল না কেটুর। পাড়ার পথে কখনো দেখা, চোখে চোখ পড়েছে, শাড়ির আড়ালে পুষ্ট যৌবন তাকে মাতালও করেছে নিশ্চয়ই। বিয়েবাড়ির ভিড়ে, গোলমালে, সিঁড়ির নিচে টেনে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

তাকে জাপটে ধরলে সে যদি কিছু না বলে থাকে তাহলেই কেন ধরে নেবে যে সেও রমণাকাঙ্ক্ষী? ঐ সময়ে চিৎকার যে তার অপবাদ ঘোচাবে না বলেই শব্দ ছিল না তার মুখে একথা কেটু বোঝেনি। 'কাল রাতে আসিস', বলে সে লোক আসার ভয়ে দ্রুত সরে গিয়েছিল।

ভিতরের দরজা বন্ধ কেটু সরকারের। ঐ দরজা খুলে প্রতিদিন সে মাথা নিচু করে যায় কয়েকবারই, গ্লানি মনে জমা থাক যতই, শরীর কিছু বোঝে না। পিতামাতার সেই পর্বতপ্রমাণ আশা যে এখন মাটিতে মিশে গেছে, সে বোঝে না এমন নয়। কিন্তু স্রোতহীন জলার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে সে বেওয়ারিশ লাশ যেন, মরণ চিন্তা ছাড়া আর কোনো সুখ আছে তার?

তবুও ছায়া উঠে এসেছিল।

বাইরের দরজা ঈষৎ খোলা। জানালার পাশে দাঁড়ানো আবছায়া গাছপালা, বেলী-টগরের ঝোপ, তারপরে উঠোন পার হয়ে আর কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। পাড়ার পেছন দিয়ে এই রাস্তা ফসলের মাঠ থেকে, পুকুরের পাড় বরাবর এসে উঠেছে ঘরের দরজায়।

কুয়াশার চাদর মেলে ধরা ছিল উঠোনের মাথায়। আর তখনই কেটু দেখেছিল, উঠে আসছে সাদা কাপড়ে মোড়া পরম কামনার দেহ বুঝি তার। কিন্তু শরীর নেই যার সে কখনো মাটিতে পা ফেলে চলে না এ কথা সে-ও জানত না।

প্রবল বর্ষণের সময়ে যখন মাঠঘাট একাকার হয়ে যায়, মাটির দেয়ালের মাথার ক'টি ঢেউটিন এই পড়ে যাচ্ছে মনে হয়, খালের পুঁটি, কৈ, টাকি নদী ছেড়ে, স্রোত বরাবর মাঠ পার হয়ে উঠে আসে তার ঘরের পেছনের ডোবায়। ছোট্ট বড়শির ছিপে ভাতের টোপ দিয়ে কৈ-পুঁটি ধরে বেড়ায় যে সে যুবতী নয়। উঞ্ছবৃত্তি যার বাঁচার উপায়, স্বামী, পুত্র, আত্মীয়-পরিজনের স্মৃতিও যার মলিন, সে কখনো যুবতী হবে না। সে জন্যই সম্ভবত পাড়ার শেষ প্রান্তে সরু পায়ে-হাঁটা-পথের পাশে, ঘরের দাওয়ায় কখনো শুয়ে থাকলে নিজেকে সবদিক থেকে ঢেকে রাখার প্রয়োজনও তার ছিল না।

তাই তার শরীর শুঁটুর চোখে পড়েছিল। ঐ রুক্ষ মাটি থেকে ধুলো উড়ছিল তখন, রোদে পুড়ে যাচ্ছিল সব, বাজারে নিকারির ডালা নৌকায় তুলে দিয়ে ঘরে ফেরার পথে শুঁটুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ছিল। পথ কমানোর জন্য উঁচু নিচু মাঠে হাঁটার কষ্টও ছিল তার, তাই ঐ মুহূর্তে তৃষ্ণা না-মেটালেই নয় মনে করে বারান্দার কাছে সরে গিয়েছিল। ত্রস্তে উঠে বসার কোনো কারণ ছিল না। অপরিচিত নয়, একাকার বর্ষার ছিপে মাছ ধরার সঙ্গীও ছিল কখনো; তাই আস্তেই উঠে বসেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে, বিবর্ণ শাড়িটি দ্রুত গায়ে জড়ায়নি। শুঁটুর কোমরে সারাদিনের উপার্জন গোঁজা ছিল, সে দেখিয়েছিল।

"অহন না, রাইতে আসিস", বলে থাকলে কী এমন দোষ করেছিল সে? দুটি টাকা তার দু'দিনের জীবন তো নিশ্চয়ই।

তবুও ছায়া উঠে এসেছিল। বন্ধ্যা জামরুল, দুটি নোনাফল আর ভাঁটের জঙ্গলেও দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্না পড়ে। রাতে সে কোথায় থাকে এ নিয়ে শুঁটুর মা কোনোদিন তুলকালাম করে না, তাই নিশ্চিন্ত শুঁটু পাড়ার পথের শেষে টেউটিনের চালায় ঢুকবে বলে বারান্দায় পা দিয়েছে যখন, ঘরের দরজা খোলাই ছিল, সে-ও দাঁড়ানো ছিল দরজায়, তখনই সাদা কাপড়ে মোড়া কোন্ সেই ছায়া শিমুলতলা থেকে উঠে এসে, কচুখেতের পাশ দিয়ে, জামরুল গাছের নিচ দিয়ে, চালার সামনে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল। সদ্য আলিঙ্গনে তারা, সন্ত্রস্ত হয়ে সরে আসার মুহূর্তে অন্য সকলের মতোই ঐ ভুলটিই করে বসল। পায়ের দিক তাকায়নি। ততক্ষণে ছায়া অদৃশ্য। ঢালু পাড় বেয়ে নদীর বুকে। হোক না তারা দুই পৃথিবীর, বাস তাদের অসম্ভবের দুই পারে। ঐ মিলনের সময়ে কেন তাদের সরিয়ে দেওয়া?

কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে দেখেছিল শ্বেত কায়াহীন ছায়া চলে যাচ্ছে। এবং ছায়া মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তক্ষকের ডাক, ডাঁশ আর খাটাশের গর্জন, শিকারের আশায় ঝাঁপ দেওয়ার জন্য পা উঁচু করেছে নিশাচর, তার চোখে পড়ে যায়। সে প্রায় বিভ্রমে তখন যেন, দ্রুত ফিরে ছুটতে থাকে পাতাঝরা বনের পথ দিয়ে। দু'একটা শুকনো ভাঙা ডাল পায়ে জড়িয়ে দু'একবার মাটিতে পড়ে গেলেও আবার দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করে সে। পথ ও সামান্য জঙ্গলের সীমানা পার হয়ে দেখে সে নদীর পারটিতেই আবার।

চেনা নদীর বুকে তখনও তেমনি ক্ষীণ স্রোত, কিন্তু দ্বিতীয়ার চাঁদ মেঘের ওপারে চলে গেছে বলে স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী তখন কৃষ্ণবর্ণ। বালিয়াড়ির নকশা সে আর দেখতে পায় না, নদীর ঢালু পারে বালির রাশি রাশি কণায় পা ফসকে যাচ্ছিল বারবার, কোনোমতে পারে উঠলেই দেখবে মিশকালো দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে লোকালয়। কিন্তু সে হাতের বাঁয়ে, নদীর বাঁক যেখানে, হলুদ শর্ষেক্ষেতে যেখানে আর কোনো রংই নেই, আমূল তুলে নেওয়া অশ্বত্থের শূন্য মূলাধার বিশাল এক গুহা যেখানে, সেইদিকে ছুটতে থাকে।

পায়ে তখনও তার কিছু শক্তি ছিল। ঢালু পাড়ের শেষ মাটি কেটে বানানো ক'টি ধাপ দ্রুত পার হয়ে উঠে আসতেই সামনের ঐ গুহা চোখে পড়ে তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে জানে গর্তের মেঝেতে বালুর আস্তরণ অনেক গভীর। চারপাশ উঁচু শিকড় তুলে নেওয়া গর্তের একটি দিক খোলা, নদীর ঢালু বুকেই নেমে গেছে আবার। ছুটির দুপুরে স্নানের সময়ে গর্তের পার থেকে লাফ দেয় তার সাথিরা। বালির মেঝেতে পড়ে খোলা ফাঁক দিয়ে বেরয় তারা, ঢালু পার দিয়ে উঠে আবার ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সে কখনো পারেনি। গুহা এমন গভীর নয় যে তাকে টেনে নিয়ে যাবে কোন্ অতলে, জেনেও সে কখনো পারেনি। বন্ধুদের হা হা হাসি, বিদ্রূপ কিছুই তাকে সাহস দেয়নি।

কিন্তু এখন সে ঝাঁপ দিচ্ছে। ভয়ে, না লোকালয়ের দিকে পেছন-ফেরা বলে, কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে, কিন্তু দুটি হাত তার উঁচু করে তুলে ধরা, পা দুটি মুড়ে নিয়ে– যেমন নিতে হয়, তারপরে সে নিচে পড়তে থাকে।

ঠিক তখনই দ্বিতীয়ার চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। স্পষ্ট দেখে সে হাতের ডাইনে মাঠভরা বিবর্ণ রবিশস্য, সামনে আবার বালিয়াড়ির নকশা, সে কেবল মুহূর্তমাত্র, তারপরে মাটির দেয়ালের দিকে মুখ করে পড়তে থাকে।

তখন গুহার কিনারায় এসে ভিড় জমাচ্ছে, সে উপরে চাইলেই দেখতে পেত, বাঁটু সোনার আর তার ভাগনে, কেটু সরকার আর শুঁটুই, এবং তৃষ্ণায় শান্তিদায়িনী বর্ষীয়সী, তারা সবাই নিচে তাকিয়ে আছে। দেখছে বালির মেঝেতে শুয়ে আছে সেই কায়াহীন শরীর, ছায়া !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিনিক্স

তিন দিন তুষারপাতের পরে সেদিন সূর্য উঠেছিল। কিন্তু রবিকরের তাপ প্রখর না থাকায় স্ফটিকে আচ্ছাদিত তরুশাখা থেকে তখনও তুষার কণিকাই কেবল খসে পড়ে। আরও বেশি বেলায়, খর রৌদ্রে নীরবিন্দু হয়ে ঐ তুষার রাশি ঝরে পড়লেও হাঁটুসমান বরফে হেঁটে চলা দুঃসাধ্য।

সদাব্যস্ত রাস্তাটিতে তখনও কোনো সাহসী যান দেখা যায় না। প্রতিদিন অনেকবারই বরফ পরিষ্কারের যেন সাঁজোয়া গাড়ি শ্বেত পুরু আবরণ ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ করার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে রাস্তার দু'পার্শ্বে কেবল শুভ্র অতিকায় পর্বতেরই সৃষ্টি হয়। আরও কয়েক ঘণ্টা পরে অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়েও তাকে কেউ পৌঁছে দেবে উদ্দিষ্ট যাত্রাবিন্দুতে, এ ভরসা হয় না। গত রাতে বাঁধাছাঁদার সঙ্গী বান্ধব কয়েকজন ঘরেই ছিল, তার যাত্রার সময় পর্যন্ত থাকবে যারা, নিশ্চিন্ত করে তাকে। এই রকম থাকলে সন্ধ্যায়, ভারি স্টেশন ওয়াগন কখনোই বরফে অচল হবে না।

সেই মহা বালিরাশি সূর্যের আগুনে ঝলসে চলেছিল তখনও। হাওয়ার দাপটে প্রায় অন্ধ করে দেওয়া বালির ঝাপ্‌টা থেকে বাঁচবার জন্য মুখ-মাথা কাপড়ে ঢাকা। চোখটুকু কেবল খোলা দেখা যায়। কালো চশমা সঙ্গে ছিল না কারো মনে হয়। এই জনশূন্য, বৃক্ষলতাহীন, কেবল ছড়ানো পাথর আর বালির মাঝে বেঁচে থাকা শক্ত কাঁটাগাছের ঝোপে আশ্রয় নিতে হবে কারো জানা ছিল না।

প্রচণ্ড বালুঝড়ের মাঝে যখন নামতে বাধ্য হয়েছিল উড়োজাহাজ তখন তারা সাত জন ছিল দেখা যায়। মৃত্যু তখনও তাদের গ্রাস করেনি বলে রক্তাক্ত ক'জন দরজা খুলে লাফিয়ে নিচে নেমেছিল, পরে দড়ির মই ঝুলিয়ে ওঠানামা সহজ করলেও গুরুতর আহত সঙ্গীটিকে তারা নামাতে পারেনি। অনেক চেষ্টাতেও, সঙ্গে আনা জরুরি চিকিৎসার সব উপকরণ ব্যবহার করেও, রক্তপাত বন্ধ করতে পারেনি তারা।

আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল সঙ্গে, ছিল কিছু খাদ্যও। প্রাণে বাঁচার জন্য তাই দরজা টেনে তুলে রাত কাটায় তারা। মরুভূমির নিশাচর প্রাণীর চেহারা কী, কেউ জানে না। বালির ঝড় থেমে গেলে ঊষর মরুর স্বচ্ছ আকাশে অনেক তারা ফুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আছে, দেখা যায়। কখনো দমকা বাতাসে আদিগন্তবিস্তারী ঢেউ-খেলানো ধূসর প্রান্তরে কেবল ক্যাকটাসের ঝোপ মাথা নাড়ে। উঁচু ঢিবিটির বড় পাথর অতিকায়, অস্পষ্ট, তারার আলোয়।

সময় ভালো নয়, তার পক্ষে নয়। একথা সকলেই বলে। এমন সময়ে, এতকাল পরে, সে যতই সুনির্দিষ্ট মনে করুক না, এই যাত্রা সর্বতোশুভ নাও হতে পারে, এও তার অজানা ছিল না। কিন্তু মুখে কিছু বলে না সে।

নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে সে যখন পরম উৎকণ্ঠায় প্রায় বাক্‌হীন তখন চাকায় শেকল লাগিয়ে গাড়ি এসেছিল। সব তুলে প্রায় যেন পথচারীরর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে এমন বেগে গাড়ি এসে বড় রাস্তায় উঠেছিল। সে তখন নিশ্চিন্ত, সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তার নির্দেশনামা সব পড়তে থাকে। লম্বা লাইনের শেষে দাঁড়ালেও দ্রুতই সে সামনে এগোয়, যখন ভিতরে ঢোকবার সময় আসে তখন পরিচিত বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের দিকে তাকিয়ে নিরাপত্তাবেষ্টনীর মাঝে ঢুকে যায়। কিন্তু পকেটের চাবির গোছাই হোক, কী ধাতব মুদ্রাই হোক, নিরাপত্তা-বাহিনীকে সতর্ক করে দেয়। তারা তখন জামা-কাপড় থেকে শুরু করে সঙ্গে আনা ব্যাগ দুটি উল্টেপাল্টে দেখে। সে শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত অথচ কেন জানো না।

আকাশপথে মাঝে মাঝে প্রবল হাওয়ার টান উড়ন্ত যানকে টালমাটাল করে দেয়। চালক চেয়ারের বেল্ট বেঁধে নিতে বলে। বিমানটি থরথর কাঁপে। মুহূর্তে নিচের দিকে পড়ে আবার দ্রুত উঠে যায়, সে বুঝতে পারে। শক্ত হাতে চেয়ারের হাতল ধরে থাকে সে। পরিষ্কার আকাশেও শ্বেতঘূর্ণির কথা জানা আছে তার। দুর্ঘটনায় নিহত বিমানযাত্রীর সংখ্যা এমন কিছু কম নয়। সামনে ঝোলানো ছোট পর্দায় চোখ রেখে সব ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

সকালে বিমানটি ভালো করে দেখে তারা। চালক ও তার সহকারী একজন প্রকৌশলী এবং দেখা যায় আছে যাত্রী চারজনের মধ্যে একজন বিমানের কাঠামো নির্মাণে পারঙ্গম। চারটি ইঞ্জিনের মধ্যে দুটি ইঞ্জিনই বিকল। বিমানের কাঠামো সামনের অংশ থেকে প্রায় বিচ্যুত। জ্বালানি কিছু অবশিষ্ট আছে ঠিকই; কিন্তু চাকা তিনটিই বালির স্তূপে আটকা, টেনে তুললেও ওড়বার গতি সঞ্চয়ে যে দৌড়ের দরকার তা অর্জন করা যাবে না। হতাশ তারা অবশিষ্ট খাদ্যের কিছু ব্যবহার করে দ্বিপ্রাহরিক আহারের আয়োজন করে। কম্পাস ও ম্যাপের সাহায্যে নিজেদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করে চালক ও তার সহকারী। অন্তত দু'দিনের হাঁটাপথে যে লোকালয় তা শত্রুপক্ষের। বিপরীত মুখে বিমানে এক ঘণ্টা উড়লেই মিলবে নিশ্চিত আশ্রয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রাতে কিছু বিচিত্র শব্দ শুনে সাহসীজন যারা ইতোমধ্যে বিমানের বাইরে বালির বিছানায় শুতেই অভ্যস্ত, বুকে হেঁটে সেই উঁচু পাথরের ঢিবির কাছে যায়, দেখে ছোট কাফেলা– রাত্রিবাসের জন্য গোল করে বসা। ক'টি উট, মাঝখানে আগুন। মিত্রপক্ষের নয় নিশ্চিত জেনেও একজন অসম-সাহসী সেইদিকে এগোয় সঙ্গের পিস্তলটিকে নিয়েই। সারা রাতে সে ফিরল না। প্রত্যুষে দেখা যায় কেবল সাহসীজনের মৃতদেহটি পড়ে আছে, কাফেলা অন্তর্হিত।

মধ্যবর্তী এই বন্দরে এত দীর্ঘসময় কাটানোর কথা ছিল না। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া কী অন্য কোনো কারণে সকলকেই বসে থাকতে হয়। গন্তব্যের এত কাছে এই অপেক্ষা বড় ক্লান্তিকর। অগত্যা ভিন্ন দেশের বিমানবন্দর যতটুকু পারা যায় ঘুরে দেখে সে। অপরিচিত মুখ, রক্ষীবাহিনীর সদাভীতিপ্রদ আচরণ, তাকে কিছু সন্ত্রস্ত করে। কোন্‌দিকে পা ফেললে অপরাধ না বুঝে সে আবার নিজ স্থানে ফিরে আসে। দেখে যাত্রার সময় তখনও স্থির নয়।

সহযাত্রীদের মধ্যে এই দীর্ঘপথে একরকমের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নিশ্চয়ই। বিশেষত একই গন্তব্যের যাত্রী হলে। তারা উদ্দিষ্টে পৌঁছেও নানা প্রতিকূলতার কথা বারবার উল্লেখ করে, বিশেষত কোন্ উপায়ে নিজ গৃহে পৌঁছাবে তারা এই নিয়ে ক্রমাগত উদ্বেগ প্রকাশ করে চলে। অবস্থাটি সাময়িক নয়, দীর্ঘকালের, কখন কোন্ চেহারা নেবে কেউ জানে না, যান, জীবন সবই অনিশ্চিত, কথায় বোঝা যায়। সন্ধ্যার পরে পৌঁছলে যানবাহনের চলাচল দেখা যাবে; কিন্তু তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ থাকবে কিনা কেউ জানে না। সে চুপ করে সব শোনে এবং নিজ সিদ্ধান্তের কোন মাশুল দিতে হবে কিনা ভাবতে থাকে।

খাদ্যের চাইতেও বড় সমস্যা দেখা দেয় পানীয়ের। হিসাব করে দেখে তারা অবশিষ্ট পানীয়ে কোনোমতে আর মাত্র দু'দিন কাটবে। বাঁচার এই সময়টুকুই কেবল আছে। প্রত্যেকের জন্য পানীয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিলেও দেখা যায় না কৌশলে পরিমাণ ছাড়াতে চায় কেউ কেউ এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ তখন প্রায় জীবননাশী হয়।

প্রায় অসম্ভব অবিশ্বাস্য একটি উপায়ের কথা বলে তখন বিমান তৈরিতে পারদর্শী যে। দু'পাশের দুটি ইঞ্জিন আপাতদৃষ্টিতে অটুট আছে মনে হলেও একটি পাখা মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন কেবল ঐ পাখাটিকে কোনোমতে টেনে এনে এই পাখার সঙ্গে জুড়ে মূল অংশ ফেলে দিয়ে ইঞ্জিন চালু করতে পারলে পাখার নিচে প্রায় ঝুলে এক ঘণ্টার পথ পার হলেই মিলবে নিশ্চিত আশ্রয়– মরুভূমিতে তেলসন্ধানীদের আস্তানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

উন্মাদের প্রলাপ শুনে সকলে তখন পরম ক্রুদ্ধ। বিমানবিদ তার সঙ্গে আনা নানারকম বিমান তৈরির নকশাসহ বইটি দেখায় সকলকে। এই বিমানের পরিকল্পনা এমনই যে, মূল অংশটি বাদ দিয়েই এটি ওড়ানো সম্ভব। আর এ ছাড়া জীবনরক্ষার কোন্ উপায় জানে তারা। অগ্নিবর্ষী সূর্যের নিচে মরুভূমির বালুঝড়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাববে সব ক'টি দেহ আর মাত্র দু'তিন দিন পরেই।

মৃত্যু অনিবার্য জেনেও জীবনরক্ষার তাগিদে এ যেন পবর্তশীর্ষ থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়া। প্রথমে বিমানবিদ নিজে, পরে চালক, তার সহকারী এবং শেষে অন্য তিন জন জীবনরক্ষার নামে মৃত্যুর অপেক্ষায় এই খেলায় যোগ দেয়।

প্রায় দিনশেষে লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু হয় তাদের। অন্ধকারের বুকে উদ্দিষ্ট বন্দরে আলো দেখা যায়। বিমান ক্রমে নিচে নেমে আসে। প্রায় তিন দিনের ভ্রমণে পরিশ্রান্ত যাত্রীকুল ইমিগ্রেশন, কাস্টমস পার হয়ে উৎসুক চোখে পরিচিত মুখ খোঁজে। এবং চোখে চোখ মেলার পর হাতে হাত রাখা বা আলিঙ্গন এই সবও ঘটে।

তার নিকটতম আত্মীয় প্রায় বারো ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করে আছেন, সে জানে নিজ বাক্স দুটি দেখিয়ে বাইরে আসার মুখে। বৃদ্ধ পিতাকে কোনোমতেই এই অবস্থায় সঙ্গে আনা উচিত মনে হয়নি, কারণে তিনি ঐ আত্মীয়ের বাসস্থানেই অপেক্ষায় আছেন।

গাড়ি রাখার ছাউনিতে এসে দেখে হলুদ আলোর সারি যেন কুয়াশার মধ্যে জ্বলে যাচ্ছে আদিগন্ত। সবুজ গাছপালা দূরে দূরে ছায়া ফেলে দাঁড়ানো, কিন্তু কৃষ্ণকায়। কিছু যানবাহনের চলাচল লক্ষ করা যায়। অন্য সময়ের স্বাভাবিক নৈরাজ্য, হট্টগোল অনুপস্থিত না থাকলেও অনেক নিচু পর্দায় মনে হয় তার। অবশেষে 'সংবাদপত্র' লেখা গাড়িটি এসে সামনে দাঁড়ায়। অনেক কষ্টে, অনুরোধে ব্যবস্থা করা এই যানও যে নিরাপদে পৌঁছে দেবে এমন আশ্বাস নেই, তবুও এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

একদা পরিচিত শহরের অপরিচিত রাস্তা ঘুরে ঘুরে গাড়িটি চলে। সে জানালা দিয়ে দেখে মেলানোর চেষ্টা করে স্মৃতির সঙ্গে। দীর্ঘ অদর্শন কী পরিমাণ অপরিচয়ের সৃষ্টি করে সে জানে না। বৃদ্ধ পিতাকে দেখে সে কেবল অনুমানই করতে পারে।

ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ। কোন্ আগুন জ্বলে আছে সন্তানের বুকে তিনি জানেন না। নিজ বক্ষের সব শিখা নিভে গেছে। সে যদি পারে জ্বালাক। খরস্রোতা নদীর শেষ মাথায় দগ্ধাবশেষ কুটিরটিতে সে যদি ফিরতে চায় ফিরুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যরাতে ভিন্ন ঘরে, ভিন্ন বিছানায় সে অনিদ্র। তার ঘুমের জন্য নির্দিষ্ট সময় নয় তখন এ কোনো বড় কারণ নয়। বুকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন, নিরালম্ব অনুভব বাসা বেঁধে আছে দীর্ঘকাল। সেটি প্রশমিত করা যায় কিনা এই চেষ্টা বুঝি বৃথা– এই বোধও তাকে জাগিয়ে রাখে নিশ্চয়ই। এবং এই জাগরণ এবং কখনো তন্দ্রার মধ্যে রাত্রির শেষ প্রহরে নানা শব্দ আবার তাকে বাইরে নিয়ে আসে।

দু'দিন অপেক্ষা করে ভবিষ্যতের কিনারা খুঁজতে বলে সুহৃদ, কিন্তু সে অপেক্ষা করতে চায় না। আগামীকাল কী হবে কেউ যখন জানে না আজই যাওয়া যাক।

জীবনযাত্রা সেদিন স্বাভাবিক। কয়েক সপ্তাহের অনাবৃষ্টি ঐ সকালেই যেন পাতলা কুয়াশার জানান দেয়। বৃক্ষশীর্ষের পত্রটিতেও বুঝি ধূলির প্রলেপ। রিকশা, গাড়ি, ট্রাক, বাস সব একযোগে পাশাপাশি একই দিকে যাওয়ার চেষ্টার বিশাল ভিড়ে সে নীরবেই বসে থাকে।

একটি ইঞ্জিন চালিয়েই বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে তারা। খুঁজে আনে বিমানের সংগ্রহ থেকে মেরামতের অকিঞ্চিৎকর কিছু উপকরণ; কিন্তু ঐ তাদের ভরসা। স্বল্প শক্তির বৈদ্যুতিক ছেনি ভারি ইস্পাতের জোড়া কেমন করে ছাড়াবে ভাবতে গেলে কোন্ সময়েই হাত থেকে সব ফেলে দিয়ে বালির বিছানায় শরীর পেতে দিত তারা, শেষবারের জন্য।

কিন্তু তারা ভ্রুক্ষেপ করে না। সর্বাঙ্গে স্বেদ ও বালির প্রলেপে ভিন্ন গ্রহের জীব যেন সকলে। দুটি দিন ও রাত্রির সমস্ত সময় ব্যস্ততায় মৃত্যুকে দূরে পাঠাতে চায়।

পরিচিত নদীর তীরে সে দাঁড়ায় যখন মাঘ মাসের আসন্ন পূর্ণিমার চাঁদ তখনও অনেক নিচে। বৃদ্ধ পিতা, সঙ্গের বন্ধুটি, আত্মীয়া সকলে সাবধানে খেয়ায় উঠে বসতে দেখে ম্লান এক রকম চন্দ্রকিরণ পরপারের গাছ বা কুটির কিছুই স্পষ্ট করে না। কেবল প্রদীপ বা লণ্ঠনের শিখাই জনপদ বোঝায়। আকাশের দিকে তাকালে অস্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়ে ফুটে-ওঠা কিছু তারা যেন সে দেখে। অন্য কোন বর্ণ দৃষ্টিতে আসে না এবং এই ভাসার সময়ে সম্মুখের সব কথা মুহূর্তের জন্য সে ভুলে যায়। চোখ বন্ধ করে একবারই সে বিগত দিনের কথা ভাবে কেবল।

টর্চের আলোয় পথ চিনে উঠোনে এসে দাঁড়ায় তারা। শয্যাশায়ী জননী অনেক কষ্টে উঠে এসে সজলচক্ষে তাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করেন। কিছু পরিজন, আশ্রিত, তাদের পুত্রকন্যা ঘিরে দাঁড়ায় তাকে। সে আগেই জানত প্রিয় ঘরটিতে আর কখনো বিছানা পড়বে না তার। তবুও দুটি ঘর দাঁড়িয়ে আছে তখনও মেরামতের পরে।

আস্তে আস্তে সব কথাই বলবেন তাকে পিতা। কিন্তু এখন এতকাল পরে আবাল্যের স্মৃতিজড়ানো উঠোনটি, কেটে ফেলা কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি, কি আবছায়ায় দূরে দাঁড়ানো আমগাছটির দিকেই চেয়ে থাকুক সে।

মুমূর্ষু সঙ্গীটিকে তারা বাঁচাতে পারেনি। মূল বিমানের কাঠামোর সঙ্গে তাকেও পাশে সরিয়ে দেয় তারা। অন্য পাখাটিকে কপিকল বানিয়ে দানবিক চেষ্টায় টেনে নিয়ে আসে এই পাখাটির পাশে। খাঁজে খাঁজে মিলিয়ে জোড়া লাগায় তারা পাখা দুটিকে। দুটি চাকাও খুলে এনে লাগিয়ে দেয়। বিমানের শরীর থেকে ধাতব আবরণ খুলে এনে বিছিয়ে দেয় পর পর। যেন পাখা দুটি গতি নিতে পারে। তারপরে দড়ি লাগিয়ে সামনে দৌড়ে টেনে নিয়ে যাবে তারা দ্রুত পায়ে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বেরতেই দেখে পরিচিত গাছপালার শেষে আছে তেমনি প্রান্তর, দূরে নদীর আভাস, সবুজ শস্যের মাঠ। বাড়ির বাইরে এসে দেখে বড় ঘরের জায়গাটি ফাঁকা। তার পাঠাগার, পিতার বৈঠকখানা কিছুই আর দেখা যাবে না জানত। কাঠের একটি চেয়ারে দেয়ালহীন, ছাদহীন ঘরের মাঝখানে বসে ছিলেন পিতা, সকালের নরম রৌদ্রে। আগের দিনের, এতকাল চিঠিপত্রে লেখা সব কথাই স্মরণ করেন তিনি। করে বলেন, 'তুমি যদি চাও তাহলে এইখানে, এইখানে, এইখানে ভিত কাটা যায়', বলতে বলতে তিনি উঠে আসেন। সে তাঁর মুখের দিকে তাকায়, তারপর মাটির দিকে, তারপর হঠাৎ দেখে একটি বৃশ্চিক যেন তাঁর পায়ের কাছে। সে দ্রুত বলে, 'সরে যান', কিন্তু পরমুহূর্তে দেখে বৃশ্চিকটি ক্রমে বদলাচ্ছে, বড় হচ্ছে, আরও বড় হচ্ছে, প্রায় যেন একটি সারমেয়, শেষে সহর্ষে দেখে এটি তার সেই শৈশবের সঙ্গী ভোলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোলোক

"বাবা দ্যাখো রফিকের বাড়ি।" কণ্ঠস্বর তার এমনই ছিল যে সেই মুহূর্তে ঐ কথায় সাড়া দিই না। একটু পরই যখন 'রফিকের বাড়ি' আবার কানে বাজে তখন তার দিকে ফিরে তাকাই। বলি, "রফিকের বাড়ি মানে? কোথায়?" মেয়েটি গাড়ির পেছনে কাচের দিকে নির্দেশ করে মুখ ফিরিয়ে বলে, "ঐ যে, ওখানে।" ততক্ষণে অনেকদূর চলে এসেছি।

অভাবী গ্রাম্য রমণীর সন্তান রফিক। গৃহকর্মে নিপুণা ও পরম বিশ্বাসী বলে মা'র সঙ্গে তার দশবছর বয়সী ছেলেটিকেও থাকতে দিয়েছেন গৃহকর্ত্রী। এবং দুঃখী পরিবারটির উপকার চিন্তায় তাকে স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছেন।

আমার কন্যাটি রফিকের চাইতে বয়সে ছোট হলেও ক্লাসের পড়ায় এগিয়ে আছে। আর ইংরেজি স্কুলে পড়ে, সে কারণেও রফিককে শিষ্যের মতোই দেখে সে। কখনো কখনো ঘরের কাজে হাত লাগানো, আমার ছোটখাটো ফরমায়েশ খাটা, স্কুলে যাওয়া কী স্কুলের পড়া তৈরি করার বাইরে রফিক তাই তার গুরুর আদেশ পালনে সর্বদা আগ্রহী। এবং গুরু উদারহস্তে তাকে এজন্য পুরস্কৃত করেন। তাঁর বিকল বৈদ্যুতিক খেলনা কী প্রায় শেষ হওয়া রঙের কৌটা, ছোট হয়ে যাওয়া ক্রেয়ন, রঙিন পেনসিল, এমনকি কয়েকটি পৃষ্ঠাসহ তাঁর ড্রয়িংয়ের খাতাটিও অকাতরে রফিককে দিয়ে দেন তিনি।

ঐসব কাগজে নানা রঙের ছোট ছোট রঙিন চক ব্যবহার করে রফিক ছবি আঁকে। শিষ্যের কৃতিত্বে মুগ্ধ কন্যাটি মাঝে মাঝে সেইসব সৃষ্টি মাকে দেখায়। কখনো কখনো আমাকেও। অবশ্য 'কাজী নজরুল ইসলাম' পরিচয়ে চিহ্নিত মানবমুখের আদলটির মাথার চুলে লাল রং এবং জামার সবুজ রং আমি মেনে নিইনি। অন্তত জামাটি হলুদ রঙ হলেও চলত। কন্যা লজ্জিতমুখে স্বীকার করেছিল চুলের জন্য কালো আর জামার জন্য হলুদ রঙের অভাব ছিল রফিকের।

স্কুলের ড্রয়িং ক্লাসেও রফিকের অঙ্কন-পারদর্শিতার কথা প্রচার হয়েছিল সম্ভবত। এ কারণে গভীর মনোযোগের সঙ্গে গুরুর তত্ত্বাবধানে তাকে মাঝে মাঝে চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। কিছুদিন আগে মেয়েটি তার শিষ্যের একটি ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমার সামনে ধরে বলেছিল, "দ্যাখো বাবা, কী সুন্দর বাড়ি!" একমাত্রিক প্রাসাদোপম বাড়িটির পেছনের পুকুরটি বাড়ির ঠিক ছাদের ওপরে আঁকা, জলের রং লাল, দু'তলা বরাবর আঁকা বাগানের সব ফুলই হয় সবুজ না হয় কালো, জানালার চাইতে দরজা ছোট— সম্ভবত ঘরের মধ্যে পাতা খাট-পালঙ্ক কী টেলিভিশন সেট দেখানোর জন্য। আমি অন্য কাজের ব্যস্ততায় বলেছিলাম, "তা ভালোই তো।" শুনে কন্যা কিঞ্চিৎ দুঃখিত মুখে বলেছিল, "কিন্তু ওর ছবি ক্লাসের দেয়ালে টাঙায়নি, জানো?" তারপর একটু থেমে বলেছিল, "রং নাকি ঠিক হয়নি। সব রং ছিল না, সে তো ওর দোষ নয়।" সেই শুরু। তারপর মাঝে মাঝেই সে দেয়ালের ক্যালেন্ডারে কী ছবির বইয়ে আঁকা বাড়ি দেখলেই বলত, "রফিকের বাড়ি।" এমনকি গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন তাকে নিয়ে আর্ট মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম সেখানেও স্টুয়ার্ট ডেভিসের একমাত্রিক ছবি 'টাউন স্কোয়্যার' দেখিয়ে সে বলেছিল, "বাবা, দ্যাখো রফিকের বাড়ি।" এই হচ্ছে 'রফিকের বাড়ি'র ইতিবৃত্ত।

সেদিন অভিজাত পাড়ার মধ্য দিয়ে আসার সময়ে দেশবরেণ্য ধনকুবেরের নানা রং মেলানো প্রায় অলৌকিক বাড়িটিকেই সে সম্ভবত 'রফিকের বাড়ি' বলে চিহ্নিত করেছিল।

রফিকের হাত ইদানীং আরও পাকা হয়েছে। কখনো কখনো এখানে-সেখানে তার আঁকা দু'একটি ছবি দেখতে পাই। কন্যাটির পড়ার টেবিলেও। মূল্যায়নের জন্য দেওয়া হয়েছে চিত্রসমালোচককে বুঝি। বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য এসেছে। নানা পশু, পাখি, মায় বাড়ির পোষা জার্মান স্পিৎজ 'স্নোয়ি' পর্যন্ত। সাদা রং সারমেয়ের গায়ে হালকা বাদামি ছোপ বোঝাতে ঘাড় লাল রঙের ব্যবহার নিঃসন্দেহে দৃষ্টিহারী। রং ছিল না, তা বুঝি।

কয়েকদিন আগে রফিক স্কুল থেকে খুবই মন খারাপ করে ফিরেছিল। এমনকি গুরুদেবের নানা সান্ত্বনাও তার মন ভালো করতে পারেনি। এবারে ড্রয়িং স্যার যে কেবল তার কুক্কুট-এর ছবি দেয়ালে টাঙাতেই অস্বীকার করেছেন তাই নয়, ছবিটি নাকি একবার দেখেই তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। মোরগই সম্ভবত। পৃষ্ঠাজোড়া ছবিটির প্রতি আধইঞ্চি অন্তর রং পাল্টেছে। বাঁ থেকে ডাইনে। উপর থেকে নিচে। রং ব্যবহারে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য চোখ দুটি কালো ও ঝুঁটিটি নীল। হলুদ ঠোঁট দেখাচ্ছে গাঢ় বেগুনি। মোটা-তাজা শরীরে লাল-নীল-বাদামি লাঠির মতো পালক উড়ছে কিছু কিছু। মোটা লম্বা দুটি পায়ে দাঁড়ানো। টকটকে লাল রঙের পা। নখ সব কটিই কালো রঙের। সম্ভবত কালো দিয়ে রঙের ব্যবহার শুরু হয় বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও একবার দেখেই ছবিটিকে কফি টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিলাম– টেবিলের নিচে খবরের কাগজের স্তূপের সঙ্গে রাখতে পারিনি। রফিকুন নবীর অত্যুজ্জ্বল, বিচিত্রবর্ণের, বলদর্পী কুক্কুটকুলের চিত্রাবলি তখনও আমার চোখে স্পষ্ট ছিল বলেই সম্ভবত।

ছবিটি কয়েকদিন টেবিলে পড়ে ছিল। তারপর, মুরগির ছবিই তো, কোথায় গেল কেউ আর মনে রাখেনি। রফিক দু'একবার খোঁজাখুঁজি করেছিল। তার গুরুদেবও। পরে খুঁজে না পেয়ে দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে মুরগিটি উড়ে গেছে। হোক তা কাগজে আঁকা কিন্তু যখন সেটি পৃথিবীর সব রং দিয়ে আঁকা হয়, সমস্ত ভালোবাসার সঙ্গে, জীবন আসে সেখানে। পরের যুক্তিসমূহ অবশ্য আমিই তাদের যুগিয়েছিলাম মুরগি উড়ে যাওয়ার কথা শুনে।

আমাদের সামনের বাড়িতে প্রাণিবিদ্যার এক অধ্যাপক বাস করেন। কিছুকাল আগে অবসর নিয়ে এখন বাগানে ফুল-লতাপাতার পরিচর্যায় সময় কাটে তাঁর। প্রাণিবিদ্যা ও পুষ্পবিদ্যা খুব কাছাকাছি, সম্ভবত এজন্যই। আমি তাঁর কাছে রফিকের মুরগির গল্প করেছিলাম, নানা কথার মাঝে। অধ্যাপকের সারাজীবনের শখ ছিল এমন একটি প্রজাতি আবিষ্কার করা যা আগে কেউ করেনি। ঐরকম ঘটলে ঐ প্রজাতির নামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িয়ে থাকত। রফিকের মুরগির বিচিত্র বর্ণ ও চেহারার কথা শুনে অধ্যাপক আফসোস করে বলেছিলেন, "সত্যি সত্যিই যদি ওটি আমার বাগানে উড়ে আসত !"

স্ত্রীকে কথাটি আমি বলেছিলাম। তার মায়ের সঙ্গে গল্প করার মুহূর্তে মেয়েটি হয়তো সে কথা শুনে থাকবে। এবং সেজন্যই রফিককে যখন সে বলে, "মুরগিটি রাস্তা পেরিয়ে ঐ সামনের বাগানে উড়ে গেছে" তখন আমি অবাক হইনি। তবুও তনয়াকে বলি, "এরকম হয় না। কাগজে আঁকা মুরগি কখনো জীবন পায় না।" সে যে এ কথা খুব অবিশ্বাস করে এমন নয়, তবুও বিশ্বাসের বাইরে কিছু নেই এ কথা কে বলবে? অবশ্য আমি তাকে ঐ যুক্তি শেখাই তার মলিন মুখ দেখে।

"তাই যদি হয়", সে আমাকে বলে, "ধরো রফিকের মুরগি যদি সামনের বাড়িতে উড়েই গিয়ে থাকে, তাহলে ওরা কী করবে? খেতে তো পারবে না।" আমি স্বীকার করি ঐ শতবর্ণের মুরগি কারো পকেই হজম করা সম্ভব নয়।

"তাহলে?" তার যুক্তির মুখে পিছু হটে আমাকে বলতেই হয় যে, আমি ঠিক জানি না। আর ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন সে বলে বসবে, "চলো বাবা ঐ বাড়িতে গিয়ে খুঁজে দেখি রফিকের মুরগি আছে কিনা।"

অধ্যাপককে আমি সেকথা বললে তিনি প্রাণ খুলে হেসেছিলেন, অনেক কাল পরে– তাঁরই মুখের কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মাঝে মাঝে তবু মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে রফিকের মুরগি যে ঐ বাড়িতে যায়নি তার প্রমাণ কী? আমি মানি যে, কোনো প্রমাণ নেই। বরং ঐরকম হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা মুরগিই তো। কতদূর আর যেতে পারবে উড়ে?

মেয়েটির জন্ম বিদেশে। নার্সারি স্কুল, কিন্ডারগার্টেন পারও করেছে সে সেখানেই। ফলে জ্যাক অ্যান্ড দ্য বীন্‌স্টক, রেড রাইডিং হুড, কি সিন্ডারেলা এখনও তার পিছু ছাড়েনি। মিকি ও মিনির প্রতি আকর্ষণ তখনও ক্ষীণ নয়। বিশেষত ঐ দেশ ছেড়ে আসবার ঠিক আগে তাকে ডিজনিল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ায় সেটি বরং তীব্রই হয়েছে বলা যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

এই শহরে আমি তাকে কিছু দিতে পারি না। নিয়ে যাওয়ার মতো জায়গাও তেমন নেই। যা আছে-- তার জন্য নিতান্ত মামুলি। তবুও মাঝে মাঝে সেখানেই নিয়ে যেতে চাই তাকে। স্কুলের বন্ধুবান্ধব দু'একজন সঙ্গে গেলে রাজিও হয়। ইদানীং তাও হয়ে ওঠে না। তার মা এবং আমার দুজনেরই কাজের চাপ। তাছাড়া হরতাল, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাকার কারণে রাস্তায় এত যানজট যে খুব সকালে কী গভীর রাত্রিতে ছাড়া রাস্তায় বেরতেও ভালো লাগে না।

পর পর তিনদিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকার পরে প্রথম বন্ধের দিনেই তাকে বলি, "চলো, আজ তোমাকে আমাদের চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনব।" জানি, স্যানডিয়েগোর চিড়িয়াখানা কি সী-ওয়ার্ল্ডের দৃশ্য যার চোখে ভাসে তার জন্য এটি কিছু নয়। তবুও তাকে চিড়িয়াখানার বিস্তার বোঝাবার জন্য শহরের শেষ মাথায় সেই গাছপালা-মাঠ-জলাশয়ঘেরা জায়গাকে অভয়ারণ্য করে তুলি। আর আমার প্রস্তাব আকর্ষণীয় করবার জন্য বলি, "রফিককেও সঙ্গে নিয়ে চলো আজ। সে তো কখনো যায়নি।" মুহূর্তে খুশি হয়ে উঠেই নিভে যায় সে, "ও তো গাড়ি চড়তে পারে না বাবা। ওর নাকি মাথা ঘোরায়, চোখ বন্ধ করে বসে থাকে।"

রফিক প্রচণ্ড আপত্তির সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে বলে, ওরকম কখনো ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না।

কখনো বাঘের খাঁচার সামনে, কী হরিণের এলাকায় সময় কাটে খানিকটা। তারপরে এসে দাঁড়াই পাখির মেলায়। আপাতখোলা আকাশে রঙ-বেরঙের পাখির ওড়াউড়ি দেখি। মাটিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে বড় প্রজাতির কিছু পাখি, বুঝি ময়ূর। নানা রঙের আলপনা শরীরে নিয়ে নাচে তারা। কিছু পালক স্পষ্ট সোজা, দাঁড়ানো। মেঘের জন্যই কি পেখম মেলেছে? আর সেই কথা মনে আসতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিকের মুরগির ছবি চোখে ভাসে। আমি অন্যমনস্ক তাকিয়ে আছি যখন, মেয়েটি আমার হাত ধরে নাড়া দেয় "বাবা, দ্যাখো, রফিকের মুরগি?" উত্তেজিত কণ্ঠস্বর তার। আমি যেন সম্বিৎ ফিরে পাই, "কোথায়! রফিকের মুরগি কোথায়?

"ঐ যে ঐখানে" আঙ্গুল তুলে দেখায় সে। আমি তার আঙ্গুল বরাবর তাকাই। আর কী আশ্চর্য। তাই তো। ঐ তো, ঐ তো রফিকের মুরগি। না ময়ূর নয়, রফিকের মুরগি। অবিকল ঐরকম।

আমি বলি, "রফিক, রফিক কোথায়? তাকেও দেখতে বল।"

সে রফিকের হাত ধরে টেনে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু রফিক বানরের খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে একবার এদিকে দেখে তারপর চোখ ফিরিয়ে নেয়।

"রফিক, রফিক তোমার মুরগি। ঠিক যেমন ভেবেছিলাম, বাবার স্যার এখানে এনে রেখে গেছে মুরগিটা।"

রফিক তবুও এদিকে চোখ ফেরায় না। মুখে তার লজ্জার ছাপ। মুরগির শরীরে ঠিঁক জায়গায় ঠিক রংটি দিতে পারেনি এজন্যই হয়তো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোণিতরেখা

কেউ কখনো তাকে দেখেনি। অন্য গ্রামের কেউ নয়। যদিও তার চেহারা খুব স্পষ্ট ছিল না। মুখাবয়ব কী প্রকার বিভিন্ন বিবরণে তা বোঝা যায়নি; গাত্রবর্ণ, কেশের দৈর্ঘ্যও নয়। যেহেতু দূর থেকেই দেখেছে অনেকে, সে স্ত্রী কি পুরুষ এও ঠিক কেউ জানেনি।

এ কারণে পরিচিতের গাত্রবর্ণ যদি-বা মিলেছিল, হ্রস্ব কেশের জন্য সাদৃশ্য বাতিল হয়ে যায়। কেশ মিললেও পরিধেয়র বিবরণ ছিল ভিন্ন। তাই কেউ তাকে নিজের বলে দাবি করেনি।

দেহটির অবস্থানও বিচিত্র ছিল, সম্ভবত স্থানটির বৈচিত্র্যের জন্যই। চারপাশের ভূমিখণ্ড সীমানাচিহ্ন সঙ্গে নিয়ে সেখানে মিশেছে, যাতায়াতের সরু পথের মোহনা যেন, বিস্তার এবং দৈর্ঘ্য যার সামান্যই, দেহটি সেখানেই ছড়ানো ছিল। সামান্য পাশ ফেরানো, বুক-মুখ ভূমির দিকেই বরং বলা যায়। হাত দুটি দু'পাশে, সোজা নয়, কনুইয়ের কাছে ভাঁজ একটির; অন্যটি সটান নির্দেশ করে শীর্ষভাগের অঞ্চল। পা দুটিও ঠিক জানুর নিচে থেকেই দু'পাশে মেলা— যেন দুই দিকচিহ্ন। শবদেহের এ প্রকার অবস্থান দায়ী করে চতুষ্পার্শ্বের সকলকে, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এ কথা জানেন।

সকলে দেহটির কাছেও যায়নি। অনেকটা দূর থেকেই, পুবের সড়ক থেকেই দেখেছিল। নামা বর্ষা যদিও সড়কের অনেক অংশই ছেড়ে দিয়েছে, শস্যক্ষেত্রেরও— আর কিছুকাল পরে যদি ফসল ঘরে উঠবে তাহলে ছাড়তে তো হবেই— কেবল চার সীমারেখা যেখানে মিশেছে তার কিছু অংশই ডোবা। ফলে মৃতজন না-জল, না-স্থল এমন জায়গাই বেছে নিয়েছিল— কাছে কেউ যেতে পারেনি। যাওয়ার উপায় ছিল না, বিগত বর্ষাচিহ্নের জন্যই কেবল নয়, যে বর্ণ-বুঝি কৃষ্ণ কি রক্তিম, দূর থেকেও দৃশ্যমান ছিল তা অনেক জায়গা ঢেকে রেখেছিল। কর্দমাক্ত পথ অগ্রাহ্য করে কাছে গেলেও কেউ ঐ গাঢ় শোণপ্লাবন মাড়াবে না। অস্বচ্ছ দৃশ্য যদি-বা পূর্ণতা পায় কান থেকে কানে, প্রত্যক্ষদর্শীর যে বিবরণ সকলে শুনেছিল তা যথার্থ ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে প্রথম ঐ দৃশ্যের কাছে আসে এটিও খুব স্পষ্ট নয়। ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য মাচানে বসে সারা রাত না কাটলেও ঐ রকম স্বভাবই ছিল সমসের আলীর। শেষ রাত্রির কীটপতঙ্গ ও "পোকা"– রাত্রিকালে যে প্রাণীর নাম মুখে আনা নিষেধ– তাকে ভয় দেখালেও হালকা কুয়াশায় প্রায় অদৃশ্য সতেজ, সবুজাভ শস্যক্ষেত্র তাকে যে অপার আনন্দে ভাসিয়ে দিত তা উপেক্ষা করার সাধ্য তার ছিল না এবং সে জন্যই পথ পার হয়ে, ক্ষেতের আইল, কাদা অগ্রাহ্য করে যে দৃশ্য সে দেখেছিল তা তাকে বাক্য ও বোধহীন করে দেয়। কিয়ৎক্ষণেই আতঙ্ক ও বিস্ময়ে মুখে অস্পষ্ট শব্দ তুলে সে দ্রুত পিছু হটে, দু'বার আইল থেকে নিচে পড়ে যায় এবং অশক্ত পায়ে দৌড়ে গ্রামের সীমানায় ফিরে যায়। তবুও বেলা ফোটার পর সড়কের জটলায় কেউ যখন বলে, "সমসের পরথম দ্যাখছে" তখন প্রতিবাদ হয়েছিল। কারণ সামান্যই। করমালি আলো ফোটার মুখে ভিন্ন গ্রাম থেকে বেরিয়ে আইল ধরে সমসের আলীর গমনপথের উল্টো দিকে দাঁড়িয়েছিল এবং ত্রাসে প্রত্যুষকর্ম ভুলে "ইয়া আল্লা! ও-ই, ও-ই, দ্যাহো, দ্যাহো", বলে দু'হাত তুলে নিজে গ্রামের দিকে ছুটে গিয়েছিল। "না, না, করমেই পয়লা দ্যাখছে" এ বিশ্বাসের সূত্রপাত হয় এমন করেই।

নববিবাহিতা সে নয়, দু'বছরের পুত্রসন্তানটি যত ক্ষীণকায়ই হোক তার সাক্ষ্য দেবে, তবুও ঘরে ফেরা কন্যার চুলে মোটা প্লাস্টিকের চিরুনি বসাবেই তার জননী। বিবি হাওয়া চুল আলগা করেই ক্রুদ্ধস্বরে মেয়েকে বলেছিল, "চুল কাটছস ক্যা?" খোদেজা পিছনে হাত বাড়িয়ে চুল আড়াল করতে চেয়েছিল– রুক্ষ তেলহীন কেশরাশিতে চিরুনির দাঁত সহজে চলে না, টানে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যই সম্ভবত, অথবা কেশের ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয় এবং কাঁচি দিয়ে কাটা চুলের দৈর্ঘ্যও যে এক হবে না, এই জ্ঞান থেকেই। কিন্তু বিবি হাওয়ার নজর ততক্ষণে চুলের ফাঁকে ফাঁকে প্রায় সাদা গোল দাগ পড়ে এবং চিরুনি টেনে নিচে নামালে দেখে চুলের দৈর্ঘ্য যুক্তিহীন অসমান। ক্ষোভে বিস্ময়ে খোদেজার পিঠে একটি চড় মেরে বসে সে, "কী করছস, কী হইছে, ক।"

"কিছু হইছে না, কিছু করছি না" ক্ষীণস্বরে দু'একবার বললেও মায়ের আর এক ধাক্কায় মুহূর্তে সে ভেঙে পড়ে। "আমারে মাইরা কিছু রাখছে না, আম্মা" বলে ফুঁপিয়ে ওঠে সে। মা আগেই দেখেছিল মেয়ে সেই আগের ঈদে তারই দেওয়া শাড়ি এবং জামাটি পরে আছে। এখন সেই সেলাই আলগা হয়ে আসা জামাটি তুলে দেখে পিঠে সহস্র রেখা এবং "হায় খোদা, এ কী করছে" বলে সে কেঁদে ওঠে। প্রতিশ্রুত দু'হাজার টাকা এখনও জামাইকে দিতে পারেনি, জানে সে। তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মাস আগে মেয়েটিকে যখন তারা ফিরিয়ে দিতে এসেছিল তখন জামাইকে কেঁদে বলেছিল, "আর কয়ডা দিন সবুর কর বাজান। তোমারে নয় শ্যাষ গাছ কয়ডা বেইচ্যা ট্যাহা দিমুনে।"

মায়ের কোলে মুখ ঢাকা কান্নার সঙ্গে খোদেজা বলেছিল, "আমারে মাইরা ফ্যালা মা, আর পারি না।"

জামাইকে ঘরে ডেকে এনেছিল হাওয়া। শাকান্নের শেষ দশটি টাকা তার হাতে দিয়ে বলেছিল, "প্যাটে ধরছি মাইয়ারে, যদি না-পুষায় পোলাডারে রাইখ্যা আমার মাইয়া তুমি দিয়া যাইবায়, মাইরতা না।"

ফিরে যাওয়ার দিন খোদেজা মাকে জানিয়েছিল স্বামীর শাসানি, "মায়েরে কইছস, ল গিয়া, এবারে তরে খুন করবাম।"

গৃহকর্তার পুত্র চিঠিটি পড়ে শুনিয়েছিল তাকে– "স্নেহের অর্ধাঙ্গিনী আমি এখন হাসপাতালে। পরিষদ নির্বাচনের সময় বিরোধী দল আমাদের মিছিলে হামলা করে তাহাতে আমার মাথায়ও লাঠির আঘাত পড়ে। আমার এখন সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন। তুমি তোমার সাহেবের নিকট হইতে ছুটি লইয়া কয়েকদিনের জন্য চলিয়া আসিবা।"

এক মাসের জমানো ও প্রায় এক মাসের অগ্রিম মাইনে নিয়ে বিলকিস গ্রামে আসে। মাটির গাঁথুনির উপরে পাটখড়ির বেড়া, খড়ের চালে গভীর কালো দাগ স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় ঘরের মেঝেতে গর্ত কিসের জন্য। খড়ের বিছানায় মনিবপত্নীর দেওয়া বিছানার চাদরটি বিবর্ণ, কয়েকবার সেলাইয়ের দাগ বোঝা যায়। তবুও অকালবৃদ্ধ, অশক্ত, অক্ষম স্বামীটিকে ক্ষমা করা যায় না। যাওয়া-আসায়ই যে কেবল খরচ তা-ই নয়, ঐ চিঠিটি লেখানোর জন্য দিতে হয়েছিল দুটি টাকা সগীর দোকানদারকে। সগীরের নিজের তাগিদও ছিল– গত কয়েক মাসের বাকি কিছু কম টাকা নয় এবং এই শীতেই যদি শেষ গায়ে কাঁথামুড়ি দেয় তার খাতক এই ভয়ে শহরে পরিচারিকা খাতকপত্নীকে চিঠি পাঠিয়েছিল সে। নিজের পয়সায় ডাকটিকিট কিনে। লাঠির আঘাত ফৈজুদ্দির মাথায় লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু সে জন্য শুশ্রূষার কোনো প্রয়োজন প্রকৃতই ছিল না।

অন্ধকার ঘরের মেঝেতে শোয়া অভুক্ত বৃদ্ধপ্রায় স্বামীকে দেখে বিলকিস কেঁদেছিল প্রথমে। "নসীবে আর কত আছে" এ কথা সে আর বলে না, জানে এখনও অনেক বাকি। কিন্তু সগীরের টাকা শোধ করে পড়শী চাচাতো ভাইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছ থেকে নেওয়া কর্জ ফেরত দিয়ে চাল, ডাল, নুন, শাক কিনে দেখে শহরে ফেরার পয়সাটিও নেই আর।

"হুদাহুদি চিড়ি পাডাইছেন কিল্লাই?" ফুঁসে উঠেছিল সে।

সে কথার জবাব না দিয়ে ফৈজুদ্দি বলেছিল, "রফিকরে আন্‌ছ না দেহি। হ্যায় পড়তাছে তো?" এবারে রক্ত মাথায় উঠেছিল বিলকিসের। সদাশয় মনিবপত্নীর দাক্ষিণ্যে দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রটি যে কেবল তার সঙ্গে শহরেই থাকে তা-ই নয়, এক দাতব্য স্কুলে পড়েও।

"পোলা মাইয়ারে পয়দা করছেন, খাইতে দিবার পারুইন না, আবার জিগাইন। মাইসের বাইত দাসীবান্দি কইরা খাওয়াই আপনেরে– শরমও লাগে না।"

তেজের সঙ্গে বিছানায় উঠে বসেছিল তার স্বামী। "কিয়ের শরম, ঢাহায় কি করস জানি না মনে ভাবসনি!" কাশির দমকে অশ্রুতপ্রায় অশ্রাব্য গালি দিয়েছিল সে। "যা মারা গিয়া— ।"

"এই ব্যাডার মুকই আর দেহুম না" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠেছিল বিলকিস। পড়ন্ত যৌবন তখনও তার শরীরে, দুর্গম দূর পথ, কিছুই তার মনে ছিল না। আগের রাত্রিতে ফিরেছিল সে, কিন্তু নিজ গৃহে নয়। অবশ্য নিজ গৃহ বলে কিছু তার ছিলও না। খড়কুটোর যে আচ্ছাদন ঢেকে রেখেছিল তার বৃদ্ধ পিতার শরীর সেখানে তার স্থান হতো না এমনিতেও।

কিছুকাল আগেও রিকশা চালাত সে থানা শহর থেকে চলে যাওয়া নতুন পথ ধরে গ্রাম-গ্রামান্তরে যাত্রী নিয়ে যদিও পিতা তার উপার্জনের অংশভাক্ কখনো ছিলেন না। দিনান্তের উপার্জন নিয়ে সে চলে যেত পত্নীর সান্নিধ্যে। সম্পন্ন অবস্থা না হলেও শ্বশুরালয়ে অন্তত দুটি টিনের ঘর ছিল এবং তার একটিরই খোঁপে রাত্রিসমূহ এবং দিনগুলো দিব্যি কেটে যেত।

"হ্যারে বিয়া দিয়া যে গুনা করছি, তার মাপ অইব না আল্লার দরবারে" পিতার এই আক্ষেপের কথা নিশ্চয়ই তার কানে গিয়ে থাকবে এবং সে কারণেই সে শহরে চলে যায় কিনা বলা শক্ত কিন্তু সাদা ভাঁজখোলা জামা, কালো প্যান্ট পরে যখন সে ফিরেছিল তখন আর পিতৃদর্শন করেনি।

মাঝে মাঝেই শহরে চলে যেত সে। কিছুদিন থানা শহরের চায়ের দোকানে, সিনেমা হলে ফুর্তির স্রোতে ডুবে আবার ফিরে যেত নাকি বড় শহরেই। তার দীর্ঘ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদর্শনকালে কখনো কখনো মোটরসাইকেলে এবং একবার গাড়িতেও কারা নাকি তাকে খুঁজেছিল। একবার গ্রামে ফিরে সে কথা শুনে পরদিন আবার হারিয়ে গিয়েছিল। কোথায় কেউ জানে না। তার স্ত্রীও নয়।

সন্ধ্যার মুখে গ্রামে ফিরেছিল সে– কী পোশাকে কেউ দেখেনি। আসলে সে যে আদৌ ফিরেছিল এটিও কেউ ঠিক বলতে পারেনি। তার স্ত্রীও নয়। স্ত্রীর কাছে যায়নি সে– ফেরার খবর তবুও বাতাসে ছিল।

সারাদিন রৌদ্রে-মেঘে শবদেহটি নাকি পড়ে ছিল। চাক্ষুষ বিবরণ ক্রমে কল্পনাশ্রয়ী হয়ে বিভিন্ন প্রাঙ্গণে পৌঁছেছিল– নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের পিতা কি স্বামীর পত্নী, বীতস্পৃহ স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামী কি স্বামীগৃহে নির্যাতিতা কন্যার মাতা, সকলের গৃহেই, সবখানেই। তারা সকলেই, কেউ-বা দুর্বল পায়ে অতি কষ্টের সঙ্গেই, এসে সড়কে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল এবং নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্ণনা, কল্পনা এবং চাক্ষুষ প্রমাণ সব মিলিয়ে নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

কেউ এরই মধ্যে থানায় খবর দিয়ে থাকবে হয়তো। তাই সূর্যাস্তের আগেই, বৃষ্টি নামতে পারে এই বুঝে, দারোগা তার লোকজন নিয়ে জলকাদা ডিঙ্গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করেন এবং ছালায় ভরে দেহটিকে নিয়ে যান।

বৃষ্টি ঠিক তার পরেই নামে। তখন শস্যক্ষেতের সেই চৌরাস্তার বিবর্ণ ঘাসে জমে থাকা কৃষ্ণরুধির ক্রমে তরল হয়ে লাল হয় এবং গড়িয়ে পড়ে ক্ষেতের সেচনালাতে। সেচনালার রক্তিম স্রোত ক্রমে মেশে চারদিকের নয়ানজুলিতে কিংবা ঘরের পাশের ডোবা, কি পুকুর, কি খাল, কি নদীতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালপুরুষ

মুখাবরকটি তার হাতে ধরা ছিল। কখনো শরীরে বসালে, ত্বকের সঙ্গে, চামড়ার প্রতি স্তরের সঙ্গে সেটি মিশে যায়, তখন কেউ তাকে চেনে না এবং সে কী— কেউ জানে না। এই জন্য সে বারবার ঐ আচ্ছাদন খোলে, পরে, আর চেনা-অচেনা, চেনা, অচেনা এই রকম পরিচয় দিয়ে যায় পথচলার সঙ্গে।

বাঘছাপ অদ্ভুত পোশাকও তাকে ভিন্ন চেহারা দিয়েছিল। জলপাই, বাদামি, হলুদ— নানা রং তাকে বহুরূপী বানিয়েছিল। সাত গ্রামের সীমানায় যখন তার মূর্তি ক্রমশ ধূলির মেঘ ফুঁড়ে স্পষ্ট হতে থাকে তখন সে মুখোশে ঢাকা। গ্রাম্য পথে প্রথমে পুরুষ ভয়ে আর্তনাদ করতে ভুলে যায় এবং পরে পল্লিরমণী মূর্ছিত হয়। কেবল গ্রাম্যললনা তাকে খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে এবং কামনা করে। অবশ্য ঐ সময়ে সে নিজরূপেই চিত্তহারী।

গ্রাম্যজীবনে যেমন ঘটে সেদিন তেমন ঘটেনি। আর পেছনে আদুল গায়ে শীর্ণ, অপুষ্ট শিশুর দল অবাক বিস্ময়ে হাঁটছিল না। তারা ছিল অনেক দূরে। সাহসী কতিপয় যুবক তাকে চোখে দেখার জন্য মেঠোপথে দৌড়ে শস্যক্ষেতের সীমানা বরাবর লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কাছে আসার সাহস পায় না। তারাও জানে না সে কী, কেননা মুহূর্তকাল সে মুখোশ খুলে নিয়েছিল। কয়েকজন এ সময়ে খুব সাহসের সঙ্গে তাকে দেখে দৌড়ে এগিয়ে যায়। আবার পিছনে ফিরে দেখে তার পর দূর গ্রামে খবর দিতে চলে যায়। যে গ্রামেই সে প্রবেশ করে, সকলে পূর্বেই তার খবর জেনে যায়, তাই আড়াল থেকে গ্রাম্যবধূরা তাকে আহ্বান করে আর মাঠে দাঁড়িয়ে চাষি এবং বারান্দায় বসে সালিশি মোড়ল তাকে কোনো প্রশ্ন করে না। এক বৃদ্ধ, তিন গ্রামপারের দূরদর্শী, "হ্যায় আমাগো হারাইন্যা না?" এই রকম প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু তার আশপাশে কেউ তখন ছিল না, থাকলেও তার জড়ানো কথা কেউ বোঝে না। এজন্য সে নিজ গ্রামের কাছে না-আসা অব্দি অপরিচিতই ছিল।

গ্রামের মুখে টিনের চারচালার খবিরদ্দিই প্রথম ঐ মায়াজাল ছিন্ন করতে এগিয়ে আসে কিন্তু মুখোশধারী তাকে গ্রাহ্য করে না। তবে খবিরদ্দি মাতবর, অনেক কাল আগের কথাও তার মনে থাকে, তাই হাঁটার ভঙ্গি, উড়ো খবর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বাঘছাপ পোশাক তাকে প্রায় সব বুঝিয়ে দেয়। কেবল মুখাবরকটিই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগায়। খানিক পরে সে সব ঝেড়ে ফেলে এবং "হারান্যাই" বলে দ্রুত হাঁটতে থাকে। ততক্ষণে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, বালিকা, তরুণ, প্রৌঢ়া, সকলে, সাত গ্রামের সকলেই বহুরূপীর গন্তব্যের দিকে ছুটতে থাকে।

এই রকম ঘটবে সকলেরই জানা ছিল।

দূর আকাশের মাথায় ধীরে ভেসে যাওয়া ধূসর বিন্দুটি প্রথম দেখেছিল হারান। সেটি উড়োজাহাজ বুঝে ওঠবার পরই অথবা সেটি উড়োজাহাজ কি-না নিশ্চিত হওয়ার জন্যই সে আকাশের দিকে চোখ রেখে সদ্যচষা শস্যক্ষেতের আইল, কখনো-বা শুকিয়ে যাওয়া আখের সারি সারি আঁটি কিংবা বাঁশঝাড়ের পাশ ঘেঁষে ছুটতে থাকে। দিগন্তের পারে বিন্দুটি মিলিয়ে গেলে সে পরম হতাশার সঙ্গে ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু পরদিন, পরদিনই, একটি নয় তিনটি বিন্দু, বিন্দুই নয়, এবার তাদের ডানাও দেখা যায়, আকাশের শেষমাথায় স্পষ্ট হয়। হারানের আর কোনো সন্দেহ থাকে না। ঐ সব উড়োজাহাজের নিচে নিচে ছুটে সে আবার সাত গ্রামের সীমানায় যায়। এবারে অবশ্য সকলেই হারানের কৃতিত্ব স্বীকার করে নেয়। হ্যাঁ, হারানই প্রথম দেখেছিল।

অবশেষে একদিন আকাশে ছ'টি বিন্দু ফুটে ওঠে। চমৎকার সারি-বাঁধা! প্রথম সারিতে একটি, তার পরে দুটি এবং শেষ সারিতে তিনটি— এই রকম করে বিন্দু ক'টি উড়ে আসে। এবারে যদিও মোটেও বিন্দু নয়, উড়োজাহাজ এবং ছ'টি উড়োজাহাজ যত দূর দিয়েই উড়ুক না কেন শব্দ তার মাটিতে পৌঁছবেই। হারান সেই শব্দ শুনেছিল এবং ঐ শব্দ যেন কান থেকে মিলিয়ে না যায় এই ভেবে ছুটতে ছুটতে সে সাত গ্রামের সীমানা ছাড়ালে যা ঘটবার তাই ঘটে। সে পথ হারিয়ে ফেলে।

সাত গ্রামের সকলেই জানত ঐ রকম সারা রাত চৌদ্দ গ্রামে যাত্রা শোনা অথবা তিন দিন ধরে মেঠো রাস্তায় রোদ-বৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ানো যুবক ঘরে থাকে না। স্কুলে সে পাঁচ ক্লাস পড়েছিল। তিন মাইল প্রতিদিন হাঁটতে রাজি ছিল না— এই জন্যই নয়, মাসের বেতন দেওয়ার সঙ্গতি ছিল না বলেও তাকে আর স্কুলে যেতে হয়নি। তাছাড়া লাঙ্গলের পেছনে হাঁটা কি নিড়ানি দিয়ে সবজি ক্ষেত পরিষ্কার করাতেও তার প্রবল অনাসক্তি ছিল। এসব কারণেই দূর আকাশপথে ভেসে আসা ধূসর বিন্দুর উদ্দেশ্যে সেও চলে যাবে সবাই জানত।

তার মা অবশ্য বৎসরাধিক কাল পথ চেয়ে বসেছিল। পিতাও চৌদ্দ গ্রাম ও নয় হাটের সব ঘরবাড়ি ও দোকানপাটে খবর নিয়েছিল— হারান কোথাও ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং দশ বছরে যেমন হয়– অসংখ্য টুকরো টুকরো খবর এসে জোড়া লাগে এবং তাতে এই গ্রাম, বন্দর, শহর পেরিয়ে ভিন্ন দেশের আভাসও থাকে। থাকে বন্দুক, কামান, উড়োজাহাজ কি বাঘছাপ পোশাকও।

প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন মা তার ঘরের বাইরে এসে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাতাসে হাত নাড়ায়। সন্তানের বিশেষ ঘ্রাণটি ছাড়া তাকে সে আর কীভাবে শনাক্ত করবে। মুখে হাত বোলায়, শরীরের পোশাক স্পর্শ করে, কিন্তু বাঘছাপ বোঝে না, মুখোশটি হাতেই ধরা, যদিও দূরে সরানো এ কারণে বৃদ্ধা সেটি ছুঁতে পারে না। অন্য সকলের দৃষ্টি অবশ্য সে দিকেও। ঐ রকম মুখাকৃতি কেবল অমাবস্যার নিকষ কালো অন্ধকার রাত্রিতে দেখা যায় বলে জনশ্রুতি।

সাত গ্রামের মানুষ তিন দিন তার বাড়ির চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। এক যুগ পরে ঘরে ফেরে বহুরূপী– এ কম বিস্ময়ের কথা নয়। তাই তিন দিন সে-ও ঘর থেকে বাইরে আসে না। সবাই ফিরে গেলে সে দেখে পিতা মৃত, মাতা দৃষ্টিহীন, দূরান্তরী ভগিনী। ঘরের চালে মরচে পড়া টিন, ফাঁক দিয়ে গড়ায় বৃষ্টিধারা। এই সব দেখে সে আরও তিন দিন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সঙ্গে কোনো তোরঙ্গ আনেনি সে। অন্য কোনো আধারও কেউ দেখেনি। অদ্ভুত পোশাকটির নানা স্থানে অনেক কিছু লুক্কায়িত থাকতে পারে এ সত্যি কথা। কিন্তু তার সবকিছু আছে এ মুখাবরকে সকলে শেষে এ কথাই বিশ্বাস করে।

সাত দিনের মাথায় হাটবারে রাস্তায় নামে সে। সেই পোশাক। হাতে ধরা আতঙ্ক। রাস্তায় তার পাশে বা সামনে কেউ চলে না। ক্বচিৎ কেউ কাছে এসে "হারান, কেমন আছ"– জিজ্ঞাসা করলে তার কোনো স্পষ্ট জবাব পায় না বরং ভিন্নমুখাকৃতিকালে সে এমন ধমক দেয় যে কেউ আর কাছে ঘোরে না।

এককালের বাগানঘেরা বাড়িটি এখন বেআব্রু। ভিন্ন জনের লাঙ্গল কি আসবাব তৈরির জন্য চিনিপাতা আমগাছ ক'টি চলে গেলেও তাতে বৃদ্ধা মাতার গ্রাসাচ্ছদনও জুটেছিল কিছুকাল। পরে বাঁশঝাড়, জারুল এবং কাঁঠাল গাছটিও। কেবল জীবনধারণের জন্য সুপারি ও নারকেল গাছ ক'টি দাঁড়ানো ছিল, এই ভরসা।

নিজ বাড়ি থেকে বড় সড়ক পর্যন্ত রাস্তাটি কোনোকালেই পরিচ্ছন্ন ছিল না, এখন শিয়াকুল আর ভাঁটের জঙ্গলে ঢাকা। বেনো ঘাস ছেয়ে রেখেছে বাইরের আঙিনা। বর্ষার জলকাদায় মাখামাখি রাস্তা পার হলে অবশ্য এখন পিচ বাঁধানো রাস্তা দূর শহর থেকে হাট পার হয়ে চলে গেছে বন্দরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাটের মাঝখানে বাঁশের চাতালে বসলে কিছু হাটুরে, উৎসুক যুবক এবং যথারীতি কয়েকজন বৃদ্ধ তাকে ঘিরে দাঁড়ায় এবং "কোয়নে আছিলো" এই কথা জিজ্ঞাসা করে তারা।

এ যুগের কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা ছিল তার। কিন্তু এখন এই জিজ্ঞাসার মুখে, শূন্যখড়, ভাঙা টিনের চালাঘর ক'টির কথা ভেবে, খোলা বাগানে, কেবল বিশালকৃতি আমগাছের গুঁড়ি ক'টি দেখে এবং তার মা চিরান্ধকারে হাত বাড়িয়ে আছেন দেখে সে বলে সেই ধূসর বিন্দুর পেছনে ছুটে পৌঁছে যাওয়া বড় শহরের কথা। উড়োজাহাজে উঠেছিল সে এবং ভিন্ন চেহারা সেখানেই পাওয়া। পোশাকের নানা স্থল দেখিয়ে সে কোনখানে কী কেমন জীবনসংহারী অস্ত্রাদি থাকে, বোঝায়। বিস্মিত শ্রোতাকুল ঐসব কথা প্রথমে আসগর বেপারি, পরে রসিক মহাজন এবং ক্রমে খোরশেদ চেয়ারম্যানের কানে তুলে দেয়। পরের হাটবারে আসগর বেপারি সরাসরি তাকে চেয়ারে বসায়, রসিক মহাজন গদির চাদর ঝেড়ে দেয় এবং খোরশেদ চেয়ারম্যান তাকে বৈঠকখানায় ডেকে নিয়ে নানা কথার আলাপ করে।

সেই সময়েই কোন এক অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রিতেই চৌদ্দ গ্রাম নয়হাটের সব ঘরছাড়া, ঘরে ফেরা তার সঙ্গে দেখা করে। সকলেরই ঐ ধাতব, প্রায় গোলকটি চাই।

সে তখন তাদের দলপতি এবং মুখাবরকটি হাতে হাতে ফেরে।

শুধু একটি কথা সে কাউকে বলে না– পৌষের নির্জন নদীতে যে-লাশটি ভেসেছিল সেটিও তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লাবনভূমি

এক

পিতামহ যেদিন গৃহত্যাগ করেছিলেন সেদিনও বৃষ্টি ছিল। প্রচণ্ড বর্ষণে ভেসে যাওয়া মাঠ ও শস্যক্ষেত্র কেবল সমুদ্রের আভাস দিচ্ছিল। অবশ্য গর্জন ও ঢেউ ছিল না। বৃক্ষরাজিও অমনি ভেসেছিল, জনপদের মতোই, এবং বড় ঘরের চালায় বসে ক'দিন কাটানো যায় এই ভেবে একদিন বিরক্ত হয়ে তিনি চালা থেকে নেমে চলে যান। তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে পিতামহী অনেক কাল তাকিয়ে ছিলেন, ধুলো-ওড়া সড়ক পর্যন্ত এবং সেটি পার হয়ে দূর বন্দরের আবছা সীমানা যেখানে, সেদিকেও।

তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। মাটি টাকা, টাকা মাটি– এই বলে দুটিকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। সিন্দুকভরা তেজারতির মাল দেখলেই তা বোঝা যেত। তবুও তাঁকে যে যেতেই হয়েছিল না-গিয়ে উপায় ছিল না বলেই।

পূর্ণ দিনের বর্ষণের পরে তাঁর মনে হয়েছিল যদি এই প্রপাত না থামে। শিহরিত তিনি দেখেছিলেন, ক্রমে পুকুরের সব মাছ দিব্যি হেঁটে নদীর দিকে চলে যাচ্ছে এবং পুকুর ও নদীর মধ্যবর্তী সবুজ রং পাল্টানোর জন্য প্রস্তুত। যদি বৃষ্টি না থামে এই কথা ভাববার পরেই আকাশ আরও অন্ধকার হয়েছিল এবং তিন সুখী শৃগাল ও সর্পরাজ ভিন্ন ডাঙার দিকে চলে গেলে তিনি তালগাছের শীর্ষে কোনো বাবুই দেখেননি। যদি বৃষ্টি না থামে এই কথা আবার ভাবলে গৃহতক্ষক তিনবার শব্দও করেনি, তখন তাঁর চলে না গিয়ে কী উপায় ছিল?

সুজানগর থেকে তিন পালের তিন নৌকায় তাঁর জিনিস এসেছিল। বড় বড় তিনটি কাঠের সিন্দুকে কী কী ছিল কেউ জানত না। এক-একটি সিন্দুক এক-এক নৌকায় দিয়েছিলেন। তিন সিন্দুক কেন এর জবাবে নিশ্চয়ই "তিন পুরুষের জন্য" এই কথা বলা যায়। কিন্তু পিতা তাঁর সিন্দুকটি পাননি বলে আজীবন অভিযোগ করেছেন। আমি তো পাই-ই নি।

প্লাবনভূমির উপর দিয়ে তিনি হেঁটে চলে গিয়েছিলেন। জলপৃষ্ঠে পদযাত্রা কি সম্ভব– এ প্রশ্ন কেউ কখনো করেনি, বরং তিনি যেদিকে চলে যান সেই দিকে, ঠিক মাঝখানে, দু'পাশ থেকে মাপলে ঠিক মাঝখানে, বিশাল অগ্নিগোলক সকলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

দেখেছিল। ঐ অগ্নিগোলকে তাঁর ছায়া থাকতে পারে না, কারণ যাদের বন্ধকি গহনায় তাঁর সিন্দুক ভারী ছিল তারা অমন কোনো ছায়া দেখেনি।

অনেকে বলে সুজানগর নয়, বেলকুচি থেকে মাত্র একটি সিন্দুক এসেছিল তাঁর, লেপ-তোশক এবং কাঁসাপিতলের হাঁড়িকুড়িতে বোঝাই। কাঁসাপিতল ছিল নিঃসন্দেহে, না-হলে বছরে দু'দশ বার চটের থলিটিতে কী ভরে নিয়ে যেতেন পিতা বাসনের দোকানে? তাঁর ভগিনীদ্বয় "ভাত খাওয়ার দুইটা থালও পাইলাম না" বলে ক্ষীণ বিলাপ করলে পিতা কখনো বাদী ছিলেন না। অগ্নীশ্বর কী প্রকারে অমন কাঠকুটোর পুতুল বানিয়েছিলেন-- নিঃশব্দে ভাবলেও মুখে কখনো কাউকে বলেননি।

দুই

পিতামহীর নামে একটি পাঠাগার ছিল বলে আমার ধারণা। পুরনো তোরঙ্গ খুলে সোঁদা ঘ্রাণ সরিয়ে শক্ত মলাটে বাঁধানো বইগুলো দেখেছিলাম আমি। প্রায় চারপাশ থেকেই উইয়ে কাটা সেই সব পুস্তকে আমি একরকম ছাপ দেখেছিলাম, তাতে পিতামহীর নাম এবং নামের সঙ্গে "মেমোরিয়াল লাইব্রেরী" কথা ক'টি ছিল। অনুমান করি লোকান্তরিতা পিতামহী একদম কোনো চিহ্ন না রেখে দিগন্তের ঠিক মধ্যখানে চলে যাবার বাসনা পোষণ করতেন না। ফলে, ঐ তেজস্বিনী অনেক চেষ্টা করেছিলেন প্লাবনভূমি পার হয়ে পিতাও যেন অমন অগ্নিগোলক হয়ে না যান।

খুব প্রত্যুষে কখনো কখনো মাতৃপদ বন্দনার শব্দ শুনেছি আমরা। এবং শয্যাত্যাগ পরবর্তীকালে ছাপমারা গ্রন্থাদির সম্মুখে আমাদের বসিয়ে তিনি হাতে তিনবার তালি বাজাতেন, তিন সন্তানের জন্য মোট ন' বার এবং তিন তালির পরে-- তিন তালিই যথেষ্ট ছিল-- আমাদের শরীর প্রকৃতই হালকা হয়ে যেত।

একদিন ছ'বার তালি বাজানোর পরে তাঁকে থেমে যেতে হয়েছিল। তাঁর খেয়াল ছিল না যে অসুস্থ কন্যাটি বাকি তিন তালি বাজানোর জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে না। সুর একবার কাটলে আর বসে না, সম্ভবত এ-কারণেই তালুর অনুশীলন তখন থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে তিনি মাতাকে বলেছিলেন, "এরা অগ্নিগোলক তো ছার, দিয়াশলাইয়ের কাঠিটিও হতে পারবে না।" তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। আমি এখন একা, এই প্রমাণ।

'যদি বৃষ্টি না থামে' এই চিন্তা পিতামহের মাথায়ই প্রথম এসেছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু আমার মনে হয় পিতাই স্তব্ধ, গম্ভীর হয়ে বৃষ্টির ধারার সামনে বসে থাকতে থাকতে প্রথম অমন চিন্তা করেছিলেন। তিনি বারান্দায়ই তাঁর কাষ্ঠাসনে বসা। আসনের অশক্ত পশ্চাদভাগ টিনের বেড়ার সঙ্গে ঠেকানো। সদর রাস্তা দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত ঐ বারান্দায় বসলে। সদর রাস্তা থেকে নৌকাটি মোড় নিয়ে আমাদের পাড়ার রাস্তায় এসেছিল এবং পরে আমাদের উঠানে। ছোট ছোট ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ করে বারান্দার উপরেই উঠে আসে বুঝি-বা। বন্দরও তখন জলপ্রপাতাক্রান্ত এবং স্বয়ং চিকিৎসকই চিকিৎসাকাঙ্ক্ষী, এই খবর দিয়ে নৌকারোহী দূত চলে যায়। তখন আবার বড় বড় ফোঁটা দূতপ্রবরের সর্বাঙ্গে, তার নৌকার গলুইয়ে, এবং তার পাশের একরকম মেটে-নীল তরল জাজিমে দ্রুত পড়তে থাকে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না-পারায় তখনই বুঝি তাঁর মনে এসেছিল, 'যদি বৃষ্টি না থামে'। এর জন্য তাঁকে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছিল।

স্ত্রী, এক পুত্র ও কন্যাকে মাত্র পনেরো দিনের সময়কালে হারিয়েছিলেন তিনি। ঐ রকমই হওয়ার কথা ছিল, কেননা মাত্র দু'দিন পূর্বে গরুর গাড়ি চলার পথটি যখন সদ্য নৌ-পরিবহনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে তখনই বৃষ্টির তোড়ের মুখে

মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর" ছাপ দেওয়া বইটিকে ভেসে যেতে দেখেছিলাম আমরা। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বইটি তুলে এনেও কোনো লাভ হয়নি– শুকোলেও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হবে না ভেবে আবার পুণ্যস্মৃতিকে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল। সে-ই শুরু। ক্রমে পুণ্যস্মৃতি কাগজের ঠোঙা অব্দি চলে যায়। " মেমোরিয়াল লাইব্রেরী" এই ছাপ আমি মুড়ির ঠোঙার গায়ে স্বচক্ষে দেখেছি।

একটিমাত্র নৌকাতেই সব তুলেছিলেন পিতা। কিছু কাঁসাপিতল, লেপ-তোশকের সঙ্গে তোরঙ্গ ক'টি। কী ছিল ঐ-সব তোরঙ্গে কেউ জানত না। অবশ্য বিপত্নীক প্রৌঢ় যে এক বিপুল স্বর্ণসম্ভার নতুন রাজকন্যার জন্য নিয়ে চলেছিলেন এরকম ভাবা ঠিক হবে না। কেননা নবীনা রাজকন্যা, আমার বিমাতা, কোনো এক সময়ে "মার দেয়া চুড়িখানও লইয়া গেছ" বলে হিস্‌হিস্ করে উঠেছিল– এ-ও আমার নিজের কানে শোনা। কিন্তু পুণ্যস্মৃতি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন তাঁর সাধ্য কী? ভুল করেছিলেন অনেক। উচিত ছিল তাঁরও ঐ প্লাবনকালেই যাত্রা শুরু করা। জলপৃষ্ঠে পদযাত্রা না হলেও জলপৃষ্ঠে যাত্রা অনেক সহজ ছিল। কিন্তু হেমন্তের ধানকাটা প্রান্তর তরণীর দু'পার্শ্বে ধু-ধু করবে এই আশায় বসে ছিলেন বলেই কানপুরের মোহনায় বড় গাঙ ছেড়ে ছোট নদীতে উঠবার মুখে নৌকা আটকে যায়। খরায় এই চরের দু'পাশে কেবল শীর্ণ দুটি স্রোতই থাকবে এই কথা যারা জানত তারা আদৌ বিস্মিত হয়নি। ভার কমানোর জন্য তোরঙ্গ ক'টি একে একে নামাতে হয়েছিল এবং ওজন দেখেই মাল্লারা সম্ভবত পুণ্যস্মৃতির আন্দাজ করেছিল। "ফালাইয়া দিলে ভার কমতো"– নিচুগলায় তাদের এই আলাপ আমি শুনেছিলাম। পিতৃহৃদয়ে আঘাতের পরিমাণ ঐ বয়সে আন্দাজ করেছিলাম বলেই তাঁকে কিছু বলিনি। কিন্তু ঠিকমতো মাথায় তুলতে না পারায় পা পিছলে নদীতীরে মাঝির সহকারী যখন আছাড় খায় তখন তোরঙ্গে তোলা পুণ্যস্মৃতি জনসমক্ষে আদুল গায়ে এসে দাঁড়ালে তিনি বিভ্রান্ত পায়ে ছপ্ ছপ্ করে জল ভেঙে ডাঙ্গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

উঠে যান স্মৃতিরক্ষার্থে। পার থেকে কুড়িয়ে তুললেও নদীতীরের কাদা ভালো চিহ্নই রেখেছিল তোরঙ্গের বিষয়বস্তুতে। পরে শহরের ফুটপাতের পুরনো বইয়ের দোকান কি ঠোঙ্গার গায়ে..."মেমোরিয়াল লাইব্রেরী" লেখা তোরঙ্গের বিষয়বস্তু এই কারণে খুব বিস্ময়ের সৃষ্টি করেনি।

তোরঙ্গের মালামাল আমি আর কখনো দেখিনি। তাছাড়া ছোট শহরে এ-বাসায় তিন মাস, ও-বাসায় ছ'মাস এমনি করে ছোটাছুটি করলে মরচে-পড়া, তলা-খসে-যাওয়া বাক্স কিছুই ধরে রাখতে পারে না। তবুও আমি ভেবেছিলাম যদি অন্তত একটি বইও পাই তাহলে নিজ সন্তানের হাতে সেটি তুলে দিয়ে মাঝপথে থেমে যাওয়া তালির গণনা আবার পূর্ণ করা যায় কি-না দেখব। সে-ও অগ্নিগোলকের দিকে ছুটে যাক এমন ঠিক না চাইলেও সাতসমুদ্রের দিকে অনন্ত মুখ করে দাঁড়াক– চেয়েছিলাম।

তিন

শেষ মুহূর্তে অনেক কিছুই করা বাকি থাকে। দর্জির দোকানে বানাতে দেওয়া নতুন প্যান্টটিও ফেলে যাওয়া যায় না। রিকশার পাদানি মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছিল। এই জুতোজোড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না জানতাম তবুও পা দুটো উঁচু করে সিটের ঠিক নিচে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। এতে বরং বিপদ আরও বেড়েছিল। চোরাগর্তে চাকা বসে গেলে সদ্যনির্মিত পোশাকটিসহ জলপৃষ্ঠে নেবে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল কয়েকবারই।

'বৃষ্টি যদি আর না থামে' এই কথা কয়েকবার অস্ফুটে বলেছিলাম। আশপাশের কেউ সেই কথা শুনে চিন্তিতস্বরে বলে, "মুশকিল হবে মনে হচ্ছে, আর কিছুক্ষণ বৃষ্টি হলে তো গাড়িও যেতে পারবে না।" আর গেলেই-বা কী, স্রোত যদি এদিক দিয়ে এসে ওদিকে বেরিয়ে যায় ইঞ্জিনের উপর দিয়ে, তা হলে কী করা যাবে। ইঞ্জিনে জল ঢুকলে গাড়ি তো এক পা-ও নড়বে না। যে-বন্ধুর বদান্যতায় যানটির ব্যবস্থা হয়েছিল সে নিজেই যদি ঘর থেকে বেরতে না পারে, পাঁচমাথার মোড়ের সাগর যদি ঢেউয়ে ঢেউয়ে উন্মাতাল হয়, তাহলে কী করা?

তিন দিন আগেই ভুলটি করেছিলাম। সমুদ্রযাত্রার কারণেই সম্ভবত বড় ঘরের চাল থেকে নেমে জলপৃষ্ঠে পদযাত্রার কথা মনে পড়েছিল, এবং প্রথমে শব্দ করে নয়, নিঃশব্দেই বলেছিলাম, "যদি বৃষ্টি না থামে।" সে-কথাও নিশ্চয়ই কেউ শুনেছিল, তাই পরমুহূর্তেই গাছপালার মাথা কাঁপিয়ে, ধোঁয়াটে চাদরে তাদের ঢেকে দিয়ে আরও জোরে এসে জানালায় আঘাত করেছিল বারিধারা ঝড়ো বাতাসকে সঙ্গে নিয়ে।

"তুমি গিয়েই বাসা ঠিক করবে কিন্তু", সন্তানটির হাত দুটি ধরে তার মা আমাকে বলেছিল। জানালার ফাঁক দিয়ে গলে আসা বৃষ্টির ছাট হাতে ধরার চেষ্টায় ছিল শিশুটি। আমি তার দিকে তাকিয়ে "একসাথে গেলেই ভালো করতাম, জানো", বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নাঃ আত্মীয়ের গলগ্রহ হব না।"

একই কথা। আমিও বলি, সে-ও বলে। অথচ এমন করে থাকা যায় না। সে-ও জানে, আমিও জানি।

"কিন্তু একা একা কী করে গোছাবে সব!"

"যা পারি নেব, কীই-বা এমন আছে নেওয়ার। কিছু বিক্রি না করতে পারলে রেখে যাব। বাড়িওয়ালা নেবে।"

যাত্রার এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি। গলির মুখ থেকে তোড়ে ছুটে আসছে স্রোত সদর দরজার দিকে। একটির ওপরে আর-একটি। হাঁটু ডুবেছিল অনেক আগেই। এখন কি ডুববে কোমর?

বাক্স দুটি গোছানো প্রায়। শেষ মুহূর্তে যদি কিছু ঢোকাতে হয়, এজন্য তালা লাগানো হয়নি এখনও। শুভার্থী যাঁরা বিদায় জানাতে এসেছেন প্রফুল্লতার মাঝেও তাঁদের মুখে উদ্বেগ দেখা যায়। ঘরে তো ফিরতে হবে সবাইকেই। এখন যা মনে হচ্ছে ফেরার পথে রিকশাও পাওয়া যাবে না। এই গলির স্রোত ঠেলে বড় রাস্তায় স্কুটার ধরাও খুব সহজ নয়। সদা আমুদে বন্ধুটি জানালার শার্সির প্রায় ভেঙে পড়ার আওয়াজকেও হাসিতে উড়িয়ে দিতে চায়, "আজ না হয় কাল বৃষ্টি তো থামবেই। এত ভাবনা কিসের?"

বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় গাড়ির মালিক সুহৃদ দরজা দিয়ে ঢোকে। "ওঃ কী বৃষ্টি! তোমাদের রাস্তায় ঢোকাই যায় না প্রায়।"

আমি বিভ্রান্তের মতো তাকাই। এবারে স্পষ্ট করে বলি, "যদি বৃষ্টি না থামে।"

চার

গন্তব্য বিদেশি বিমানবন্দরের বাইরে বিশাল চত্বরে নেমে যানবাহনের খোঁজ করব ভাবতেই সন্তানটি ছুটে এসে হাত ধরে টানল। দেখি তার মা-ও পাশে দাঁড়ানো।

"কি, পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো", হেসে বলে সে।

"কী ব্যাপার? তোমরা এখানে? আমার আগেই কেমন করে এলে তোমরা?" এইসব বিস্ময়ের কথা বলবার মুহূর্তে চোখে পড়ে তার পাশেই সব ক'টি তোরঙ্গ একটির ওপর একটি সাজানো। তিনটি কাঠের সিন্দুকই। আমি ছুটে কাছে যাই। "পেলে কোথায়", বলতে বলতে ঢাকনা খুললে পাই সেই সোঁদা ঘ্রাণ। শক্ত মলাটের বাঁধানো বই। সেই বই, অবিকল।

ছাপটিও আছে অস্পষ্ট, তবুও কিছু অংশ পড়া যায়... "মেমোরিয়াল লাইব্রেরী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি পাড় ভাঙে

এক

পাড় ভাঙবার মুহূর্তে তাদের দুজনকে দেখেছিলাম ওই ভাঙবে যে পাড় তারই ওপারে দাঁড়ানো।

ছলকানো নদীর ঢেউ নয়, ক্রুদ্ধ বিস্তীর্ণ ঢেউ আছড়ে পড়ে পাড়ের নিচে, ঢেউ কাটতে থাকে পাড়ের নিচের মাটি, নিরালম্ব করে ওই বিশাল ভূমিখণ্ডটিকে তারপরে সেটি বসে পড়ে নিজের ভারে, শুয়ে পড়ে জলকাঁপানো শব্দের সঙ্গে ঢেউয়ের ছুটে আসা মুখে।

মুহূর্তে ধসে পড়বে যে মাটি তার ওপরে দাঁড়ানো কেউ বাঁচে না ভেবে খানিক দূরে শক্ত মাটির উপরে দাঁড়ানো আমি ছুটে যেতে চাই, বলি, আর যেয়ো না, ওই মাটি দুলবে এখনই, ভাঙবে ওই পাড়।

দুই

সম্পাদকের টেবিলে আমি বসা। এপারেই– হোক বিভাগীয় সম্পাদক। অত বড় নামি ইংরেজি দৈনিক তার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, আত্মশ্লাঘা কিছু তো জন্মেছিলই।

সে যখন আমার দফতরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে এসে দাঁড়ায়, আমার বিস্ময় বুঝি তারও চোখে পড়ে। 'আরে ব্বাস কী বড় টেবিল' মুখ থেকে তাই ওই কথাই প্রথম বেরয়। আসলেই টেবিলটি খুবই বড়। নানা কাজের জন্যই বড় টেবিল দরকার। টেবিলের উপারে বসে ছোটদের পাতা সম্পাদনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্রীটি। আমার টেবিলের বাঁ দিকে বসে শুক্রবারের পাতা সম্পাদনার শিক্ষানবিসি করে যে তরুণ তাকেও মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় আমার টেবিলের উলটো দিকেই । আমিও এমন কিছু প্রবীণ নই, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছি মাত্র বছর চারেক আগেই। 'শ্যালা, দারুণ জমিয়ে বসেছিস', বলে সে যখন আমার টেবিলের উলটোদিকে দাঁড়ায় তখন আমি তাকে বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরব না হাত বাড়িয়ে দেব স্থির করবার আগেই সে টেবিলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমনে দাঁড়িয়ে বাহুমূল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হাতই মেলায়। আমি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত, বিব্রতও। এতকাল পরে, ওই বয়সে আট বছর দীর্ঘকাল, নিঃসন্দেহে, তাকে দেখার বিস্ময় আমার কাটে না।

'কি দেখিস শালা, ভূত না।' বলে মুহূর্তে শার্টের বোতাম খুলে ধবধবে সাদা গলার নিচে বৃত্তাকার রোদে পোড়া লাল দাগ দেখায় সে। 'রোদে পোড়ার দাগ, আছে তোর?'

এতক্ষণে বিস্ময় কাটিয়ে বলি, 'আমি এখানে, তুমি জানলে কী করে?'

'তোর কতো নাম-ডাক, খোঁজ পাওয়া এমন আর কী শক্ত।' মনে পড়ে, ফেলে আসা শহরের অনেক পরিচিতজনই এখন এই মহানগরে, নিজেও আমি কিছুকাল ওই জেলার আঞ্চলিক সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলাম, আমার খোঁজ পেতে তার খুব কষ্ট করতে হয়নি, বুঝি।

'এতকাল ছিলি কোথায়?' স্বাভাবিক কথা বলার চেষ্টা করি আমি, পুরনো দিনে ফিরে গিয়ে।

'জার্মানিতে' মুহূর্তে বলে সে, 'ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, নতুন মিলের ইলেকট্রিক ইনস্টলেশনের কাজ আমার কোম্পানিই করে।' আবার গলার রোদে পোড়া বৃত্তাকার দাগটি দেখায় সে, 'কুলিমজুর নিয়ে কাজ। কিন্তু সুপারভাইজার। বাইরেই থাকতে হয় বেশি সময়।'

আমি বাইরে থাকি না। ঘরের ছায়ায়, টেবিলের এপারে। কয়েক বছরের লেখালেখিতে কিছু পরিচিতি আছে পত্র-পত্রিকার পাঠকসমাজে। এই তো। মনে পড়ে তার বিদেশ যাওয়ার খবর শুনেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে। বলি, 'হ্যাঁ, শুনেছিলাম তোর বিদেশে যাওয়ার কথা। কয়েক বছর আগেই তো।'

'হঠাৎ করেই চলে যাই। সুযোগ মিলে গেল।'

মনে পড়ে তার সাথে দেখা করার জন্য যাই যে বাড়িটিতে সে গৃহশিক্ষক ছিল— আহার-বাসস্থানের বিনিময়ে। দরজার কড়া নাড়লে গৃহকর্তা বেরিয়ে আসেন, তার নাম বলি, 'সে আমার এখানে থাকে না আর,' বলে মুহূর্তে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন গৃহকর্তা।

ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শেষ করে ইসলামপুরে কাজে যাওয়ার মুখে তাকে খবরটি দিতে এসেছিলাম। অনেকদিন দেখা হয়নি। যদিও একই সঙ্গে এক শহর থেকে, একই কলেজ থেকে এখানে আসা আমাদের। ভর্তিও হয়েছিলাম বড় শহরের একই কলেজে। পরে আমি পুরনো শহরের ওই কলেজ ছেড়ে চলে যাই শহরের অন্যপ্রান্তে, দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বলবার মতো কথা নিশ্চয়ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খরচ চালানোর জন্য সকালে ও রাতে প্রুফ দেখার কাজ করলেও। তবু কোনো খবর না দিয়ে চলে যাওয়া কেন বুঝি না। আমার কর্মস্থলের খবর সে জানত না এমনও নয়।

কয়েক মাস আগে গৃহকর্তার সাইকেলে চড়ে বেড়াতে গিছিলাম আমরা। আমি সামনের রডে, সে চালক। পুরনো শহর ছেড়ে, নতুন শহরেরও বাইরে বিমানবন্দরের রাস্তায়। যেতে যেতে গল্প শুনিয়েছিল সে আমায় তার কিশোরী ছাত্রীটির। শিক্ষকের প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণের কথাও। কী করা জানতে চায় সে।

বন্ধ দরজা পেছনে রেখে সরে যাওয়ার মুহূর্তে ভাবি, উপায় খুঁজে পেয়েছিল সে নিশ্চয়ই কিছু।

উঠে দাঁড়ায় সে, 'আজ চলি। দেখে গেলাম। এই পথ দিয়েই যাই তো। আবার আসব।'

সে ঘর থেকে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মনে পড়ে। কলেজে ভর্তি হয়েছিল কলা বিভাগেই। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার? মনে পড়ে, একবার নওগাঁয় এক বন্ধুর আত্মীয় পরিবারে বেড়াতে গেলে সে নিজেকে স্বচ্ছন্দে ইউনিভার্সিটিতে বিএসসি-র ছাত্র বলে পরিচয় দিয়েছিল যদিও সেইবারে সে ইন্টারমিডিয়েট পাস করতে পারেনি। তবুও কোনো ঠিকানা নয়, হাদিস নয়, কোনো চিহ্নও না রেখে সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে ভাবি কোন্ নতুন মিল, কোথায় বসানো হচ্ছে, কিছুই বলেনি। তার সঙ্গে আবার কখনো দেখা হবে কি? প্রায় আট বছর পরে এই দেখা অথচ তার অদর্শনে কখনো পীড়িত ছিলাম এমনও মনে পড়ে না। এবারও হয়তো তেমনি– দেখা না হলেও তার কথা মনে পড়বে না। মফস্বল কলেজে দুবছরেরই তো চলাচল একসঙ্গে। জীবনে কোনো দাগও হয়তো পড়ে না।

তিন

তার মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে পাড়ার রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার মুখে সে জানায়। তার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব শুরু আকস্মিকই– পুকুরঘাটে বসে সে 'রঙ্গিলা, রঙ্গিলা, রঙ্গিলা রে' গাইছিল– মাথাভরা কোঁকড়া চুল, টকটকে গায়ের রং চোখে পড়ার মতো। নাক, মুখ, চোখ– আমি কাছে গেলে ভিন্ন পাড়ার সমবয়সী সদ্য তরুণের যেমন হয়, গানের সমঝদার বুঝে সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়– পুকুরের পাশেই প্রায়। আমি সাদামাটা শ্যামল সদ্য তরুণই, শুধু শহরে কিছু পরিচিতি ছিল আমার, কলেজেও। গান ভালোবাসি, না-গেয়ে উপায় কী! তারও প্রচণ্ড শখ গান গাইবার। তবলা বাজায় ভালো, দু-চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়ার অনুষ্ঠানে গাইতে গেছেও কখনো। এক অনুষ্ঠানে আমিও ছিলাম— দর্শকের গণ্ডগোলে গান শেষ করতে পারেনি। সে-কথা কখনো জানেনি সে। তার পরিবারের সঙ্গে মিশে যেতেও পারি তাই সহজে। সে আমাকে গান গাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল, তবলা শেখানোরও। আমি কিছুই পারিনি কেবল কখনো কোনো অনুষ্ঠানে তাকে সঙ্গ দেওয়া ছাড়া।

আমি একা চলাফেরা করি। অবিভাবকহীন। অন্যের আশ্রয়ে বাস। নিজেই লোখাপড়ার খরচ চালিয়ে নেই— এই সব কথাই সম্ভবত তার মা শুনেছিলেন, এজন্যই বুঝি তার ছোট বোনটিকে পড়া দেখিয়ে দেওয়ার কাজটি দিয়েছিলেন আমায়। কিন্তু সেদিন ডেকে পাঠানো ভিন্ন কারণে। তাঁর একটি চিঠি নিয়ে যেতে হবে বারো মাইল দূরের ভিন্ন থানা শহরের পোস্ট অফিসে। তার বাবা সেখানকার পোস্টমাস্টার জানতাম বলে আমি ওই পড়ন্ত বেলায় দু-ঘণ্টার পথ এক ঘোড়ায় টানাগাড়ি টমটমে উঠে যাই। একবারের জন্যও মনে পড়ে না, আমি কেন, তাঁর ছেলেটিও আমার বন্ধুই, একই বয়সী।

সন্ধ্যার আগেই শিবগঞ্জ পৌঁছে যাই। পোস্টঅফিসের পাশেই পোস্টমাস্টারের ঘর। চিঠি তাঁর হাতে দিলে সেটি পড়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরে তালা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে ফিরতি টমটমে উঠে বসেন। নিয়ে যান তাঁর বাড়িতেও। এবং স্বামী-স্ত্রীতে কিছু নিভৃত আলাপের পরে স্থির হয় স্ত্রী তাঁর পুত্র দুটিকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন দুপুরের ট্রেনেই ঢাকা যাবেন এবং আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তার পথঘাট চেনে না, অন্যটি নেহাৎ শিশু, আর আমার ঘরে ফেরা-না-ফেরার হিসাব নেওয়ারও যখন কেউ নেই। পথঘাটও ভালো চিনি, আমার যাওয়ায় কী অসুবিধে? বড়জোর আমার আশ্রয়দাতাকে শুধু বলা ঘরে ফিরব না, এই। আসা-যাওয়ার দুদিন আমার গৃহ শিক্ষকতার সময়ের মধ্যেই পড়ে, তাই আমার না যাওয়ার কোনো কারণ আছে, কেউ ভাবে না। এমনকি আমিও নই। শুধু রাতে গিয়ে আমার বাসস্থানে বলে আসা যে, আমি ঢাকা যাচ্ছি।

আগের দিন যে পোশাক পরা ছিল, ওই পোশাকেই বেলা তিনটার ঢাকা মেলে উঠে বসি আমরা।

চার

কামরায় ওঠার মুখেই তাকে দেখেছিলাম আমরা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ানো— শহরের পরিচিত ফুটবল খেলোয়াড় ময়নার সঙ্গে কথায় মগ্ন। আমরা ময়নাকে চিনি যত না তার খেলার জন্য অন্য নানা কারণে আরও বেশি। ময়নার সঙ্গে যে কথা বলে সুদর্শনা সে নয়, কিন্তু যুবতী নিঃসন্দেহে— আমরা আগ্রহের সঙ্গেই তার পাশে নিজেদের জায়গা করে নিই। চেনা মুখ দেখে ফুটবল খেলোয়াড় পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

করিয়ে দেয়– 'আমার স্ত্রী'। বন্ধু ও তার মায়ের মুখে কিঞ্চিৎ বিস্ময় দেখতে পাই। আমি ওই পাড়ার না হলেও তারা তো থাকে কাছাকাছিই।

সদ্য পরিচিতার সান্নিধ্য ছেড়ে নিচে নেমে আসি আমরা– তখনও ট্রেন ছাড়ার দেরি আছে, ক্রসিং হবে। প্লাটফর্মের মাঝখানে স্টেশনমাস্টারের ঘর। সহকারী স্টেশনমাস্টার বন্ধুপরিবারের পরিচিত। তাই আমরা ট্রেনে উঠেছি গার্ডকে যেন তিনি বলে দেন এই খবর দেওয়ার জন্য স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকি আমরা।

আর ঠিক তখনই কামরায় ফিরে আসার মুখেই স্কুল পালানো পরীক্ষা না-দেওয়া রঞ্জুর সঙ্গে দেখা। তাকে এড়িয়ে চলার জন্য পাশ কাটাতেই হাত ধরে ফেলে সে, 'জানিস ও কে?' স্বচ্ছন্দে বলি আমরা, 'কেন ময়নার বউ।' 'বউ, না হাতি, ও ঢাকা শহরে পাড়ার মেয়ে, বেশ্যা।' ট্রেনের ঘণ্টা পড়েছে ততক্ষণে, তার কথা ভালো করে বুঝতেও পারি না– ছুটে ট্রেনে উঠে ছেড়ে যাওয়া জায়গায় বসে পড়ি। দেখি যে ময়নার স্ত্রী নয়, আমাদের জন্য তার পাশে দুটি জায়গা রেখে দিয়েছে।

ট্রেন ছাড়বার পরে কিছু সময় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। নিজেদের মুখের দিকে তাকাই। তাকাই যে ময়নার কেউ নয় সেই ময়নার বউয়ের দিকেও। পরিচিত রেলগুমটি, পুল, ঝোপঝাড়, তাল-তমালের ছায়ায় ঘরবাড়ি পার হয়ে ট্রেন চলে যেতে থাকে। আমি কিছু বুঝি না। পাড়ার কথা জানি, পাড়ায় যারা থাকে তাদের দুই-চারজনকে দেখেওছি কখনো শহরের রাস্তায় রিকশা করে যেতে। দেখলেই চেনা যায় নাকি সকলে বলে। আমি না-চিনলেও কেউ-না-কেউ চিনিয়ে দিত। অমন একজন, একই ট্রেনের কামরায়, প্রায় পাশেই বসা– কিছু ভালো বুঝি না। অজানা বোধ, উত্তোজনা মন ভরে দেয়।

চেয়ে দেখি সুদর্শন সদ্যতরুণ ততক্ষণে ময়নার বউ নয়, তবু ভাবীর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। আমি ক্বচিৎ কিছু বলবার চেষ্টা করি এবং শেষে রোদ পড়ে আসা মাঠে সবুজ কি হলুদের দিকে তাকিয়ে থাকি। পার হয়ে যায় রেলগুমটি, পার হয় ছোট স্টেশন, মেল ট্রেন থামে না, গ্রামগঞ্জের শেষে চোখ বন্ধ করে রাখি সময় পেরনোর জন্য। তার মা উলটোদিকের বেঞ্চে সাত বছরের ছেলেটিকে কোনোমতে শুইয়ে দিয়েছেন। পাশের সহযাত্রিণীর সঙ্গে কিছু আগে তাঁর কথা শুনেছিলাম আমি– কোথায় যাচ্ছেন সপরিবারে। বাড়ি কোথায় ইত্যাদি। আমি কে, কেন সঙ্গে যাওয়া এইসব কথার জবাব কী ছিল শুনতে পাইনি।

সন্ধ্যার মুখে ফেরিঘাট কাছেই, বুঝি। ট্রেন অতি ধীরে চলে। কখনো প্রায় দাঁড়িয়েই থাকে। নদীভাঙনের মুখে ঘাট সরিয়ে নিলে নতুন পাতা লাইন। নরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটির ওপরে লোহার স্লিপার– ট্রেন সাবধানে চলে। ঘাটে যখন পৌঁছায় তখন অন্ধকার।

ফেরিতে ব্যাগ দুটি ও মা-ভাইকে রেখে আমরা নেমে আসি ঘাটে। ফেরি ছাড়বার তখনও অনেক দেরি। ভাবীও সঙ্গে নেমে আসে। তার পেছনে সে, আমি সবার পেছনে। কাঠের পাটাতন বেয়ে ঘাটে সে আমার কাছে এসে বলে, 'পেছনে হাত দিয়েছি, কিছু বলে না। চলো ওদিক যাই।'

ভাঙনে নদীর উঁচু পাড় বোঝা যায়। পল্টন থেকে পাড়তক পাতা পাটাতন একেবারে সমতল নয়। নাবলে ঘাটের আলো, ফেরির আলোর আভায় বুঝি পাড় একটু উঁচুতেই। পাড়ের নিচে ধসেপড়া মাটি দেখি– ভাঙন তখনও শেষ হয়নি।

ঘাটে নেমে লোকজনের পথ থেকে সরে যাই আমরা। হেঁটে দূরে গিয়ে উঁচু পাড়ের উপরেই দাঁড়াই। হাতের ডাইনে ফেরির আলো, পল্টনের উপর দিয়ে মানুষ ও মাল চলাচলের শব্দ, সবই দেখা যায়, শোনা যায় কিন্তু বুঝি ওই আবছা আঁধারের পাড়ে দাঁড়ানো কাউকে কেউ দেখবে না।

পাড়ের নিচে ঢেউয়ে ভরা নদী, বাঁয়ে কিছু দূরে দাঁড়ানো আমাদের নিয়ে আসা ট্রেনটি। যাত্রীরা তখনও ফেরি থেকে নেমে চলেছে ফিরতি গাড়ি ধরবে বলে। এইসব দেখার কালে আমি একটু পেছনে পড়ে যাই, দেখি পাড়ের উপরে দাঁড়ানো তারা, দু'পা এগোলে শুনি বন্ধুর গলা, 'লেট আস কিস', মুহূর্তে জবাব 'নট নাউ', এবং তখনই আমি দেখি মাটির উপরে দাগ– কোনাকুনি চলে গেছে পাড়ের সামনের দিকে বেরিয়ে থাকা অংশটি সমান করে কেটে। ছুটে যেতে চাই সামনে, যেন ওদের ধরি, কিন্তু যাই না, বলি, প্রায় চিৎকার করেই, 'আর যাস্ না, এই পাড় ভাঙবে এখনই।'

এপারে মহিলা কামরায় উঠি আমরা। মাকে ও ভাইকে বসিয়ে দিয়ে নেমে যেতে চাইলে অতিতরুণী বলে, 'এখানেই তো অনেক জায়গা, ছেলেমানুষই তো', সদ্য তরুণ আমাদের দেখিয়ে আবার বলে, 'গার্ডকে বলে দিলেই হবে।' আমরা থেকে যাই। অনেক রাতে ট্রেন চলতে শুরু করলে, মনোলোভা তার শরীর বাঁকিয়ে নিজ জায়গাটুকুতে শুয়ে পড়ে, শরীরের নিচের অংশ সে আমাদের দুজনের পেছন দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। সামান্য ঠাণ্ডার জন্য বন্ধুর মা এক চাদরে আমাদের দুজনকে ঢেকে দেন। আমি পেছনে হাত দিতে দেখি, অন্য একটি হাত সেখানে সচল।

মাঝরাতে দ্রুতগতির মেলট্রেনে নিদ্রাকুল যাত্রীদের কান বাঁচিয়ে বয়স্ক সহযাত্রিণী মাকে বলেন, 'আপনার ছেলে দুটিকে এদিকে নিয়ে আসুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিমপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে মা ও ভাইকে রেখে আমরা বেরিয়ে আসি। ঢাকা শহর আমার চেনা, মা তবু সাবধান করে দেন। আর কিছুদিন পরেই যেখানে পড়তে আসব সেই জায়গাটি দেখা দরকার মনে করে রিকশায় উঠি আমরা। পলাশী ব্যারাকের রেইনট্রির ছায়া, এসএম হলের সামনের রৌদ্রছায়ার জাফরিকাটা পথ পার হয়ে শহিদ মিনারের সামনে দিয়ে জারুল, অশোকের ছায়ায় যেন বহুবার দেখা সেই তোরণের সামনে এসে দাঁড়াই। আর ঠিক তখনই রিকশা করে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ায় সাদা কড়কড়ে ইস্ত্রি করা নার্সের পোশাকে ময়নার বউ নয় ভাবী, এখন মনোলোভা।

আমি বিস্মিত— এটি কী করে সম্ভব। বন্ধু সহাস্যে তার সঙ্গে কথা বলে, আমার দিকে তাকায়, 'চল যাই ওর সঙ্গে।' আমার কী হয়— বুঝি বিভ্রান্ত বুঝি বুকে তোলপাড়, বলি, 'আমাদের ফিরতে হবে, এখনই।'

পাঁচ

সময় সব মুছে দেয়। জীবন সামনে যাওয়ার কালে সব ভুলিয়ে দেয়। না হলে টেলিফোনে তার গলা শুনে অবাক হবো কেন? হোক ত্রিশ বছর পরেই।

দশতলার ওপরে অফিস আমার— কোণায় ঘর। দুই দিক কাচে ঘেরা। তাকালে দেখা যায় পড়ে আছে নিচে সারা শহরই যেন। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার সহকারী চিঠির ড্রাফটটি দেখিয়ে বেরিয়ে গেছে যখন তখনই টেলিফোনের শব্দ। সুইচবোর্ড থেকে অপারেটরের গলা, 'আপনার টেলিফোন, স্যার।' অন্যপ্রান্ত থেকে কেউ এক বড় কোম্পানির নাম নিয়ে বলে, 'আমাদের এক কনসালট্যান্ট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

রিসিভার কানে তুলতেই শুনি, 'কি চিনতে পার?' এত বছর পরে বলেই কি অমন সম্ভাষণ? মুহূর্তে চিনে নিই আমি তার গলা, অবাক হয়ে বলি, 'কোথায় তুমি?'

'ঢাকাতেই। কত বড় মানুষ তুমি এখন। চিনবে কিনা বুঝতে পারি না।'

'কত বছর পরে। ত্রিশ বছরই তো। সেই যে জার্মানি থেকে ফেরবার পরে এলি একদিন।'

'তুই-ই তো প্রায় অতদিনই বাইরে। এই সেদিন তোর ফিরে আসার খবর পেলাম।'

কথায় দূরত্ব কাটে, হৃদ্যতা ফিরে আসে। জিজ্ঞাসা করি, 'কোথায় থাকিস। কী করিস এখন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিদ্ধেশ্বরীতে বাড়ি করেছি। আয় না একদিন। চারতলা বাড়ি, তিনতলা ভাড়া দেওয়া। চাকরি করি না আর। এই নানা কোম্পানিতে কনসালট্যান্সি। শরীরও ভালো নয় তেমন।'

'ধানমন্ডিতে থাকি আমি।' বলে কিছু না ভেবেই যোগ করি 'ভাড়া বাড়িতেই।'

'বাড়িতে আয়। বাবা মারা গেছেন। মা আমার কাছে। তোর ফেরার খবর শুনে তোকে দেখতে চাইছেন খুব।'

আমি তার ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করি। তার ছোট বোনটি– আমার ছাত্রী, তার কথাও। কলেজের সেরা সুন্দরী তার বড় বোনটির কথাও শুনি। তার স্তাবক আমিও ছিলাম এককালে, মনে পড়ে। ভাই জার্মানিতে, ছোট বোন রেডিও টেলিভিশনের শিল্পী, তার স্বামী এক বিদেশি শিল্পগোষ্ঠীর প্রধান কর্মকর্তা, বড় বোন মিশনারি কলেজে ইংরেজি পড়ান। নানা কথা বলে সে। শেষে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে কেমন করে যেতে হবে জানালে, 'ওই পাড়াতে অনেকদিন ছিলাম আমি,' বলি।

'ওই পাড়া আর নেই। চিনতেই পারবি না।

মানি আমি। কিছুই চিনি না এখন। নিজেকেও বুঝি না।

সপ্তাহ শেষে একদিন তার দেওয়া ঠিকানায় যাই। সিদ্ধেশ্বরীর বড় গলি চিনতে তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু ছোট গলিটি খুঁজে পাই না। বড় রাস্তা থেকে বাঁয়ে গিয়ে ডাইনে, আবার বাঁয়ে– কিছুতেই মেলে না। শেষে ড্রাইভার বড় রাস্তায় আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে খুঁজে পায় বাড়ি। নিয়ে যায় ঠিকানায়।

শেষ বাঁয়ের গলিটি চেনাই বড় কষ্ট। এই পথে গাড়ি নিয়ে ঢুকলে বেরনো যাবে কি-না ভাবতেই সামনের দরজা খুলে যায়– সে সামনে দাঁড়ায় দরজা খুলে। কোঁকড়া মাথাভরা চুল দেখি না আর, দেখি শুধু একদিনের না-কামানো মুখে শ্বেতচিহ্ন। হলুদ পলেস্তারার বাড়ি। ফ্লাটবাড়ির সিঁড়ির ধাপ– বেয়ে দোতলায় উঠি। মা এসে সামনে দাঁড়ান। আশি বছরের চিহ্ন খুব বোঝা যায় না। আমাকে দেখেই কাঁদতে থাকেন। বুঝি পোস্টমাস্টার স্বামীর কথা মনে পড়ে তাঁর।

বাইরের ঘরটিকে দুভাগ করা পর্দা দিয়ে। দরজার নামফলক দেখেছিলাম– সেখানে 'ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার' লেখা নেই। মাথায় কাপড় দিয়ে তার স্ত্রী সামনে এসে দাঁড়ায়। দেখি সে মনোলোভা নয়। মধ্যবয়সী নারী– সৌন্দর্যের খ্যাতি তার কখনো ছিল হয়তো। ছেলেটি সরকারি চাকুরে, ভিন্ন শহরে বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমার মেয়েটিকে দেশে আনিনি। বিদেশেই নামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সে। ছেলেটিকে সঙ্গে এনেছি। ও-লেভেলের স্কুলে যায়।

পুরনো দিনের কথাও কিছু বলি আমরা। শচীন কর্তার গানের ভক্ত সে এখনও, কিন্তু গাওয়া হয় না আজ বহুকাল। 'আর শোনবার মতো গাইতামই-বা কোন্‌কালে?' বলে হাসে সে।

খেয়ে যাওয়ার জন্য অনেক বলেন তার মা। চায়ের টেবিলে নানা খাবারও সাজিয়ে দেন। আমি প্রায় কিছুই খাই না। চাটুকুই শুধু।

নিচের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় সে। আমার ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয় গাড়ি ঘোরানোর।

বড় রাস্তায় এসে গাড়ি সোজা চলতে থাকলে চোখ বন্ধ করি। স্পষ্ট দেখি ঢেউয়ে ভরা সেই নদী, নদীর উঁচু পাড়, নদীর বরাবর মাটিতে কাটা দাগ— আর ছুটে যাওয়ার মুহূর্তে আমার সেই আর্তরব। কিন্তু কোনোমতে মনে পড়ে না এতকাল ধরে বুকে পুরে রাখা ভুলে যাওয়া সেই কথা— 'যদি না-আনতাম তাকে তুলে, না-আনাই বুঝি ভালো ছিল।'

রাস্তার আলো গাড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। চোখ বোজা থাকালেও আলোর ছায়া সেখানে খেলা করে। আর কিছু না। যেন অনন্তকাল বুকে এঁকে রাখা, এখন মুছে যাওয়া সেই কালান্তকের ছায়াও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি পাখি না ওড়ে

বালিয়াড়ির শেষে যখন তারা নদীটির পাড়ে এসে দাঁড়ায়, তখনও সূর্যে তাপ আছে। শুকিয়ে যাওয়া মহানদীর বালিয়াড়ি পার হওয়া বড় ক্লেশের। কেবল তারা দুজন-ই নয়, নিজ হাতে বিছানো কাঠের পাটাতনের গাড়িটিও তাদের সঙ্গে। সেটিকেও কখনো চালিয়ে, কখনো ঠেলে আনতে হবে জলের সীমানায়।

সময়ের মহানদী এখন ক্ষীণস্রোতা। সময়ের সঙ্গেই তার জল দূরে চলে যায়। ফেরে কখনো বর্ষায়। তখন বালিয়াড়ি থাকে না। নদীর নিচে শুয়ে পড়ে। গাঙশালিকের ঝাঁক উড়ে বেড়ায়, কখনো কেউ বেগে নামে নদীর বুকে– জল ছুঁয়ে উপরে উঠে যায়। কিন্তু তখন ওই না-বর্ষা না-শরৎ না-হেমন্তের কালে, মরা কার্তিক আর ধূসর অঘ্রানের শেষে কেউ থাকে না। আসে যদি তখন বসন্ত, কোনো ফুলবন দেখা যাবে না, এটা বনভূমি নয়, কেউ সাজবে না, খাতে নেমে যাওয়া নদীর বালিয়াড়ির বুকে ছায়া ফেলে উড়বে তখন অজানা পাখির দল।

নদীর ওপারে স্পষ্টই দেখা যায় লালমাটির পাহাড়, তবু হেঁটে যাওয়া যাবে না সেখানে। সময়ের মতো স্থানেরও মোহ আছে, নইলে শ্বেত বালিয়াড়ির শেষে নদীটির ওপারে রক্তিম পাহাড় কেন? তাই নদী পরপারের জন্য জোড়া নৌকার খেয়াটিকে ডাকতেই হয়। বুঝি ওপারেই মাঝির পাটকাঠির চালাটি। রাত না কাটলেও দিন কাটায় সে সেখানেই। আকাঙ্ক্ষী আরোহীর ডাক কানে গেলে জলযানটি এপারে আনবে সে।

বালিয়াড়ির শেষে ঢালু পাড় বেয়ে খানিক নামলে বাঁশকাঠের মাচা। জোড়া নৌকার ফেরি ওই মাচা বরাবর দাঁড়ালে মাঝি রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে সেটিকে খুঁটির সঙ্গে। ধীরে নৌকার পাটাতনে তখন ওঠে আরোহীকুল– থাকে যদি সঙ্গে তিন চাকার উপরে কাঠের আসন পাতা গাড়িটি, সেটিও। অথবা গবাদিকুল। কিন্তু ফেরিতে ওঠার জন্য ঢালুতে নামলে ওপারের কিছু আর দেখা যায় না। ওপারে বালিয়াড়ি নেই– খাড়া পাড়ে লালমাটির আভাস। ঘাটে যদি মাঝি তার ফেরি নিয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে, ডাকতে হয় ঢালুর মাথায় দাঁড়িয়ে। খেয়া তরীটিকে যদিও দেখা যায়, দেখা যায় না তার মাঝিকে কখনো। বুঝি পাটকাঠির চালায় নিদ্রিত সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বালিয়াড়ির পাড় থেকে তাই মাঝিকে ডাকে তারা। দুই নারী-পুরুষ। পরস্পরের সঙ্গী তারা ঠিক-ই, তবু সঙ্গিনীকেই তিন চাকার গাড়ির আসনটিতে বসতে হয়। চালায় কী টানে তার সঙ্গীই। চলায় অসমর্থ নারী সে নয়, শারীরিক অসুস্থতাও প্রবল নয়, তবু সর্বদা বহন করার অঙ্গীকার ওই সঙ্গীই করেছিল। তাই চোরাবলিতে চাকা বসে যেতে চাইলে সে তিন চাকার গাড়ি থেকে নামতে চায়, সঙ্গী তাকে নিষেধ করে এবং ফেলে আসা পথের যতদূর দেখা যায় তার শেষে কখনো সচল কখনো স্থির কৃষ্ণ-অবয়বটির দিকে তাকায়। বুঝি দূরের ওই অস্পষ্ট চেহারার মানুষটি চালকের কথা মানা বা না-মানার হিসাব নেবে।

কেননা, অস্পষ্ট দেখা যায় ওই মানুষটিও একই কথা বলেছিল। সেও তাকে বহন করতে চায়। তিন চাকার গাড়ি একটি তারও আছে। পেছন থেকে ঠেলে সামনে নিতে হয় সেটিকে। তিন চাকার ওপরে বসানো কাঠের বাক্সটি এ-মুহূর্তে নানা রঙের পাত্রে ভরা হলেও স্বচ্ছন্দে সে-বাক্সটিকে খালি করে তাতে পূর্ণবয়স্ক নারীকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে সহজেই।

দুই

শুধু বৃক্ষশীর্ষেই চোখ থাকে না লোকটির— দেখে সে-গাছের কাণ্ডটিকেও। কতখানি উপরে গিয়ে গাছ ছড়িয়েছে তার ডালপালা একটিই দেখে সে প্রথমে। চেরাই করবার পরে কী পরিমাণ কাঠ হতে পারে এটি অনুমান করা চাই। তারপরে কাণ্ডর শেষে আরও কিছু তক্তা যদি হয়, সেটিকেও সে দেখে। বাকি সব ছোট-বড় ডালপালা, শাখা-প্রশাখা জ্বালানির জন্য ব্যবহার করবে সকলে, কিনে নিয়ে যাবে তার কাছ থেকে। পছন্দ হলে গৃহস্থের গাছটিকে কিনে নেয় সে। মজুরির লোক এসে সেটিকে কেটে নিলে নানা আকারে গুঁড়ি নিয়ে যায় সে কাঠ চেরাইয়ের কারখানায়। কখনো মেলে কিছু লাভ, কখনো মেলে না। এজন্য রোজগারের এই পথটি বড় পছন্দ ছিল না তার। কিন্তু কারবার কিছু ছিলও না। নিজ হিস্যার কয়েক কাঠা জমি রেহান দেওয়ার পরে এই পৌষে কিছুই তার ঘরে উঠবে না জেনে গাছ খুঁজতেই গ্রামে-গ্রামে ঘুরছিল সে। আর তখনই একদিন পৃথুলকাণ্ড গাছটির নিচে সঙ্গিনীকে বসে থাকতে দেখেছিল— তার ঘরের বাইরে। এতকালের চেনা গ্রাম, চেনা গাছ, চেনা মানুষ মুহূর্তে প্রথম দেখা মনে হয়। ভিন্ন গ্রামে গাছ খোঁজার কালে যাকে দেখেছিল সে আজ এই এত কাছে, সামনে, দেখে ঘন ছায়া দেয় যে-গাছ, তার কথা খেয়াল থাকে না। স্ত্রীলোকের চোখ সজল নয়, শুধু ভেজা রোদের তাপই দেখা যায়। চেনা মুখে কোনো ভয় নেই জানিয়ে ঠিকানায় পৌঁছে দিতে চায় সে। ফেলে আসা ঠিকানায় আর কখনো ফিরবে না জানালে সে বলে, আমার মাঠেও পৌষ নেই, পৃথুলবৃক্ষের ছায়া কেবল ছায়াই— সূর্য নেমে গেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটিও থাকবে না, বরং চলা যাক সামনে, যদি চায় তাহলে একসঙ্গেই। সঙ্গিনীকে ওই গাছের নিচেই বসিয়ে রেখে সে নিজ হাতে কাঠের আসন-বিছানো ত্রিচক্রযানটিকে নিয়ে আসে। সঙ্গে আনে নিজ ব্যবহারের নকশিকাঁথাটিকে। সেটি গাড়ির আসনে বিছিয়ে দিয়ে বলে, 'উঠে বসো। আর কখনো তোমাকে নামতে হবে না।'

তিন

তিনদিন ঘরে ফেরেনি লোকটি। কৃতকর্মের জন্য কোনো বোধ ছিল না তার। যে ঘরে বাস তার, সেটি নিজের নয়, যে জমির ফসল তোলে সে, সেই জমিও তার নিজের নয়– তাই সবকিছু ভেসে গেলেও, হারালেও তার নিজের কিছুই যাবে না– এই বুঝি চিন্তা। সেই কথাই বলেছিল তার সঙ্গে যে বাস করে সে। না-হলে সারা পরিবারের সারা বছরের শ্রমে ফলানো রেহানি জমির ফসল কেউ মাঠেই হাতবদল করে? চলে যায় শহরে অতি লাভের তেজারতি ব্যবসায়? আর মৌসুমের শেষে ফিরে আসে শূন্য হাতে? শোনা যায়, শহরে তেজারতি ব্যবসায় নয়, ভাগ্যের ব্যবসায় সব খুইয়ে ফেরে সে। তখন টিনের চালা খুলতে হয়। বাঁশঝাড়ের সবকটি বাঁশই চলে যায়, যায় সদ্য বেড়ে-ওঠা কলাগাছের চারাও। আর এসবের কিছুই তার নিজের নয়, সর্বনাশের সব দায় তার হলেও সর্বনাশের তাপ তাকে ছোঁবে না শুনে ঘর ছেড়ে চলে যায় সে। প্রথম দুবার তাকে খুঁজে ঘরে আনলেও এবারে তাকে আর কেউ খোঁজে না। তিনদিন পরে নিজেই ফিরে আসে এবং অন্যের মাটিতে তোলা চালাঘরটি ভেঙে দিয়ে চলে যায়। গৃহবাসের অংশীদার যে, তার তাই ভিন্ন গ্রামে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

চার

নদীর উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে তারা ওপারের মাঝিকে ডাকে। দিনের আলো কমলে কমতে থাকে, সূর্যের তাপও কিন্তু তাতে আরাম হয় না। যদি মাঝি না-আসে তাহলে শূন্য নদীতটে বালিয়াড়ির শেষে অন্ধকারে জ্বলবে শ্বাপদের চোখ– এই ভয়ে আরও জোরে ডাকে তারা মাঝিকে। যদি ঘুম ভাঙে তার। কিন্তু ঘুম ভাঙে না অথবা সে তার পাটকাঠির চালা ছেড়ে চলে গেছে নিজ ঘরে।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় দূরের ছায়া-অবয়বটি স্পষ্ট হয়। ঘর ভেঙে চলে যাওয়া সে তখন সামনে ঠেলা তিন চাকার উপরে বসানো বাক্সটিকে নিয়ে কিছু দূরে এসে দাঁড়ায়। গাড়িতে বসা সঙ্গিনী তার দিকে তাকালে উৎসাহে হাত নাড়াবে কি-না ভেবে লোকটি বিমূঢ় হয়। সঙ্গীও জানে লোকটিকে– তবে কাছে ডেকে নেওয়ার কথা তার নয়, তাই সে ডাকেও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সন্ধ্যা নামে তখন– মাঝি তবু আসে না। নদীর জল কালো হয়। উঁচু দুই পাড়ের মাঝে নদীর খাত অস্পষ্ট হয়। মুছে যায় এ-পাড়ের বালিয়াড়ি কি ওপারের রাঙামাটির পাহাড়। পাড়ে দাঁড়িয়ে নদী বরাবর তাকালে বাঁয়ে কি ডাইনে দূর-গ্রামের ছায়ায় জ্বলে ওঠে কিছু আলো। গৃহস্থ-জীবনের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু সে অনেক দূরে। হয়তো নদী বরাবর পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় সেখানে; কিন্তু গাড়িটির কী হবে অথবা মরীচিকার মতো গ্রামের ছায়া দূরে সরে গেলে সূর্য ডোবার পরে নদীও তার তটরেখা নিয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবে। পায়ে চলার কোনো পথও দেখা যাবে না তখন। পাড় কেটে খেয়ায় ওঠার পথটির মুখে গাড়ি থামায় তারা। সঙ্গিনী বসে থাকে গাড়ির পাটাতনে। সঙ্গী তার ভ্যানগাড়ির এক কাচের আলোটি জ্বালায়। রাত্রি গাঢ় হলে অন্ধকার তাতে কাটবে কিছু নিশ্চয়ই।

ঠেলাগাড়ি নিয়ে লোকটি তখন সামনে এসে দাঁড়ায়। সে কি ভেবেছিল তাকে কেউ বলবে, তুমি এখানে কেন? জবাবও কি তার তৈরিই ছিল? ঘর যে সে ভাঙেনি, গেছিল নতুন ঘর বাঁধবার জন্য এ-কথাই বলবে কি সে?

কিন্তু কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করে না। কোনো শব্দ শোনা যায় না। বালিয়াড়ির নকশায় কোনো জোনাকি ফোটে না। আকাশে কোনো মেঘ দেখা যায় না। সামান্য বাতাসে তবু আসন্ন শীতের আভাস থাকে। এই শূন্য নদীতীরে বালুময় প্রান্তরে 'পৌষ এলো রে' বলে কেউ তাকে আহ্বান করে না।

লোকটি আরও কাছে আসে তখন। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। নিজেই বলে সে, ভয় নাই কোনো কিছুরই। তার কাঠের বাক্সে নানা রঙের আধারে আছে নানা ফলের আরক, নানা স্বাদের আচার। শরীরের তাপ যেমন বাড়াবে তারা, কমাবেও তেমনি। ক্ষুধা মেটাবে যেমন, বাড়াবেও তেমনি। বলে নানা বর্ণের আধারের মাঝখানে রাখা আলোটিকে জ্বালায় সে। বাতিটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবক'টি আধারের ঢাকনা খুলে দেখায়। কোনোখানে বাজিকরের চিহ্ন নেই, বাজি খেলার কোনো সরঞ্জামও নেই। ভাগ্যের ব্যবসায়ী নয় সে তার। আসুক সকাল। দিনের আলোয় আরও স্পষ্ট দেখা যাবে সব।

গভীর রাতে নিজ বাসনামাখা নকশিকাঁথাটি খুলে সঙ্গিনীর গায়ে জড়িয়ে দেয় সঙ্গী। মাটিতে বসবার জন্য ভাঁজ করে রাখা মলিন একটি চাদর ছিল আচারওয়ালার। সেও সেটিকে জড়িয়ে দিতে চায় ফেলে আসা ঘরের অংশীদারের গায়ে। কেউ সেটি গ্রহণ করে না।

প্রহর পারাপারের শিবাকুল নিয়মিত কোলাহল করে, কখনো শিহরণ জাগায় শরীরে। সামান্য বাতাস, কখনো কাঠের বাক্সে রাখা আলোটিকে কাঁপায়, কাঁপায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িটির নিচে ঝোলানো এক কাচের বাতিটিকেও। সেই কাঁপতে থাকা আলো নিদ্রিত কি নিদ্রিত নয়, সকলের মুখ আলোছায়ার রঙে বদলায়।

ক্রমে অন্ধকারের কালো পর্দা হালকা রঙে ওড়ে। শেষ রাত্রির আকাশে মেঘ উড়ে আসে। উত্তর-দক্ষিণ নদীর পুব পারে সূর্যের সাত রং ফুটে উঠবে ক্রমে, আলোয় ভাসবে দিগন্ত। তেমন কিছু ঘটে না, রাত্রিশেষের প্রভাত চরাচরকে স্পষ্ট করে না। নদীর বুকে তাকালে কুয়াশার আবরণ দেখা যাবে। নদী বরাবর দূরগ্রামের ছায়া তখনও দেখা যায় না। অল্প আলোতে শ্বেত কুয়াশায় তারা ঢাকা পড়ে আছে।

চোখ খুলে কিছু তাই দেখে না তারা। কেবল ঘোলাটে আকাশ, শ্বেত দিগন্তে লাল আলোর ছোঁয়াটুকু কেবল। মেঘ আরও কাটলে, আলো আরও ফুটলে খেয়াঘাটের পথ বেয়ে নদীর সীমানায় যায়। পাড়ে উঠে ওপারের মাঝির দিকে, খেয়া নৌকাটির দিকে চেয়ে থাকে। স্বাদু ফলের আর কি অম্লমধুর আচারে প্রাতরাশ হয় না, ভাবে নদীর ওপারে মিলবে কিছু নিশ্চয়ই।

কিন্তু মাঝি আসে না। ক্রমে মেঘ কাটে, আলো ফোটে। চরাচর স্পষ্ট হয়। সূর্যের তাপ বাড়ে। আর তখনই প্রায় দ্বিপ্রহরের শেষে মাঝি তার জোড়া নৌকার খেয়া ওপারে ভেড়ায়। কেউ তাকে কিছু বলে না। মাত্র তিনজন যাত্রী, একটি ভ্যানগাড়ি, তিন চাকার উপরে বসানো কাঠের ঠেলা দেখে বুঝি মাঝির মন ওঠে না। আরও যাত্রীর আশায় অপেক্ষা করে সে। কিন্তু না-হেমন্ত না-শীত না-বসন্তের এই দিনে আর কেউ পাড়ি দিতে আসে না। অবশেষে খেয়া ছাড়ে সে।

নদীর ওপারে লালমাটির ঘাট ক্রমে কাছে এলে নামে তারা। ঢালু বেয়ে উপরে উঠে বিস্মিত দেখে লালমাটির পাহাড় নদীর পাড় থেকে উঠে মিশে গেছে দিগন্তে, তারই পাশে পাশে রাস্তা। দূরে গাছগাছালির রং কিছু দেখা গেলেও স্পষ্ট বোঝা যায় না কতদূর গেলে মিলবে লোকালয়, মিলবে সেই বড় নদী যেটি পার হলে মিলবে গন্তব্য।

লালমাটির অসমান শক্ত পথে গাড়িটি ভালো চলে না। পেছন থেকে ঠেলা যায় না তিন চাকার বাক্সটিকেও সহজে। তবু অতিকষ্টে পাহাড়ি পথে মোড় ঘুরলেই দেখে তারা, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির ওড়াউড়ি। ভাবে, কাছেই আছে বুঝি কোনো জলাশয়। পাখিরা সেখানেই থাকে, যায়ও সেখানেই। কিন্তু দূরে গাছগাছালিই ওদের দেখা যায়– অস্পষ্ট কোনো জলাশয় নয়। দূরের বড় নদীতেই যদি যাবে পাখিরা তাদের সঙ্গে তাহলে থাকা কেন?

গাড়িটিকে থামিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তারা। যদি পাখিদের ওড়াউড়ি বন্ধ হয়! তারা দলবেঁধে কখনো রাস্তার উপরে এসে বসে থাকে, কখনো উড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। মুনিয়ার ঝাঁক এটি নয়, এত ছোট পাখি ওরা নয়, শালিক নয়, চড়ুইও না, অমন দলবেঁধে ওড়ে না তারা। কালো রঙের আকাশভরা যে পক্ষীকুলের কথা শোনা যায় ওরা বুঝি সেই সব পাখিই। বিদেশি পাখি শীতের আশ্রয় খুঁজতে আসে দূরদেশে দলবেঁধে, এ-কথা তারা জানত না, জানলে বলত, তারা তো ওড়ে দূর-আকাশে, বসে বিস্তীর্ণ জলাধারে। এখানে এই রুক্ষ লালমাটির পাহাড়ি পথে এরা ভিড় জমাবে কেন?

সে তার গাড়িটিকে নিয়ে সামান্য চলতে চাইলে পাখির দল যেন পথ আটকে দাঁড়ায়। সঙ্গিনী তাকে দাঁড়াতে বলে, এই পাখিরা চায় না আমি যাই। ওরা না সরলে আমি কিছুতেই যাব না।

ফিরবই-বা কোথায়, সঙ্গী বলে। পাহাড়ি পথের বাঁকে খেয়াঘাট অনেক পেছনে পড়ে আছে। সামনের বড় নদীই হয়তো কাছে, যাই পাখপাখালির ঝাঁক মাড়িয়ে সেদিকেই।

গাড়িটিকে জোরে চালাতে চায় সে। সামনের সমতল পাহাড়ি পথে মোড় নিলেই দেখে সব পাখি উড়াল দিয়ে চলে যায় সামনের দিকে। আবার পথ আটকে ওড়াউড়ি করে।

গাড়ি থামিয়ে তখন বসে থাকে তারা। এই পাখির দল না-সরলে কোথাও যাব না বলে সঙ্গিনী তার পা বুলিয়ে গাড়ির কিনারায় এসে বসে। দিন এখানেও ক্রমে শেষ হয়। কিন্তু লাল পাহাড়ের ওপারে পশ্চিম দিগন্ত বলে সূর্য ডেবার রং মনে হয় বোঝা যাবে না। তাই সামনে তাকিয়ে থাকে সকলে।

আর তখনই সব পাখি উড়ে দূরে বসে। শেষে আরও দূরে। আরও দূরে। এবং মনে হয় ক্রমে তারা দিগন্ত পার হয়ে চলে যাবে।

কেবল একটি পাখি ছাড়া।

একাকী পাখি কী এমন পথ আটকাবে? আটকালেও চাকার নিচে পড়বেই সে, ভেবে নিজ আসনে উঠে বসে চালক।

সঙ্গিনী আবার নিষেধ করে তাকে। পেছনের দিকে তাকায়, বলে, শেষ পাখিটিও উড়ুক আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপসাগরে ডোবে না, ঈভ

এক

রাত্রিশেষে শালুকঢাকা পদ্মবিলের কিনারা ধরে হাঁটবে সে। থামবে সেইখানে শালুকের আবরণ সরালে যেখানে স্পষ্ট হয় স্বচ্ছতোয়ার শরীর। আর জলে নেমে দু'পা গিয়ে নিচে চাইলেই সে দেখবে তার সম্পূর্ণ অবয়ব, মুখচ্ছবিসহ, যদি সেই প্রভাতের রবিকর তাকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

আমি-ই তাকে পদ্মবিলের কথা বলেছিলাম। দিগন্তবিস্তৃত সেই জলাধারের রূপ সামান্য বালকের বর্ণনায় কী-ই বা ফোটে— কোনোমতে বোঝানো যায় না।

শ্বেতরক্তিম সেই আঙরাখার যে শেষ নেই! কিন্তু সে বুঝেছিল নিশ্চয়, দেখেছিল সব-ই দৃশ্যের আড়ালে রয়ে গেলেও।

আমি-ই তাকে শুনিয়েছিলাম ছিন্নবস্ত্র অমলিন কন্যা আর তার হিংসুটে বৈমাত্রেয় ভগিনীর গল্প। অমলিন কন্যা পদ্মবিলে ডুব দিয়ে তীরে উঠে দেখে রাজকন্যার পোশাকে অলঙ্কারে সে ভুবনমোহিনী; দেখাদেখি তার হিংসাগ্রস্ত ভগিনীটিও ডুব দেয় এক-ই পদ্মবিলে। কিন্তু তীরে উঠে দেখে, অলঙ্কার নয়, জলজ কীট জড়িয়ে আছে তার শরীরে, মখমল মসলিন নয়, চীরপরিহিতা কুদর্শনা সে যেন ভিখারিনীই কেবল।

গল্প শুনে সে আমাকে আবার জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, তুই যা বলিস, সব-ই সত্যি হয়। এটিও হবে, তাই না? আমি তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, এ তো কেবল-ই গল্প। বইয়ে পড়া গল্প। নয়-দশ বছর-ই বয়স তো তখন আমার। না হলে বলতাম, গল্প কখনো সত্যি হয় না। আর সে-ও তার সহজ বিশ্বাসে বলত, নিশ্চয় হয়।

দুই

কোলে তুলে নেবার মতো ছোট তখন আমি ছিলাম না তবু মাসি আমাকে দেখামাত্র কোলে তুলে নিয়েছিল। স্টেশনে নেমে মামা পালকিতে উঠেছিলেন অন্য কোনো যান না-থাকায়। আর আমি এক পশ্চিমা মাঝির কাঁধে বসে এসেছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

পদ্মবিলের পার বরাবর ছড়ানো সবুজ পাতার মাঝে ফোটা হাজার শালুকের মেলা দেখতে দেখতে। চার মাইল রাস্তা। প্রভাতসূর্যে তখন তাপও এসেছিল। তাই বুঝি মাসি আমাকে দেখেই কোলে তুলে নিয়েছিল। বয়স্ক মা-বাবা আর বিধবা দিদির সংসারে তখনও কিশোরী একলা মাসি আমাকে তার জীবনের আলোই ভেবেছিল বুঝি। হাত-পা ধুইয়ে, মুখ মুছিয়ে খাওয়ায় সে আমাকে আর তেমনি কোলে নিয়েই বেরিয়ে যায় নিকট প্রতিবেশীদের দেখাতে।

মামাবাড়ির দুইপাশে পুকুর, তার পেছনে আম-কাঁঠালের বাগান, ঘন বাঁশের ঝাড়। পুকুরের পাড়ে পুরনো দিনের দালান, কাছারিবাড়ি। অন্য দুপাশেও বাড়ির সীমানা অনেকদূর ছড়ানো। বাঁশঝাড়, বাগিচা, জঙ্গল পেরিয়ে মাঝখানে পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরেই কেবল যাওয়া যায় সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর বাড়িতে। গ্রামের মূল লোকলয়ের শুরুও সেখানেই। গাছপালায় ঘেরা অনেক কঁটি বাড়িই পর পর সাজানো ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা বরাবর। রাস্তার পাশ দিয়ে চলে যায় বর্ষার স্রোত নিয়ে পদ্মায় নেমে যাওয়া খালটি। এপাশে আবার জঙ্গল, বাঁশঝাড়, ভিন্ন লোকালয়।

পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরে এলে পাড়ার প্রথম বাড়িটিই তাদের– আমার গল্পে মুগ্ধ বিশ্বাসী শ্রোতা। মাসির সখী বলা যায়, যদিও মাসি তখনও হাঁটু পর্যন্ত নামা জামাই পরত আর তার সখীর পরনে শাড়ি। মাসির চাইতে বড় সে নিশ্চয়ই তবু মাসির কোল থেকে আমাকে নেয় সে, বুজে জড়িয়ে ধরে। একটু কাঁদেও বুঝি, মাসিও। মাত্র কিছুকাল আগে মাতৃহীন আমি– আত্মীয়স্বজনের কান্নায় তখনও অভ্যস্ত। নিজে না-কাঁদলেও তাদের কান্নার কারণ বুঝি। ততক্ষণে তার ছোট ভাইবোন ক'টিও চারপাশ ঘিরে দাঁড়ায়। বর্ষার ধারায় কোনো ধুয়ে যাওয়া বারান্দায় উঠে আসে সে। বারান্দায় কাঠের চেয়ারে বসা শীর্ণকায় প্রৌঢ় আমাকে দেখে আমার মৃত মায়ের নাম নিয়ে বলেন তারই ছেলে কিনা আমি। মাসি ও সখী দুজনেই চোখ মুছে মাথা নাড়ে। বারান্দায় বসিয়ে ঘর থেকে নাড়ু, মোয়া ডালায় করে আমার জন্য নিয়ে আসে সে। আমি প্রায় কিছুই খাই না, মাসিও। আমার হাফপ্যান্টের পকেটে সেসব ঢুকিয়ে দেয় সে। ঘরে কি বাইরে আর কাউকে দেখি না। পরে জানি, অনেক আগে মাতৃহীনা সে ছোট কঁটি ভাইবোন ও রুগ্‌ণ পিতাসহ এই সংসারের মূল।

ওইদিন বিকালেই সইয়ের বাড়িতে আসে সে। দিদিমা, বড় মাসিসহ চারজনের মাঝখানে বসি আমি। সকলের আদরের দুলাল, নয়নের মণি যেন। আমার নানা গুণের কথা মাসি বলে। এই বয়সেই বড় বড় সব গল্পের বই পড়তে পারি আমি। চাই কি শোনাতেও পারি সেইসব গল্প। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার ক্ষমতার কথা মাসি জানল কী করে, ওই বয়সে অমন ভাবা স্বাভাবিক ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না— তাই গর্বে বুক ভরেছিল নিশ্চয়। গল্পে গল্পে সন্ধ্যা এসে গেছে প্রায় বুঝলে বড় মাসি বৈকালিক গৃহকর্মের জন্য উঠে যেতে চায়। ছোট মাসির সই তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে বলে, আমিই করে দিচ্ছি এবং দ্রুত উঠে সে বৈকালিক কর্মে হাত লাগায়। বোঝা যায়, এটি তার জন্য নতুন কিছু নয়।

দু-একদিন পরপরই সে বিকালে জঙ্গল-বাগিচা পার হয়ে হাঁটাপথ ধরে গল্প শুনতে আসত। কখনো বড় মাসি বই পড়ে শোনাত, কখনো-বা আমি আমার পড়া গল্প মুখে মুখে বলতাম। ছোট মাসির লেখাপড়ায় তেমন মন ছিল না। গ্রামের প্রাইমারি স্কুল শেষ করে আর পড়েনি সে। বাড়িতেও না। তবু গল্প শোনায় তারও মন ছিল। সন্ধ্যার আলো জ্বলবার আগেই সকলকে উঠতে হতো। সখীটিকেও। ঘরে ছোট ছোট ভাইবোন, রুগ্‌ণ পিতা ভুলতে পারে না সে কিছুতেই। কখনো দেরি হলে বেশ কদিন আর আসত না সে। মাসি বলত, ওর বাবাই হয়তো দায়ী এজন্য।

ওইরকম সময়ে বাগিচা, জঙ্গল, বাঁশঝাড় পার হয়ে হাঁটাপথ ধরে মাসিকে নিয়ে, কখনো-বা আমি একলাই চলে যেতাম তার বাড়িতে। কখনো ভাইবোনের আবদারে অস্থির, কখনো পিতার সেবায় ব্যস্ত, কখনো রান্নাঘরে আগুনের তাপে স্বেদময়। সে আমাদের দেখলেই হেসে দাঁড়াত সামনে এসে। জড়িয়ে ধরত বুকে আর আমিও তাকে ছাড়তে চাইতাম না। কখনো তাকে ঘরে না-পেলে শুনতাম গ্রামের শেষে পানের বরজে অসুস্থ পিতার বদলি খাটতে গেছে সে। কখনো-বা দেখেছি ঘরের চালে উঠে পাতলা হয়ে যাওয়া আস্তরে খড় গুঁজে দিয়ে চালা বাঁধছে। আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। বড় মাসি, ছোট মাসি বা অমন কাউকে ওইরকম কিছু করতে দেখিনি বলেই হয়তো।

তিন

আমি মামাবাড়ি যাওয়ার কিছুদিন পরেই ছোটমামা শহর থেকে এসে আমায় স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমার বয়সে যে ক্লাসে স্বাভাবিক তার চাইতে দুধাপ উপরেই প্রায়। আসলে এক শ্রেণি উপরেই কিন্তু তখন স্কুলের বছর প্রায় শেষ, কদিন পরেই বার্ষিক পরীক্ষা। পাস করলে তো দু-ক্লাস উপরেই চলে যাব শিক্ষকদের এই কথায় মামা রাজি হয়ে যান। আমার নানা গুণের মধ্যে আরও একটি যোগ হয়।

গ্রামের স্কুল— সকালে শুরু হয়ে দুপুরের পরপরই শেষ হয়ে যেত। একলা হেঁটে মামাবাড়িতে ফেরার পথে আমি স্কুলের পেছনে সরষের হলুদ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কী দেখতাম ভরা আমনের ক্ষেতে, ধানের শিষে পাখির ওড়াউড়ি। কখনো দেখতাম অড়হরের ডালে লেজঝোলা পাখি বসে গাছ দুলিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার দূরে চলে যায়। স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে বাজার, বাজারের মুখে পোস্টঅফিস। কখনো ডাকপিয়ন চলে না-গেলে পোস্টঅফিসের বারান্দায় তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম। পরে পড়তি রোদে বাজারের শেষে পদ্মামুখী স্রোতের খাল পার হয়ে, বাঁশঝাড় জঙ্গলের ছায়ার গ্রামে ঢুকলে বড় মন খারাপ করত। আর তখন দূর গ্রামে ফেলে আসা স্বজনদের চাইতেও আমার গল্পের মুগ্ধ শ্রোতাটির কথাই মনে পড়ত বেশি।

ভরা বর্ষায় রাস্তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া খালটি দুকূল ছাপিয়ে ছুটত বড় খালের সঙ্গে মিশে পদ্মায় যাবার জন্য। বড় খালও তখন যেন তীরহীন নদী। বাঁশের সাঁকো পার হয়ে ওপারে গেলে তবেই স্কুল। খালের দুই পার থেকে কয়েকটি বাঁশ পাশাপাশি রাখায় সাঁকোর দুই মুখ প্রশস্ত হলেও মাঝখানে পাতা কেবল একটি মোটা বাঁশ। আর বেশ উঁচুতে বাঁধা আর একটি সরু বাঁশ ধরে সেটি পার হতে আমার শরীর কাঁপত। একদিন সাঁকো পার হওয়ার সময়ে এক বাঁশের মাঝখানে এসে এত কাঁপতে থাকি যে, চোখ বন্ধ করে ফেলি। তার পরে কিছু যেন মনে পড়ে না, মনে পড়ে চোখ খুললে দেখি সাঁকোর প্রশস্ত প্রান্তে দাঁড়ানো আমি। আমার শ্রোতাকুল নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে যে, সেটি আর কিছু নয় কোনো অশরীরী শক্তিই আমাকে একবাঁশের অংশ পার করিয়ে দিয়েছিল। এইরকম ঘটনা আরও দু-একটি ছিল।

গরমের সময়ে বড় ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে শুতাম আমি। আর কেউ নয়। মাসিরা, দিদিমা কি দাদু যার যার ঘরে– দরজা দেওয়া। ওই বয়সে– তখনও নিতান্ত বালকই তো, কেন একলা শোয়ার ব্যবস্থা বুঝিনি। সেটি কি এইজন্য যে, শীতকালে লেপের মধ্যে ছোট মাসি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমালেও গরমের সময়ে পারত না– তার শোয়া খুব খারাপ ছিল। এজন্যই কি? অথবা বন্ধ ঘরের গরম আমার সইত না?

অমনি এক রাতে বারান্দায় একলা শোয়া আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বসি। মৃদু জ্যোৎস্নার রাত্রি। সদর দরজার দিকে চেয়ে দেখি সাদা কাপড়ে মোড়া এক মূর্তি ধীরে হেঁটে আমার দিকেই আসে। বিবশ আমি চোখ বন্ধ করি। কতক্ষণ পরে জানি না, চোখ খুলে দেখি সদর দরজার পাশে মূর্তিটি তেমনি দাঁড়ানো। আর মেঘ-জ্যোৎস্নার রাত্রিতে তখন মেঘ সরে যাওয়ায় সাদা জ্যোৎস্না সদর দরজার পাশে দাঁড়ানো মানকচুর পাতাটিকেই মূর্তি বানিয়েছে। আমার শ্রোতাকুল জ্যোৎস্নার কারুকাজ বিশ্বাস করে না। মাসির সখীটি তো কোনোমতে নয়।

স্কুল থেকে অথবা বাজার থেকে ফেরার সময়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলে রাস্তা কম পড়ত। ঘন বাঁশঝাড়ের নিচে দিয়ে পথ। পাতাঝরার দিনে শুকনো বাঁশপাতা এমন পুরো জাজিম বানাত যে এক পা তুলে আর এক পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেললে পা ডুবে যেত সেই জাজিমে, আর মনে হতো কেউ যেন ঠিক পেছনেই হাঁটছে। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সেও ফেলে পা, শোনা যায় তার পায়ের আওয়াজ, বাতাসে ভাসে সেই শব্দ। আমি বাঁশপাতায় মোড়া সামান্য পথ দৌড়ে পার হয়ে আসি। এই গল্পেও তারা অশরীরীর চিহ্ন খুঁজে পায়। বাঁশবাগান চিরকালই অজানা শঙ্কায় ভরা, তারা বলে। আর সেই শঙ্কা আদৌ অমূলক নয়। সেটি কাটানোর ক্ষমতা সকলের থাকে না।

চার

ভরা বর্ষার শেষে, শ্বেত শরতের কাল চলে গেলে হালকা কুয়াশার হেমন্তে বৈকালিক গল্পের আসর বসে আবার। অনেক দিন পরে সেও আসে। বর্ষার ধারায় সিক্ত সজী·· সে নয়। শরতের জ্যোৎস্না তার মুখে ছিল না, ম্লানমুখী বিষণ্ন সখীকে মাসি তার বাড়ি গিয়ে ডেকে এনেছিল। কখনো অসুস্থ, কখনো কর্মহীন পিতা তার, নিজে পিতার বদলি খেটে, বনেবাদাড়ে ঘুরে, শাকপাতা এনে, ঘরের পেছনে সবজি ফলিয়ে অর্ধাহারের ব্যবস্থা করে সে— এসবই জানা। মাসি তার সইয়ের দুঃখ কমাতে চেষ্টা করে কিন্তু সখীটি সংকোচে ও লজ্জায় সর্বদা ম্রিয়মাণ। এইসব নানা কথাবার্তায় সেদিনের বৈকালিক আসর জমে না। বড় মাসি শেষে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ রে, তোর বাবা নাকি বিয়ের চেষ্টা করছে? এমনিতেই ভেজা চোখ তার, এবারে জলে ভরে যায়। আমাকে কে বিয়ে করবে দিদি? আস্তেই বলে সে। আর আমি গেলে সংসারই-বা চলবে কী করে? সে-কথা সকলেই জানে, তবু মাসি বলে, শুনি তোর বাবা নাকি আবার বিয়ে করবে? ম্লান স্বর শোনা যায়, তাকেই-বা মেয়ে দেবে কে?

সেদিন আর কোনো গল্প হয় না। যে যার কাজে ফিরে গেলে আমি লণ্ঠন জ্বালিয়ে মাদুর পেতে বারান্দায় বসি স্কুলের বইখাতা নিয়ে। মাসি এসে পাশে বসে। আমার বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে। নিজের কিছু বইপত্র আছে তার। হাইস্কুলে পড়বে বলে মামারা কিনে দিয়েছিল। অনেক পুরনো সেসব বই নিয়েও কখনো সে বসে আমার মাদুরে। কিন্তু আজ নয়। আজ সে এসে মাদুরের এক পাশে শুইয়ে পড়ে। অঙ্ক কষতে থাকি আমি। অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে রেখে বলে সে, মেয়েদের বিয়ে না-হওয়া বড় কষ্টের, তাই না? আমি একটু চমকে তার দিকে তাকাই— বিয়ের কথা শুনেই বুঝি। খেয়াল করে দেখি, আজ সে শাড়ি পরা। মনে পড়ে, সেই প্রথম দিন তাকে দেখার কিছুকাল পর থেকেই শাড়ি পরে সে। আর বিয়ে হলেই-বা কী? কষ্ট তো তাতেও কমে না! বালবিধবা বড় বোনের কথা ভেবেই বুঝি বলে আবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমার বয়স দশ। প্রাইমারি স্কুল শেষ প্রায়। মামাবাড়ি থেকে লেখাপড়া করি। দাদুর সঙ্গে হাটবাজারে যাই। পোস্টঅফিসে চিঠি আনতে যাই। ছুটিছাটায় ছোট মামা বাড়ি এলে ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে সারাদিনের রোদে মামার সঙ্গে বাড়ির চারপাশে বেড়া বাঁধি। আমি কী করব। আমার কোনোই ক্ষমতা নেই। মাসিরা যা-ই বলুক না কেন!

পাঁচ

স্কুলের শেষে ফেরার পথে পোস্টঅফিসে যাই। ডাকপিয়ন তখনও ফেরেনি। হাটের দিনে সে বেশি দূরে যায় না। হাটেই চিঠি বিলি করে। যদি মামাদের কোনো চিঠি থাকে এই ভেবে দেরি করি। শেষে বেলা প্রায় পড়ার মুখে ঘরে ফিরি– বাঁশবাগানের শুকনো পাতা মাড়িয়ে, বাড়ির পেছনের সদ্য বাঁধা বাঁশের দরজা খুলে।

রান্নাঘরের বারান্দায় দেখি সকলে বসা। মাসির সইকে নিয়ে আলাপ– কাছে এলেই বুঝি। সারাদিন অন্যের ক্ষেতে, মাঠে, ফলবাগানে ঘোরাঘুরি তার নিত্যকর্ম জানি বলেই রোদে পোড়া ঘামে ভেজা চেহারা দেখে অবাক হই না। তবু আমি কাছে এলে তাদের কথাবার্তা থেমে যায়। বইখাতা রাখবার জন্য ভিতর বাড়িতে যাই। শোবার ঘরের বারান্দার চালে ঝোলানো কাঠের তাকে বইখাতা রেখে ফিরে আসি। রান্নাঘরের দিকে মোড় নেবার মুখে শুনি দিদিমার গলা, বিয়ে হবে তোর, সে তো ভালো কথা, কাঁদিস কেন? কিন্তু বিয়ের পর মাসি, বিয়ের পর– কে রাখবে আমাকে–, কেঁদেই বলে সে, বলে, বুকের কাপড় সরিয়ে দেয়। আর সেই মুহূর্তে, রান্নাঘরের বারান্দার দিকে এগোনোর মুখে, আমি দেখি, তার খোলা বুক, মাসিদের কি দিদিমা কারো মতোই নয়। প্রায় আমারই মতো।

ছয়

বিয়েবাড়ির কোনো চিহ্ন সেখানে ছিল না। তোলা বিয়ে। কনেকে নিয়ে রাখা হবে বিবাহেচ্ছুক পাত্রের গ্রামে– কোনো বাড়িতে। যথাকালে বিবাহস্থলে পৌঁছে দিলে চলবে আনুষ্ঠানিকতা। অসমর্থ পিতার কন্যার জন্য বিবাহরীতিটি নতুন কিছু নয়। তবু দুপুরের মুখে, ভিন্নগ্রামে কনেকে নিয়ে যাওয়ার আগে, মাসির সঙ্গে তাকে দেখতে যাই আমি। রঙিন তাঁতের শাড়িতে তাকে কনেবউটির মতোই দেখায়। মাসি কাছে গেলে ক্রন্দনমুখী তাকে জড়িয়ে ধরে। আমাকেও হাত বাড়িয়ে ধরে সে। বলে, তুই যা বলিস সবই তো সত্যি হয়। তাই না? আমি জবাব দিই, হ্যাঁ।

আশেপাশের বাড়ির দু-চারজন পড়শি ছাড়া আর কাউকেই দেখি না। কেবল ভাইবোন ক'টি তাকে ঘিরে উঠানে দাঁড়ানো। বারান্দায় একটি ফুলপাতা আঁকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিনের তোরঙ্গ। তার বাবা সেটি হাতে নিয়ে নেমে আসে। তিন-চার ঘণ্টার হাঁটা পথ। এখনই বেরতে হবে– বলে তার বাবা ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার দিকে পা বাড়ায়। সেও চলতে শুরু করলে আমরা পেছনে পেছনে যাই। বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে তাকে দেখি। পেছন ফিরে তাকায় সে বারবার।

ঘরে ফেরার মুখে আমরা কোনো কথা বলি না। বাড়িতে ফিরেও নয়। অন্তত তার কথা কেউই বলে না।

সাত

অনেক অনেক রাতে ঘুম ভাঙে আমার। স্পষ্ট বুঝি পাশে কেউ বসে আছে। গায়ে তার হাতের স্পর্শ পাই। মুহূর্তে উঠে বসি। সেটিও জ্যোৎস্নার রাত্রি। চাঁদ অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় তার কিছু আলো বারান্দায় আমার মাদুরে পড়েছে। সেই আলোয় দেখি, বিবাহের কন্যা আমার পাশে। আমি কথা বলতে চাইলে সে আমার মুখে হাত চাপা দেয়। কাউকে ডাকিস না। এই আমি চলে যাচ্ছি– বলে ওঠে সে। ওঠার মুখে বলে, ওরা আমাকে নিল না। সাদা জ্যোৎস্নায় তার চোখে জলের রেখা স্পষ্ট দেখা যায়। তখন প্রায় নিঃশব্দে বলে সে, না থাক আমার কিছু– আমিও তো মেয়ে! তার সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়াই। আমাকে আবার, শেষবারের মতোই বুঝি, জড়িয়ে ধরে সে। বলে, তোর কথা সবই তো সত্যি হয়, তাই না? আমি কিছু না-ভেবে, কোনো কথা না-ভেবে, সত্য কি মিথ্যা না-ভেবে। চোখ বন্ধ করে বলি, হ্যাঁ।

আমাকে ছাড়ে সে। বারান্দা থেকে নেমে বাইরের দরজার দিকে যায়। জ্যোৎস্নার আলো তখন আবার সেই মানকচুর পাতাটিকে কনেবউ বানিয়ে দেয়।

আট

পরদিন সারা গাঁ খুঁজেও তাকে কেউ পাবে না। আমি যদিও জানি সে কোথায়। জানি, সে বড় রাস্তার শেষে পদ্মবিলের কিনারা দিয়ে যাওয়া পায়ে হাঁটা পথ ধরে হাঁটবে। জ্যোৎস্নার শেষে না-আলো না-অন্ধকারের প্রভাত তার সামনে পথরেখা স্পষ্ট করে দিলে, সে তার সামনে পাশে পদ্মবিলের শ্বেতরক্তিম শালুক আর সোনালি পদ্মের যোজনবিস্তৃত প্রান্তর দেখবে। আকাশের কোলে লাল মেঘের নিচে তখন আলোর আধার। সেই আলোয় চিনে নেবে সে পদ্মবিলের স্বচ্ছতোয়া স্থানটিকে। লাল দিগন্তের দিকে মুখ করে জলে নামবে সে। দু'পা নেমে আরও দু'পা গিয়ে প্রথম ডুবটি দেবে, তারপর উঠে আসবে। রক্তিম দিগন্তের উৎস তখন তার সম্মুখে। জলের কিনারায় দাঁড়াবে সে, মাথা সামান্য নিচু করে দেখবে তার মুখচ্ছবি। দেখবে, জলে কাঁপে নিরাবরণ, নিরাভরণ সৃষ্টির প্রথম নারী। ঈভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

দ্যূতক্রীড়া

এক

তালগাছের নিশানা তাদের জানা ছিল। গঞ্জের পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া রেললাইন স্টেশন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটিও জানা। লাইন পেরলে তাল সীমানার নিচে মলিন টিনের পাটবাঁধাইয়ের গুদাম, তারই পেছনের ঘরটিতে তারা মিলবে সকলে। চেনা নিশানা, চেনা ঘর, চেনা বন্দর, রেললাইন, স্টেশন, গুদাম ঘর, পরস্পরের মুখ চেনা– তবুও আজ তারা কেউ কাউকে চিনবে না।

ভর দুপুরের ট্রেনে সে নেমেছিল। কাঁধের ব্যাগটিকে সামলে প্লাটফর্মের শিরিষের ছায়ার আড়ালে খানিক দাঁড়িয়েছিল যেন কেউ না দেখে কোন দিকে যায় সে। পরনের লাল রঙের হাতাকাটা কলারতোলা গেঞ্জিটি বড় উজ্জ্বল তার, খাকি রঙের প্যান্টও সেটি ঢাকতে পারে না। তাই চারপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হয় ট্রেন থেকে যারা নেমেছিল তারা গঞ্জের ভিতরে মিশে গেছে, স্টেশনমাস্টার বৃথা রোদে দাঁড়ায় না, পয়েন্টস্‌ম্যানও না। খররোদে পুড়তে থাকা লোহার রেল পেরিয়ে এককালের খোয়া বিছানো রাস্তায় খানিক হাঁটলেই পায় সে পাট-গুদাম। পেছনে ঘর। প্যান্ট-শার্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে সব ঠিক আছে কিনা।

গুদামের পেছনের ঘরটিতে যার বাস তার কোনো তাড়া নেই। সে জানে গাড়ি বোঝাই পাটের গাঁট নিয়ে কেউ আসবে না আজ– আরও অনেক দিনের মতোই। মহাজন সে কথা জানে। তাই এদিকে আসবার কোনো প্রয়োজন নেই। তার গুদামের সামনের লাইনে ওয়াগনটি দাঁড়ানো, দরজাটি তার বন্ধ– তুলে দেয় না তাতে। কেউ কিছু নামায়ও না। গুদামের বাইরে ছোট একটি চালা। রান্নার জন্য নিশ্চয়। সামান্য ধোঁয়াওঠা উনুন দেখলেই সেটি বোঝা যায়। গেঞ্জি গায়ে লোকটি কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে ছিল না। বরং দূর মাঠের দিকেই তার চোখ যদিও কিছুই ছিল না সেখানে। পোড়া শস্যের শূন্য ক্ষেত প্রায় দিগন্তবিস্তারী বুঝি। দূরে সবুজ সীমানা দেখলেই কেবল বোঝা যায় প্রান্তরেরও শেষ আছে। কিন্তু প্রান্তরের শেষে তার জন্য কিছু নেই সে জানে– কখনো কিছু ছিলও না। মহাজনের গোমস্তাই তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঞ্জের ভিতর থেকে সড়ক ধরে রেলস্টেশনের সামনে এসে দাঁড়াল যে সে ঐ গঞ্জের, গ্রামের মাঠের কি বাজারের কেউ নয়। কেউ তাকে চেনে না। সেজন্যই তার চলায় অসমান পা পড়ে না। পুরো হাতার ডোরাকাটা শার্ট পরনে তার। পায়জামা, স্যান্ডেল। ঐ দুপুরের রোদেও হাতে তার সিগারেট ধরা। হতে পারে গঞ্জের এক হোটেল থেকে দুপুরের খাওয়া শেষ করে চলেছে গুদামঘরের দিকে। যুবক সে নয়, প্রৌঢ়ও নয়– এমন লোক অনেক আছে যাদের বয়স বোঝা যায় না। পোড়খাওয়া চেহারার এমন একজনই বুঝি সে। দ্রুত পায়ে সে স্টেশনের চাতালে ওঠে, প্লাটফর্ম পার হয়, মূল লাইনটির পরে ঘাসে ডোবা মরচে-ধরা আরও দুটি লাইনও পার হয় সে, তারপর চলে যায় গুদামঘরের দিকে।

অনেক পরে, প্রায় পড়ন্ত দুপুরের দিকেই উল্টো দিকের ট্রেনটি আসে। দিনের শেষ গাড়িও বুঝি সেটি। লোক নামানো লোক তোলার জন্য তাই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সেটি। বোঝা যায় মেল ট্রেনটি চলে যাওয়ার জন্যই সরে দাঁড়িয়েছিল। পরে ধোঁয়া ও শব্দের জানান দিয়ে ট্রেনটি চলে গেলে দেখা যায় প্লাটফর্মে দাঁড়ানো পাঞ্জাবি-পায়জামার এক পুরুষ। মধ্যবয়সী অবশ্যই, সম্ভবত চেহারায় কিছু বনেদি ভাবও আছে যেমন থাকে স্থানীয় মাতব্বরদের চেহারায়। তার পাশে দাঁড়ানো এক কিশোর। নিঃসন্দেহে তরুণ নয়, যুবক তো নয়ই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তারা। শেষ ট্রেনের সব যাত্রী চলে গেলে স্টেশন শূন্য হয় আর তখন কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যবয়সী পুরুষ তিন জোড়া রেললাইন পার হয়ে গুদামের দিকে চলে যায়।

দুই

মেঝেতে চাদর বিছানা। সম্ভবত মহাজনের গদি থেকে তুলে আনা– সেখানে কেউ আর বসবে না বলেই বুঝি। চাদরের মাঝখানে চার কোণায় বসে তারা চারজন। চোখ তুলে দেখে তারা যখন অন্যের মুখ তখনই সব চেনা এবং এ কারণেই আপ্যায়নের কথা ওঠে। গঞ্জের দোকান থেকে কখনো হয়তো কিছু আনা যেতেই পারে কিন্তু এ মুহূর্তে নিভানো চুল্লিটিকে আবার জ্বালিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই দেখে সদালাপী সকলে ঘরের বাসিন্দাকে খোসামোদ করে 'মহাজন'ই বলে। গোমস্তা জানে সে মহাজন নয়, তবুও আজ না হোক কাল তো হতেই পারে, এই চিন্তা তার আছে বলে সে হাসিমুখে লাল জামার উপর দিয়ে ঝোলানো ব্যাগটি দেখায়, কিরে কিছু আনিস নাই? ব্যাগের মালিক সেটিকে আরও কাছে টানে, এখন না, পরে। সকলে কথাটি বোঝে। পরে– কখন জানেও তারা। মহাজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তামাশা করে, আসল না নকল? বলেই সে একটু থমকে যায়। লাল জামা ধুলেও বুঝি লাল দাগ মেলায় না ভেবে, তার মালিকের চোখে মুহূর্তে জামার রং উঠে আসে।

এই লাইনের সকলেই জানে তাকে। দুই জংশন স্টেশনের মাঝখানে গাড়ি থেকে ওঠা-নামা করে যারা নিয়মিত অথবা দুই জংশনের ওপারেও যায় যারা মাঝে মাঝেই। কখনো কাঁধের ব্যাগটি অনেক ভারী আর বড় থাকে তার। আধারটি যথেষ্ট বড় না হলে পণ্যের খাতিরে আরও একটি চটের থলিও ব্যবহার করে সে। এ চটের থলি থেকেও ছোট-বড় নানা শিশি বেরয়, কখনো কখনো বোতলও, প্রাণহরা সঞ্জীবনী সুধা কি সর্বব্যাধির আরক। কখনো হাতে তুলে দেখায় সে। ওপার থেকে নিয়ে আসা মহোপকারী কেশতৈল, নিয়মিত ব্যবহারে কেবল বায়ু রোগই দূর হয় না, নানা উন্মাদনাও বশে আসে। ঐ রকম এক বোতল বড় স্টেশনের বাজারে নিয়ে গিয়েছিল সে পাইকারি দরে বেচার জন্য। বেশুমার লাভ– দোকানিকে বোঝায় সে। পুরনো দিনের দোকানদার নিজেও নানা মধ্যমনারায়ণ চাঁদিতে বসিয়েছে, বোতলটিকে কাত করে উপুড় করে নানা দিক থেকে দেখে, দেখে তারল্যের রং, ঘনত্ব, শেষে বোতল খুলে গন্ধ দিতে চায়। ত্রিশ বছরের দোকান তার, খোলা বোতল থেকে উঠে আসা ঘ্রাণ মুহূর্তে তাকে আসল-নকল চেনাবে। কিছুতেই রাজি হয় না বিক্রেতা– বোতল খোলার পরে যদি না কেনে দোকানি তাহলে সমূহ ক্ষতি তার, নানাভাবে বোঝায়। এবং এই বোঝা না-বোঝা, বোঝানো না-বোঝানোর শব্দ কানে গেলে দোকানের সামনে উৎসাহীজনের ভিড় জমে এবং তারই মধ্যে ওপার-বিদ্বেষী দু'চারজনের মুখে স্মাগলার কথাটি জোরেশোরেই উচ্চারিত হতে থাকে। অপরাধী কোনোমতে বোঝাতে পারে না যে বস্তুটি আদৌ ওপারে প্রস্তুত নয়, বড় শহরের বড় নদীর ওপারেই তৈরি এ কথাও বলা যায়, কিন্তু বলতে পারে না। দোকানি তাকে দরজার বাইরে যেতে বলে, উৎসাহী একজন তখন ছুটে এসে তার হাত থেকে বোতলটি কেড়ে নিতে চায়। বাঁচাতে গেলে হাত থেকে বোতলটি বেরিয়ে দরজার পাল্লায় লাগে এবং শব্দের সঙ্গে লোহিত বর্ণের তরল দরজায়, তার জামায়, চৌকাঠে এবং আক্রমণকারীর লুঙ্গিতে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় অপরাধীর হাতেও লোহিত বর্ণ যদিও সবটুকুই বোতলের তরল নয়।

সব কথাই মনে ছিল তার। এজন্যই আসল না নকল এই তামাশার জবাব সে এক কথায় দিতে পারে না। হাত তার মুষ্টিবদ্ধ, চোখের রং জামার রঙকে ছাপাতে চায়, তবুও কিছু বলে না সে। জবাব সে দেবে একটু পরেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

ডোরাকাটা পুরোহাতার শার্টটি তার দামি। প্যান্টের সঙ্গেই পরা উচিত ছিল কিন্তু কোন ভুলে পলিকটের পায়জামার সঙ্গে পরে ফেলে খেয়াল ছিল না। আর থাকলেই-বা কি— কখন কোন্‌খানে কোন্ জামা, কোন্ পাৎলুন, কোন্ পায়জামা কি লুঙ্গি থাকে জানার কোনো উপায় থাকে না। গৃহবাসী সে ঠিকই, কিন্তু ভিন্ন বন্দরের স্থায়ী ঠিকানা কখনো স্থায়ী নয় এ-জন্য এক বিছানায় দীর্ঘকাল শোয়া হয় না তার। নানা গঞ্জে, বন্দরে, শহরে নানা পসারিণীর, দেহেরও, ঘরে রাত্রি কাটে তার। কখনো একই শয্যায় তার দুই পাশে যারা শায়িতা থাকে তাদের শরীরে প্রবাহিত একই শোনিত।

কী ব্যবসায় তার, কী পেশা তার, কোন্ শব্দে কাঁপে তার বুক কেউ জানে না। কেবল জানে সে। ঐ অপরিচয়ের সূত্র খুঁজতেই তিন কোণের তিনজন তার দিকে তাকায়। এতবার দেখলেও সে কে কেউ জানে না। কেবল এক শহর থেকে অন্য শহরে, গঞ্জে, বন্দরে ঘুরে বেড়ায় সে। বাজিকরের বাজির ডুগডুগি সে বাজায় না, তবুও সবাই শুনতে পায়। এ-জন্যই বিনা লাজে বিনা ভয়ে রেললাইন পার হয়ে সে পৌঁছায় তালগাছের সীমানায়, পার হয় মলিন ঢেউটিনের গুদাম, যায় পেছনের আঙ্গিনায়, দরজা খোলা দেখলে ঢোকে সে। প্রতিপক্ষ তিনজনের মুখ দেখে সে। এই দ্বিপ্রহর, এই অপরাহ্ন, এই নিশার শেষে কী মিলবে তার জিজ্ঞাসা করে সে। লাল রং যার চোখ থেকে তখনও মেলায়নি সে মুহূর্তে তার দিকে মুখ তুলে তাকায়, জানায় কিছু না মিললেও গঞ্জের শেষ মাথায় কখনো আলো জ্বলে কখনো নেভে এমন পরমাত্মীয়া দুই প্রমোদবালার মাঝখানের ফাঁকটুকু ভরাবে তার শরীর নিঃসন্দেহে। ডোরাকাটা জামার আস্তিনে লুকানো থাকে না কোনো আয়ুধ। আর থাকলেও সেটি ছুঁড়ে মারবার কোনো যুক্তিও সে দেখতে পারে না। শরীরও কাঁপে না তার তাই, কাঁপবে না আরও কতকাল কে জানে!

চার

এককালের জমাট বন্দর ছিল সেটি। ছত্রিশ গ্রামের এক গঞ্জ। এক ডাকে চিনত সকলে। বড় নদী থেকে সহজে শাখা নদী বেয়ে পোতাশ্রয় যেন। এই গঞ্জে নোঙর করত ভারালী নৌকা। স্বচ্ছন্দে তাই লাডলো কোম্পানি করোগেট টিনের গুদাম বানিয়েছিল। রেল কোম্পানি তার আসা-যাওয়ার পথে একটি স্টেশনমতো বসিয়েছিল তাই। কিন্তু একদিন বড় নদী উল্টো তীরের ভাঙনে দূরে সরে গেলে ছোট নদীটি খাল হয়ে যায়। ভরালী নৌকা ভেড়ে না। গাঁট বোঝাই পাট ওঠে না ওয়াগনে। খালের পারে গঞ্জটি তবুও থেকে যায়, থাকে স্টেশনটিও। একসময়ে স্বর্ণসূত্রের কদরও আর থাকে না। পলিতে ছেয়ে যায় জনপদ, বুজে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

প্রয়ঃপ্রণালি, শহরের। মহাজন তখন দশ গ্রামের দূরের যে ভাইটিকে স্বর্ণসূত্রের মোহে বেঁধেছিল তার জিম্মায় আড়তটিকে রেখে জেলা শহরে নতুন ব্যবসায় চলে যায়।

গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরা ভাইটি প্রথমে ভেবেছিল তারও পরনে হয়তো উঠবে পলিয়েস্টারের পাৎলুন। গুদামের পেছনে দাঁড়িয়ে দূরে সবুজের শেষে কোনো প্রিয় চিহ্ন কোনো প্রিয়জনের খবর না জানলেও তাকিয়ে থাকত সে। সে কেবলই ধূ ধূ প্রান্তরের শেষ সীমানা দেখার চেষ্টা। সরকারি রেলবিভাগ চাকা খসে যাওয়া ওয়াগনটিকে সরাতে পারে না বলে সেটি ঘাসে ডোবা তিন নম্বর লাইনের মাথায় একাই দাঁড়িয়ে থাকে। গরুর গাড়ি আসা বন্ধ হলে ভারালী নৌকা আসা বন্ধ হলে, কুড়ি ওয়াগনের মালগাড়িটিও আর থামে না। সে কেবলই গেঞ্জি গায়ে ঐ সবুজ গ্রামের ছায়ার শেষে আর এক সবুজ গ্রামে কেউ আছে কিনা দেখার চেষ্টা করে।

যার যার স্থানে স্বচ্ছন্দে বসে সকলে। তারপর ঐ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্যই বুঝি বলে, কি মহাজন চুলায় দেওয়ার মতো খড়ি বুঝি নাই। না-মহাজন না-গোমস্তা বোঝে চার কোণার এক কোণায় সে বলতে পারবে কিনা এটিও বুঝি জানতে চায় সকলে।

পাঁচ

কিশোরটিকে সঙ্গে না নিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তার। থানা শহরেই কেবল নয়, জেলা শহরেও নাম ছিল তার। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত উঠেছিলও। তারপরেও আরও বড় চেহারায় মানুষের সামনে দাঁড়াবে বলে জেলা শহর বাদ দিয়ে একেবারে আইনসভায় যেতে চাইলেই ভরাডুবি হয় তার। তিন পুরুষের জমিজমা যতটা পারা যায় বেচেছিল গৌরব অর্জনে কিন্তু প্রথম স্ত্রী বড় ব্যবসায়ীর কন্যা– স্বামী জেলা শহর কি বড় শহর থেকে না-ফিরলেও তার কোনো ক্ষতি নেই ঘোষণা দিয়ে জানায় দুটি পুত্র ও কন্যাটিকে বাঁচাবেই সে। দ্বিতীয় স্ত্রী নিতান্ত কৃষকের কন্যা, কোনো এক মুহূর্তের দায় ঘাড়ে নিতেই ঘরে আনতে হয়েছিল তাকে, দরজার আড়ালেই রয়ে যায় সে। ক্রোধই বুঝি তখন তাকে জেলা শহরেই রেখে দেয়। আইন ব্যবসায়ী নয় কিন্তু আইনের নানা কথা জানে এবং আইনসভায় যাওয়ার কথা ছিল এই পরিচয়ে জেলা শহরের আদালত পাড়ায় নানা উকিল-মোক্তারের কাছে পরিচিত হয়, অঞ্চলের মানুষ তার কাছে তদবিরের তাগিদ নিয়ে আসে। কিন্তু সে-ও কিছুকালের জন্যই। রাগ পড়ে গেলে, ঘরে ফিরে দেখে কিছুই তার জন্য পড়ে নেই। একটি পুত্র তার তিন মাইল দূরের স্কুলের শেষ ধাপে, কন্যাটি কিশোরী– নিজ গ্রামের মিড্‌ল্ স্কুলের শেষ ধাপে। কৃষকতনয়ার পুত্রটি সকলের ছোট। নিতান্ত বালক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিয়নের পথে-ঘাটে কিছুকাল ঘোরাফেরা করে শেষে শ্যালকের টাকায় জেলা শহরে একটি দোকান বসায়। স্টেশনারি দোকান বলে টাকা ধার নিলেও আসলে সেটি পানমশলারই দোকান। দোকান চালানোর জন্য অনতিতরুণ কিশোরই পছন্দ তার। রাত্রিবাস দোকানেরই চাতালে এবং সে কথা জানাজানি হলে শ্যালক তার টাকা ফেরত দিতে বলে, দোকান ততদিনে বেসাতিশূন্য। ভাড়ার টাকা বাকি। কিশোরটি কোথাও যাবে না শূন্য হাতে বুঝে একরাতে আবার ঘরে ফেরে সে। পথে ঝড়বৃষ্টিতে আশ্রয় নেয় ইউনিয়ন সদরে প্রথমা স্ত্রীর পিতৃগৃহেই। অনেক রাতে ঝড়বৃষ্টি থামে, বৈঠকখানায় এক ঘুমের পরে।

কয়েকদিনেই দেখা যায় কিশোরী কন্যাটি বৈঠকখানায় বাসরত কিশোরটির পরম অনুরাগী। বাইরের ঘরের দিকেই মন তার সর্বদা। বড়য়ের কথায় শেষে শহরে যাওয়ার পথে এই স্টেশনে নামা তার।

কিশোরটিকে রেখে আসার কোনো উপায় ছিল না। সঙ্গে রাখারও উপায় দেখে না। শূন্য হাতে তাকে ট্রেনে তুলে দিতে চাইলে সে যাবে-ই বা কেন?

ট্রেন থেকে নেমে পড়তি রোদের আড়ালে সে-ও তাই সঙ্গীসহ রেললাইন পার হয়, তালগাছের সীমানা পার হয়, তারপর গুদামের পেছনের ঐ ঘরে ঢুকে নির্দিষ্ট কোণটিতে বসে পড়ে। কিশোরটি কখনো তার পেছনে কখনো অন্য কোণে কারো পেছনে কি কখনো চাদরের কোণায় ঘুমাতে গেলে কেউ না কেউ তাকে কাছে ডাকে। পরস্পরের চোখের দিকে তাকায় তখন তারা।

ছয়

চারকোণে বসা তারা চারজন। চার রঙের ছবি ও চিহ্নের খেলা। মুহূর্তে সব পরিচয়ের আভাস মুখ থেকে মুছে ফেলে সকলে। বলে, বাজি ফেল।

যেন বিদ্যুৎশিখার মতো মুহূর্তে সবকটি মুখ জ্বলে যায়। মুহূর্তেই নিভে যায়। বাজি ধরবার মতো কিছু নেই, কেউ বলে না। কিশোরটিই তখন বাজিকর, সে বোঝে সব, বলে, তুমি বাজি রাখো থলির ঐ বোতলটি, তুমি বাজি রাখো অঙ্কশায়ী দুই পরমাত্মীয়াকে, তুমি বাজি রাখো সবুজ গ্রামের চিহ্নের ওপারে সবুজ গ্রামটিকে আর তোমার তো কিছুই নেই, তোমার কন্যাটিকেই না হয় বাজি রাখো। এই খেলায় আমি বাজিকর। জিতি-হারি সবই আমার। কিন্তু আমি কখনোই হারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

জ্যোৎস্নার শরীরে আছে শোণিতের ঘ্রাণ

কোনো কোনো গল্প কখনো শেষ হয় না। বারবার বললেও না। যেমন এই গল্পটি। এর আগে অন্তত দু'বার বলা হলেও মনে হয় রচনাটি অপূর্ণ রয়ে গেছে। তাই আবার লেখা। এরকম অনেক ঘটে। শোনা যায়, এক গল্পকার তার একটি গল্প অন্তত আটবার লিখেছিলেন। নানা সময়ে, নানাভাবে। প্রায় একই রকম চরিত্র একই রকম ঘটনা। কিন্তু প্রতিবারই গল্পটি লেখা হয়ে যাওয়ার পরে গল্পের অপূর্ণতা তাঁকে পীড়া দিত।

এই গল্পটিও তেমনি। আগে দুইবার লেখা হলেও সমালোচক প্রশ্ন করেন, গল্পে রক্তের অনুষঙ্গ বারবার আসে, অথচ কেন?

মূল গল্পটি তাহলে আবার লেখা যাক। শুরুটি এই রকম

সেই রাত্রি পূর্ণিমার ছিল অথচ বাতাসে শোণিতের ঘ্রাণ ছিল না। যদিও তখন হালকা শীতের বৃষ্টি বুঝি-বা, বরফকণার স্পর্শহীন। বনপ্রান্তের সবুজ আর দেখা যায় না কিন্তু বৃক্ষরাজি তখনও অস্বচ্ছ আকাশ ধরে রেখেছিল। দ্রুতগামী যানের পথ আলোকিত নয়, তাই চোখ ফেরালে স্প্রুস না পাইন কি মিশে আছে তার সঙ্গে কিছু শ্বেত বার্চ বোঝা যাবে না। যদি ফুটে থাকে বনপ্রান্তে কিছু লরেল কি রডোডেনড্রন দেখবে না কেউ।

আমি বুঝেছিলাম এই সে সময় নয়। পূর্ণচন্দ্রের দিকে মুখ তুলে তৃষিত শিরা তখনও নিষ্ফল আর্তনাদ জানাচ্ছে না এবং না-মানুষ না-শ্বাপদ সেই রক্তপায়ী তখনও শয়ান তার মখমলের বিছানায়। তার কৃষ্ণ আঙরাখা কি রক্তিম উত্তরীয় উড়ছে না হাওয়ায়, লোকালয়ের দিকে যাত্রার জন্য দু'পায়ের আঙ্গুল তার তখনও ভূমি ত্যাগ করেনি। তবুও চোখ বন্ধ করে, যেন কোনোদিকে না তাকিয়ে, যেন অপসৃয়মাণ পিচঢালা রাস্তাও না দেখে, বলি, 'আমি আছি, যদি মনে হয়, বাড়ানো হাত ধরলেই হলো।' আমি কি ভেবেছিলাম এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সে সরে আসবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দিকে। সত্যিই স্পর্শ করবে আমার আঙুল? কি গোপন আনন্দের কোনো আভাস স্পষ্ট হবে মুহূর্তে?

তার পীড়িত জীবনের কাহিনী জানি বলেই কি অমন বাসনা জন্মেছিল? স্বামী, পুত্র দূরে– কেউ তার নয়, সে একজনকে খুঁজে বেড়ায়, এ-সব বুঝি বলেই কি অমন প্রস্তাব? না, তা-ই বা কেন, বৃথা কেন সে তাহলে শোনাবে আমাকে তার সব শূন্যতার কথা?

আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল সে, হেসেছিল কি? 'না, আপনি, না, সব সময়ের জন্য কেউ তো আসতেও পারে?' আমি তেমন নই সে জানে, আমিও জানি, এবং এজন্যই গাড়ির জানালা খুলে দিলে মুহূর্তে যে হিম হাওয়া সুবিন্যস্ত চুল উড়িয়ে দিয়েছিল তা আমার শরীরের ক্লেদ দূর করে না। আমি স্থির। সবুজ জমিতে সাদা হরফের পথনিশানা মুহূর্তে আসে মুহূর্তে যায়। আমি বুঝি, আর পারা যাবে না, ভিতরে কাঁপছে কিছু। বলি, 'থামতে হবে আমাকে, গ্যাস স্টেশন সামনেই। এখনই ভরে নেওয়া দরকার।'

সমালোচক এখানে স্পষ্টই লক্ষ করেন দূর দেশের আবহ। যেমন মাউনটেন লরেল তো সমতল গাঙ্গেয় অববাহিকায় পাওয়া যাবে না। চরিত্র দুটির নিশানা খুব স্পষ্ট না হলেও এ-তো বোঝা যায় সে স্বামী-পুত্র দূরে, একজনকে খুঁজে বেড়ায় যে তার সব শূন্যতা পূর্ণ করবে, এই জাতীয় বাকতৃষ্ণ খুব কাছের দূর বোঝায় না। অবশ্য বাংলা ভাষায় গল্প লেখা হলেই যে সেটি বাঙালি চরিত্রকেই নির্ভর করবে এমন কথা নেই। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের দিকে মুখ তুলে তৃষিত শিরায় আর্তনাদ কি না-মানুষ না-শ্বাপদ সেই রক্তপায়ী শয়ান তার মখমলের বিছানায়? এই কিংবদন্তির চরিত্র কী ঘটনা, স্থান স্পষ্ট করে না? তাহলে?

বৃষ্টির বেগ আর একটু বাড়লে কী করে হাঁটা পথটুকু পার হবো ভেবেছিলাম অনেকবার। তার ঘরের ঠিক সন্ধান আমি জানি না, খুঁজে নেওয়ার জন্যও কিছু পায়ে হাঁটা প্রয়োজন, গাড়ি রাখবার জায়গা দূরে, এইসব চিন্তাও ছিল নিশ্চয়ই, অথবা মাথার হালকা চুলে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা কি কৃষ্ণ প্রলেপের মতো দেখাবে, ছিল এই উদ্বেগও। গাড়িতে নিয়মমতো একটি ছাতা রাখা কখনো ঘটে না, ইঞ্জিনের শব্দটিও আজ বড় অচেনা মনে হচ্ছিল এই পরিচিত যানের– অমনি করেই আমি তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আর তখনি, তার ঘরের দরজায় শব্দ করার মুহূর্তে, গিম্যান ব্রাদার্সের শার্ট, সেসারানির জ্যাকেট, লর্ডন অ্যান্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেইলরের ট্রাউজার আমাকে এত সচেতন করে, এত হৃৎস্পন্দন বাড়ায় যে আমি ফিরে যাওয়ার কথা ভেবে দরজার সামনে থেকে দু'পা পিছিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু মখমলের বিছানায় নিশাচর বুঝি পাশ ফিরেছিল, আমি আবার সামনে এগিয়ে যাই।

কিছু সাদর অভ্যর্থনা আমার জন্য ছিল। সাজানো ঘরটি মনে হয় ঐ ধারণাই স্পষ্ট করে। আমি কেমন করে তাকে সম্ভাষণ জানাব ভেবে দরজা পার হই। তার হাস্যমুখ, প্রসাধনের ক্ষীণ সুবাস প্রবল তাড়নায় একবার আমাকে তার শরীরের খুব কাছে নিয়ে যায়, বুঝি তাকে দেহলীন করি কিন্তু তার করতলও প্রসারিত ছিল না।

কফির পেয়ালা ছোট টেবিলের উপর রেখে আমি চেয়ার টেনে বসি। সেখানে কিছু বইপত্র তখনও রয়ে গেছে, সম্ভবত সারা দুপুর সে তার গবেষণা-পাণ্ডুলিপির খসড়া প্রস্তুত করেছে। আমি কয়েকটি বই কাগজপত্রের উপরে চোখ বোলালে স্পষ্ট বুঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পেরনোর কাজ এখনো চলছে। নানা কথার ফাঁকে টেলিফোনে সে আমাকে তার দুশ্চিন্তার কথা আগেও বলেছে। ডিগ্রি শেষ হলেই বাসাটি তাকে ছাড়তে হবে। কবে কোন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জুটবে, অথবা, অন্য কিছু, কে জানে। আর ঐ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝ থেকে তাকে তুলে জানার জন্য আমি ভেবেছিলাম বলব, আপাতত একা আমার বাসায় আরও একজনের স্থান হতে পারে। অন্তত এই দু'তিন সপ্তাহের ছুটির সময়টুকু স্বচ্ছন্দেই সে কাটাতে পারে আমার সঙ্গেই। কিন্তু সে কথা তখনও তাকে বলা হয়নি।

আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে স্টোভের সামনে কর্মব্যস্ত তাকে দেখতে পাই। কখনো কখনো মুখ ফিরিয়ে আমার উদ্দেশ্যেই কিছু বলে সে, "আমার ননদের বাসায়ই ছুটির সপ্তাহখানেক কাটাব ভাবছি।" প্রায় ছিন্নসম্পর্ক স্বামীর বোন কী করে পরমাত্মীয় হয় এ আমি বুঝি না। "অন্য কোথায়ও থাকলে নানা কথা, সমস্যার সৃষ্টি হবে।" আমি এতক্ষণ তাকে পেছন থেকে দেখছিলাম। কখনো ঈষৎ পাশ ফিরে দাঁড়ালে তার শরীরের ভাঁজ চোখে পড়ে। তার সুগঠনের কথা সে জানে বলেই বুঝি ঘুরেফিরে দেখায় সব, এই ভেবে আমি কাছে উঠে যাই। আমি হাত বাড়িয়ে দেবার মুহূর্তে ঐ কথা শুনে কেবল শূন্য কফির পেয়ালাটিই স্টোভের পাশে রেখে দিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়ে দিনের শেষে এমন ঘটে। সূর্যাস্ত দেখা যায় না বলেই বুঝি সূর্যাস্তের সঙ্গেই সন্ধ্যা নামে। হিমবৃষ্টির রাত্রিতে অতি দক্ষ চালকও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, এইসব যুক্তিতে আমি খাওয়ার শেষেই ঘরে ফিরে যাব বলে উঠি। আমার শহরেই তার ননদের বাস বলে আমার সঙ্গে সে-ও যেতে চায়। আর তখন দেখি সাথে নিয়ে যাবার জন্য বেশ কয়েকটি ব্যাগ সে শোবার ঘর থেকে বের করে আনে। আগেই সব আয়োজন করা ছিল। আমি যে আসবই সে কি জানত?

সমালোচক এখানেও রক্তের চিহ্ন দেখতে পান না। কিন্তু সেটি যে ধমনীতে শোণিতের সবেগ প্রবাহ এবং পরক্ষণেই শৈত্য অনুভূতি সেই বেগ আরও বাড়িয়ে দেয়, নাশচিন্তা সর্বব্যাপী হয়, সমালোচক সেটি লক্ষ করেন না। নির্বোধ সে নয়, তবুও মস্তিষ্কের কোষে সেই চিন্তা, তরল চরিত্রের যৌবন তাকে ছেড়েছে দীর্ঘকাল, তবুও সেটিই তাকে স্পর্শ করেছে ভেবে সে চিত্তদাহে অস্থির এবং যখন সে বোঝে সেই নির্জন তুষারের দিনে আমন্ত্রণ সপ্রেম নয় তখন সে তীব্র আবেগী সর্বনাশা আগুনে জ্বলে কি আন্তধিক্কারে ভূমিলীন হয়, এ-কথাও সমালোচক বোঝেন না।

ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করি। সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিই। তাকে গাড়িতে বসিয়েই একবার রেস্টরুম থেকে ঘুরে আসি। প্রয়োজনের বেশি এই সময়ের ব্যবহার কি তাকে বিরক্ত করেছে ভেবে আমি দরজা খুলে নিজ আসনে বসতে দেখি পার্শ্ববর্তিনী হাস্যমুখীই।

সন্ধ্যাশেষে শহরে ফেরার প্রয়োজন সকলেরই থাকে না। কর্মক্ষেত্রে তারা যায় প্রভাতেই। এজন্যই আমার ধীরগতিতে কেউ অধৈর্য নয়। আমি সরে সরে যাওয়া রাস্তার দিক্-নির্দেশনা পড়ি, শহরের নাম পড়ি, চেনা শহরের নাম অপরিচিত মনে হলে সামনে তাকাই। চাড়াই-উৎরাইয়ের আকস্মাৎ উঁচুতে উঠে নেমে গেলে দেখি সামনে সেই পূর্ণচন্দ্র।

রেস্টরুম বা বাথরুমে তার এত সময় লেগেছিল কেন— এ ব্যাপারটিকে সমালোচক খেয়াল করেন না। গ্যাস স্টেশনের অপরিচ্ছন্নতা বরফের মতো ঠাণ্ডা জানালা ছাড়া চার-পাঁচ ফুটের চার দেয়াল বদ্ধ কুঠুরিতে সত্যিই তো আর বিশ্রাম করা যায় না। তাহলে তার এত সময় লেগেছিল কেন? তার চোখ ভিজেছিল এ-কথা কে বিশ্বাস করবে? তাহলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত বৃষ্টির মেঘ আমরা পেছনে ফেলে এসেছিলাম। এখন শুধু পূর্ণিমা। স্বচ্ছন্দে আমি অরণ্যের ভিন্ন ভিন্ন গাছ কিছু দেখতে পাই। গাড়ি থামালে, আমি নিশ্চিত যে, দেখব বনের ফাঁকে জ্যোৎস্নার নানা কারুকাজ। আর তখনই আমি তাকে সেই কথা বলেছিলাম, "হাত বাড়ানো আছে, ধরলেই হলো।"

"না, জীবন এখনও অনেক বাকি তো। যদি কেউ আসে।" আমি তো কেউ নেই। "পথ বরং খোলা থাক আরও কিছুকাল। কে জানে পুরনো ঠিকানায় গিয়েও তো উঠতে পারি।" আমারটি পুরনো ঠিকানা নয়, সে আমি জানি।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলাম আমরা। হঠাৎ সে বলে, "তার চাইতে বরং আপনাকে একটা গান শোনাই"– বলে সে জ্যোৎস্না রাত্রির ঐ বনপথে কণ্ঠ খুলে দেয়।

আমি অরসিক নই। সে-ও রবীন্দ্রসংগীতের দক্ষ শিল্পী নয়। তাহলে সে আমাকে ঐ পূর্ণিমা রাত্রিতে গান শোনাবে কেন? আমি যেন দেখি এক সাধারণ রমণীর ছাপই তার মধ্যে স্পষ্ট হচ্ছে, সেটিই কি তার উদ্দেশ্য?

"একবারই বুঝি অমন হয়", গান শেষে বলে সে। তার সুরের কোনো রেশ কানে ছিল না বলেই ভাবি তাকে জিজ্ঞাসা করি সেই একবারের কথা। কিন্তু করি না। তখন সে বলে, "কখনো মনে হয় প্রথম ও শেষই বুঝি ছিল সেটি।"

আমি বুঝি তার স্বামীর কথাই বলে সে। আমি জানি রাত্রির পিচঢলা দিগন্তবিস্তারী বনপথে পরিত্যক্ত মানুষটিকেই রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু কেন? সে কি সেই শ্বাপদের কোনো চিহ্ন, তার আংরাখার রঙ, উত্তরীয়ের উড়ন্ত কোণা দেখতে পেয়েছিল।

শ্বাপদের কোনো চিহ্ন, তার আংরাখার রঙ, উত্তরীয়ের কোণা– এইসব কি কিছুই বলে না?

পরিচিত শহরের নানা পথ ঘুরে আমি তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিই। কিন্তু বহুতল ভবনটির ঠিক সামনে নয়। "বলা যায় না, যদি তাদের কেউ নিচের লাউঞ্জে বা রাস্তায় থাকে।" এই রাত্রিতে অবাঞ্ছিত পুরুষ– আমি বুঝি।

"আপনি বরং আমায় ঐ রাস্তার কোণায় নামিয়ে দিন।" দু' মাইল দূরে নামলেও আমার কিছু আসে যায় না, আমি বলতে পারতাম কিন্তু বলি না, বরং ঐ পাড়ার দুর্নামের কথা আমি তাকে জানাই। বলি, এই এখানে নামালে আমি বড় অস্বস্তিতে থাকব। বরং আমি ঐ ঠিকানাতেই পৌঁছে দিই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, না, দরকার নেই।" ত্রস্তে বলে সে। "কিছু হবে না। কোনো ভয় নেই।"

"তাহলে ঘরে ঢুকে বরং আমায় একটি টেলিফোন করে খবর দেবেন।"

"কিন্তু টেলিফোন করবার জন্য তো আমায় এই রাস্তার মোড়েই আসতে হবে। ঘর থেকে অন্য কাউকে টেলিফোন করা...।"

তার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সব কথা মনে পড়ে এবং তার জীবনের কথাও। সে কি সেই জীবনকেই বাঁচাতেই চায়?

"কোন এক সুযোগে আমাকে একটু খবর দেবেন।"

"ঠিক আছে আমি না হয় রাস্তার টেলিফোনেই আসব।"

ঠিকানা থেকে দু' মাইল দূরে নামালেও কিছু আসে যায় না, সে কেন উদ্বিগ্ন হবে অমঙ্গলের আশঙ্কায়? সমালোচক এ-খাত বোঝেন। কিন্তু ঐ রাত্রিতে রাস্তার টেলিফোনে নামিয়ে এনে তার কী লাভ এ-কথা বোঝেন না।

আমি বিছানায় আধাশোয়া বসে আছি এখন। বালিশে পিঠ পাতা। খাটের পাশে রাত্রির টেবিলে আছে টেলিফোনটি। জানালার কাচের পাল্লা খোলা নয় কিন্তু পর্দা গোটানো বলে অনেকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশ স্বচ্ছ। এই কংক্রীটের জঙ্গলেও আমি জানি চাঁদ আছে।

অন্তত তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে আমি ঘরে ঢোকার পরেও। টেলিফোনের শব্দের অপেক্ষায় আছি। হয়তো সে পায়নি নিরালা সুযোগ ঘর থেকে ডাকবার। হয়তো সে সাহস পায়নি রাস্তায় নেমে আসার। কিন্তু যদি সে নেমে থাকে? যদি সে যায় ঐ রাস্তার মোড়ে? এই মধ্যপ্রহর রাত্রিতে?

আমি তার খবর নিতে পারি না। তাহলে?

বিছানা থেকে উঠে কাপড় পরে নিই আবার। বাসার সামনেই গাড়িটি রাখা। আকাশের দিকে তাকাই। মাটিতে আমার ছায়া দেখি। প্রায় শূন্যপত্র মেপ্‌ল্ গাছটির ছায়াও মাটিতে। ব্ল্যাকবেরির ঝোপটিকে যদিও অন্ধকারের স্তূপই মনে হয়। গাছে ঢাকা এই রাস্তা সোজা নেমে গেছে এক বিশাল হ্রদের দিকে। সেখানে আমি জানি চাঁদ আছে।

সেই মোড়ের কাছে আসার আগেই চোখে পড়ে এই লাল এই নীল আলোর রাশি। পাশ দিয়ে ছুটে গেল আর একটি পুলিশের গাড়ি। সাবধানের তীব্র শব্দ আর মুহূর্মুহু বদলানো লাল-নীল আরও কাঁপিয়ে দিয়ে যায় আমার গাড়িটিকে। কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটছে ওখানে? আমি আর সামনে যাই না। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। চোখ বন্ধ করে ভাবি তাহলে সত্যিই কি মনের আগোচরে কোনো পাপচিন্তা থাকে না? থাকে না কোনো বিনাশী চিন্তাও? কিন্তু ঐ গভীর রাত্রিতে কাকে কী জিজ্ঞাসা করব আমি? কাছে গিয়ে কী-ই বা দেখার আছে? কাকে বলব আমি কে?

রাস্তার টেলিফোনে নেমে এসেছিল কি কেউ? রাস্তায় নামিয়ে আনা কি শুধু বিনাশী চিন্তাই? রাস্তায় থাকেই যদি রঙিন আলোর পুলিশের গাড়ি তাহলে সেখানে যাওয়া যাবে না কেন? তার পরিচয়েই-বা প্রয়োজন কার? সে তিন ঘণ্টা বিছানায় বসে ছিল এ কথা কে জানে? কেউ না। বুঝি জানে তারা দুজনেই।

এই কিছুক্ষণ আগে আমাকে ডেকেছিল সে। বসন্তের মাতাল রাত্রিতে। তেমনি পূর্ণিমার রাতে। "সব ফেলে চলে এসেছিলাম পুরনো ঠিকানায়ই", বলে সে। "বলেছিলেন, হাত বাড়ানো আছে, ধরলেই হলো ।" আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখি। আর পারা যায় না। কাচের জানালা দিয়ে ঘষা আলোর আকাশে তাকাই। স্পষ্ট বুঝি হ্রদের জলে ভাসছে শেষ পূর্ণিমার চাঁদ।

মখমলের শয্যা ছেড়ে কফিনের ঢাকনাটি সরাবে সেই মৃত্যুপ্রেমিক এবারে। বাইরে এসে গলে পড়া জ্যোৎস্নার রাত্রিকে দেখাবে সে, তারপর ভূমি ত্যাগ করে দুহাত বিস্তার করে উড়ে যাবে প্রিয় রমণীর শোণিত পানের বাসনায়।

সব গল্পই ভালোবাসার-- হোক সে ক্রোধ, যন্ত্রণা কি বিনাশের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শবশোভাযাত্রা

বাড়িটির শেষে আর কিছু ছিল না। দু-একটি জলাশয়, কিছু শস্যক্ষেত্র, গঞ্জে যাওয়া-আসার পথ, তারপরে বালুচর, শ্মশান, শেষে নদী, আর কোনো বাড়ি নয়, ঘর নয়, এমনকি গাছপালাও নয়। কেবল ডাইনে-বাঁয়ে তাকালে ইতস্তত কিছু ঘরবাড়ি, আম-কাঁঠালের বাগান, একটি লিচুগাছ এবং দূরে একটি বাঁশঝাড়ও দেখা যেত। এ কারণেই উঁচু ভিটের উপরে চারচালা ঢেউটিনের সেই বিশাল ঘর দূর থেকেই চোখে পড়ত। উজ্জ্বল রৌদ্রে সর্বদা না ঝলসালেও সূর্য মাঝগগনে উঠলে চোখে হাতের আড়াল দিতই পথিক।

ঘরের দরজা-জানালা কাঠের। মজবুত কাঠের, মোটা কাঠের থাম, যেন সম্পূর্ণ গাছের কাণ্ডই, ভারী টিনের চারপাশ, জানালায় লোহার গরাদ। তিনপুরুষ হেসেখেলে পার হবে, এমনই বাড়ি। ভিটে মাটির ঠিকই, কিন্তু আলকাতরায় ডোবানো টিনের বেড়ার নিম্নাংশ মাটির দিকে অনেক দূর যায়। ফলে একাধিক প্রভাতে দেখা গেছে কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রমেই সার নিশিকুটুম্বের। ঝরা মাটির স্তূপ দেখা যায়। অনেকে দু-তিন জায়গায়ও চেষ্টা করেছে। হয় কাঠের থাম, না-হয় টিন অথবা কাঠের ভারী সিন্দুক সুড়ঙ্গপথ আটকে দেয়।

বড় নদীতে স্রোত থাকে। স্রোতে ভাঙন হয়। তীরচিহ্ন বারবার নতুন হয়। এ নদীতেও। তবে মোহনা অনেক দূরে, এ কারণে কেউ কিছু ভাবেনি। আর দু'পুরুষ আগে গৃহনির্মাতার এই তীরে আসা অন্যটি ভেঙেছিল বলেই।

প্রথম পুরুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এখানে এলেও মোকাম ছিল তাদের দূরেই। আরও কয়েক গঞ্জে ব্যবসায়। দিনশেষে ঘরে না-ফিরলেও মাস-শেষে চাই কি সপ্তাহ-শেষেও ফিরত। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ তা পারেনি। বিলাসী পুত্র এ-কারণেই কেবল নয়, দূর গঞ্জের হাইস্কুল তক্ পড়া ছিল বলে সে শহরে চলে যায়। থিয়েটার-বায়োস্কোপে নেশা হয়, ভ্রমণপিপাসু বলে খ্যাতিও জন্মে এবং ঐ ভ্রমণকালেই এক পড়তি জমিদারতনয়ার পানি গ্রহণ করে। এই নানা ঘটনায় কর্মচারী ও শরিক মিলে মোকামের গদি নষ্ট করে দেয়। গঞ্জের ব্যবসায় ভাগাভাগি হয়ে যায় এবং শেষে ঐ উঁচু ঘরটিসহ বাড়ি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। স্ত্রীর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

নিয়মিত আসে পুত্রকন্যা কয়েকটি। তখন বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় পুরুষকে চলে যেতে হয় দূরের বড় শহরে। কখনো একাদিক্রমে বৎসরাধিক সে ঘরমুখো হতে পারে না। ক্বচিৎ কিছু অর্থ পাঠালে স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠা কন্যাটি কখনো অর্ধাহারে থেকে শিশু দুটিকে খাওয়াত। তারপর হঠাৎ একদিন পুরুষ নদীতীরে নৌকা থেকে নেমে সোজা চলে আসে। চারচালার দিকে। এই হচ্ছে দ্বিতীয় পুরুষের কথা।

শেষবার ঘরে ফেরার পরে অনেক কাল গেছে। দ্বিবৎসরাধিক। এতদিন আলস্যে কাটবে জানা ছিল না বলেই সঙ্গে আনা রসদ শেষ হয়ে গেলে আমজামের গাছ ক'টি সারি ধরে দাঁড়ায় এবং একে একে চলে যেতে থাকে। অন্য সব ঘরের টিনের ছাউনি অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। বাঁশ কাঠের বেড়া কি খড়ের ছাউনি তেমন দরে বিক্রি হয় না বলে বড় ঘরটিই সকলের নজরে ছিল।

গ্রামে আরও কয়েকজন ছিল এমন। তারা কিংকর্তব্যচিন্তায় অস্থির। আজকালের শেষে এমন দিনের কথা ভাবেনি কেউ। উদ্বেগের খবর আসে সর্বদাই। সপ্তাহ শেষের কাগজটিও নানা কথা বলে। এই ঘর, জমি, মাটি বুঝি ছাড়তে হয় এই ভাবনায় নানা পরামর্শ করে সকলে মিলে। অনেক রাত পর্যন্ত সকলে হেঁটে বেড়ায় শূন্য ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া বড় রাস্তায়।

অনেকে খুব দ্রুত ঠিক করে নেয় কী করা– ভবিষ্যৎ না-ভেবেই। অনেকে কিছু স্থির করে না, অন্যের দেখানো পথে চলে। আর কেউ কেউ সব বুঝে, জেনেও অনন্যোপায়। দ্বিতীয় পুরুষ এ দলের। সে দেখে চারদিকের ঘরের চালা নেমে যাচ্ছে, শূন্য ভিটেতে আগাছা জন্মায়, অনেক ঘরেই সন্ধ্যায় আলো জ্বলে না, কিন্তু সে কিছু করে না।

জ্ঞাতি ছিল কয়েক ঘর একদাগের মাটিতেই, ভিন্ন ভিন্ন উঠানে। বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতিভাই সৌভাগ্যবান– তিনটি পুত্রই তার কিছু কৃতী, শহরবাসী। বৃদ্ধ পিতামাতা, অবিবাহিত ভগ্নী ঐ ত্রয়ীর কাছে বোঝা মনে হয় না। তাই তাদের ঘরের দরজাই বন্ধ হয় প্রথমে। চারচালার ঘর তাদের ছিল না। চালা নামাতে তাই কষ্ট হয় না বেশি। পুরনো ঢেউটিনের যা দাম পাওয়া যায় তাই লাভ, এই ভাবে তারা।

কনিষ্ঠ জ্ঞাতিভাই অবশ্য অত ভাগ্যবান নয়। পুত্র দুটি তার প্রকৃত কুষ্মা। বলদ। কন্যা দুটি বিবাহিত, তাই রক্ষা। শ্বশ্রূগৃহেই যাওয়া না-যাওয়া ঠিক করুক তারা।

মাত্র কয়েক বছর আগেই কনিষ্ঠ জ্ঞাতিভাইয়ের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের মুখে পড়ে। পূর্বাহ্নে খবর না-পাওয়ায় বেশি কিছু সরাতে পারেনি সে। সামান্য তৈজসপত্র। শোবার ঘরের ভাঙা কিছু অসবাবপত্র ক্রোকের মাল হিসেবে ধরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি বলে মাটিতে শুতে হয় না। গলার দড়ি খুলে দিয়ে বলদ দুটিকে অনেকবার ছেড়ে দিয়েছে সে। কিন্তু দুপায়ে হেঁটে যথারীতি ফিরে আসে তারা এবং পিতাসহ নানা বাদানুবাদ শেষে পরস্পরের রক্তপাত করে। এমন অবস্থায় সে-ও কর্তব্য স্থির করতে পারে না। অবশ্য ক্রমশূন্য গ্রাম বলে এককালের মামলাবাজ দালাল গ্রামে বসেও থাকে না। ঘরের টিন-বাঁশ-কাঠ কি বসতবাড়ির জমি অথবা ফসলের ক্ষেত একেরটি অন্যের হাতে বদল করার মধ্যস্থ হিসেবে কিছু পায় সে।

কর্মহীন হতভাগ্যের যা রীতি সে-ও তারই অনুসারী। বিছানায় শোয়া। পিতামহের ভারি খাটটি জানালার পাশে— জানালার পাট খোলা। সব দিকেই জানালা ঘরের। আলো আসে অবারিত, বাতাস খেলে যায় কিন্তু তাতে অনিকেত চিন্তা কিছু কমে না।

শিয়রের জানালার ঠিক বাইরে একটি কাঁঠালগাছ ছিল। ফলহীন দীর্ঘকাল। এখন তাই তার গোড়াটুকুই পড়ে আছে। নদী আর এই জানালার মাঝখানে কোনো বাধা নেই আর। নদীর অপর পারে জনপদের চিহ্ন দেখা যায়, ঘরবাড়ি ও বৃক্ষরাজিসহ। এবং সকলে জানে ঐ জনপদের পরেই আছে আরও বড় নদী। সেই পথে যায় দূর বন্দরের দিকে বাষ্পীয় জলযান। নিঃশব্দ রাত্রিতে কেবল তার বুক ভারি করা শব্দ নয়, সার্চলাইটের আলো এসে এখনও ঘর ভাসিয়ে দিয়ে যায়। মধ্যরাতে উঠে খোলা জানালায় বসে সেই আলোয় স্নান করে সে। পাশাপাশি আরও দুটি চৌকি পাতা। সেখানে দেখা যায় অপ্রাকৃত নারী ও শিশু কিছু। তারা অবগাহনের কোনো খবর রাখে না। শেষরাত্রির দিকে বাতাস আরও শীতল হয়। জানালা বন্ধ করে দেয় তখন।

চোখ বুজে গন্তব্যের সন্ধান করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আপাতত শহরের মাতুলালয়ে। বিবাহযোগ্য কন্যাটির জন্য কোনো স্থান খুঁজে পাওয়া যায়নি। সঙ্গিনী নির্ধারণে ভুল ছিল তার, না হলে দুর্ভিক্ষের পোড়ামাটির দিন পার করে দিয়েই স্ত্রী চলে যাবে কেন?

সংজ্ঞাহীন ছিল কয়েকদিন বুঝি। এই মুহূর্তে কন্যাটি তার কপালের জলপটি তুলে নিচ্ছে। গঞ্জের ডাক্তার এসে দেখে গেছে দু'দিন আগেই। সব ওষুধের ব্যবস্থা করা তার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। পুরনো কাঠের সিন্দুকে উত্তরাধিকার এখনও আছে কিছু, কিন্তু সে-সব বাসন দোকানির হাতে তুলে দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থা করবে এমন কেউ নেই।

উঠানের দিকে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় জ্ঞাতিভাই। তারও বড় ঘরের ভিটেটিই শুধু পড়ে আছে এখন। পেছন দিকের কাঠকুটোর ঘরটিতেই আশ্রয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

তার। দিন তো চলা চাই। চারপাশ হাতড়ে বেড়াচ্ছে সেও। হঠাৎ যদি কিছু ঠেকে।

পীড়িত চোখ তুলে তাকায় পুরুষ। জ্ঞাতিভাই নরম স্বরে বলে, 'এর চাইতে ভালো দর আর পাইবা না। চেয়ারম্যান নিজের মুখে কইছে নগদ টাকা দিয়া দিবে, তবে ঘরটা এট্টু তাড়াতাড়িই ভাইঙ্গা দিতে হবে। তা নিয়ে ঘর তুলতাছেন কয়েকখানা। তাড়াতাড়ি দরকার।"

ঐ দামে একটি চালাও যে কেনা যাবে না নতুন টিনের, সে কথা সকলেই জানে। চুপ করে শোনে সে জ্ঞাতিভাইয়ের আরও যুক্তি। 'তানির মতো মানুষ বইল্যাই তো এত দাম পাইলা। নইলে পুরনো টিন কিননের মানুষই-বা পাইবা কনে?'

ঘরের টিন খুলে বেচতেই হবে এমন কী কথা আছে, বলতে পারত সে কিন্তু বলে না। সত্য তো তার অজানা নয়।

দু'দিন পর জ্বর কমে তার। জ্ঞাতিভাই নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসে। চেয়ারম্যান মাসখানেক সময় দিতে পারেন আরও, কিন্তু লেখাপড়াটি সেরে ফেলতে হবে এখনই। এমন কিছু আইন-আদালতের রেজিস্ট্রি নয়, স্ট্যাম্প লাগানো কাগজে রসিদ সই করে দেওয়া। সন্ধ্যার পরে নতুন দোকানে এসে বসেন চেয়ারম্যান, সেখানেই সই হবে।

অনেকদিন পরে ঘরের বাইরে আসে। দেখে কালকাসুন্দির জঙ্গল আরও ঘন। তেলাকুচার লতা ছেয়ে ফেলেছে বাড়ির পেছনে, বাবলার জঙ্গল কেটে ফেলা গাছের গুঁড়ি ঢেকে আছে ধুতুরার সাদা ফুলে। প্রিয় আমগাছ ক'টির কিছু এখনও আছে। আরও কিছুদিন চলত নিশ্চয়ই। আছে লিচু গাছটিও। সীমানা বরাবর কয়েকটি পুতুর আর শ্যাওড়া গাছ। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে মাঠে ওঠার মুখে আছে শিমুল গাছটি। এই জমির প্রতি তেমন আগ্রহ নেই কারো এখনও। শূন্য প্রান্তরে কে-ই বা আর ঘর বাঁধতে চায়! কর্ষণ করা হলে এই ভিটেমাটি যে ভালো ফসলি জমি হবে তা-ও তো নয়।

বাড়ির একটি অংশ অনেক বছর আগেই হাতছাড়া হয়েছিল তার। সেখানে যারা বসতি করেছিল তাদের ভিটেও আজ শূন্য। জঙ্গলে ঢাকা। ঘাসে ঢাকা রাস্তার পাশের ডোবানালায় শাপলা ফোটে কিছু। দু'তিনটি জলাশয় দেখা যায় এদিক-ওদিক তাকালে। পুকুর কোনোমতে নয়। কোনোকালে কেউ স্নান করেনি সেখানে। নদীর তীরে বসতি। পুকুরের কোনো প্রয়োজন ছিল না। মাছ চাষের জন্যও নয়। সন্ধ্যায় নদীতে জাল ফেলে ফেরার পথে সৌভাগ্যের অংশ দিয়ে গেছে অকাতরে কত জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঠ পার হলে আর এক বসতি। এখনও নির্জন নয়। বাঁশের আড়ায় শুকনো জাল, ফেলে রাখা মেরামতের নৌকা সেই সাক্ষ্য দেয়। বসতির শেষে দোকান কয়েকটি। একটু উঁচুতে নতুন স্থাপনা। মাটির পথ ধরে উপরে উঠে যায়। খোলা দোকানঘরের সামনে বসবার জন্য চেয়ার-টেবিল রাখা আছে। কাঠের লম্বা বেঞ্চও আছে। টেবিলে উজ্জ্বল বাতি জ্বালিয়ে সপারিষদ বসেছিলেন চেয়ারম্যান।

কিছু বলবার চেষ্টা করতেই চেয়ারম্যান বলেন, 'না না, আমি সবই বুঝি। শরীরও তো আপনার ভালো নয়। নেন আরও কিছুদিন সময়। আমি না-হয় কিছুদিন দেরিই করি। তবে কাজ শেষ করা দরকার এই মাসেই।'

আরও নানা আলাপ হয়। কে যায়, কেন যায়, এইসব আলাপও। অমূলক ভয়, অর্থহীন আশঙ্কা। অবশেষে স্ট্যাম্প লাগানো কাগজটি সামনে মেলে ধরেন চেয়ারম্যান। পকেট থেকে কিছু টাকাও, সঙ্গে কলম।

চোখ খুলে ভালো করে দেখে চারপাশ। তারপর সই করে দেয়, খোলা চোখেই। তিন পুরুষ হেসে-খেলে পার করে দেওয়া যায়, অনেক দূর তক্ দেখা যায়, সূর্যের আলোয় ঝকমক করা শীর্ষের সেই প্রসাদ স্থান বদল করে।

একসঙ্গেই ফেরে দুজন। আকাশ পরিষ্কার হলে পায়ে চলা পথ সর্বদা স্পষ্ট দেখা যায় না। ডোবা-নালার মাঝখানে অসমতল ঘরের আস্তরণ ভ্রম জাগায়। বুঝি-বা পড়ে যাবে এক্ষুণি। কিছু বলে না কেউ। কিছু প্রাপ্তি হয়তো ঘটেছে অপরের, কিন্তু নিজের শূন্য ভিটে তো চোখের সামনেই।

উঠানে পা দিতেই ঘরের বারান্দা থেকে নিঃশব্দে উঠে যায় কারা।

আজ আকাশে মেঘ আছে। উত্তরের বাতাসে হিমকণা। জামরুল গাছের ভাঙা ডালটির কোটরে ঢুকে আছে পাখি কোনো। হতে পারে রাতশেষের অন্ধ পেঁচাটি। একসময়ে বাড়ির উঠানে ঢোকার মুখে টিনের বেড়া ছিল। সে-সব নেই আর, তবুও জীর্ণ বাঁশের কাঠামোয় বেয়ে ওঠা পিপুলের লতা, হয়তো আছে মাধবীলতাও, একরকম আড়াল সৃষ্টি করেছে। সেই বেড়া ঘেঁষে কারা দাঁড়িয়ে আছে। মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না, অবয়বও নয়। নদীর ঘাটও সেখান থেকে দেখা যায় না, তবে সেখানে বাঁধা আছে একটিই কেবল নৌকা।

ঘরের সামনেও দাঁড়িয়ে আছে কিছু লোক। মুনীষজন। ঘরভাঙার সরঞ্জাম হাতে। আজ তারা কিছুতেই ফিরবে না। এর আগে দু'বার ফিরে গেছে। চেয়ারম্যানের স্পষ্ট নির্দেশ— আর ফেরা চলবে না। খুলে নেবে ঘরের দেয়াল। থাকে যদি কেউ চালার নিচে, থাকুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার স্বজন। বিছানা ঘিরে। তৈজসপত্র কিছু দেখা যায় না। কাঠের সিন্দুকটিও নয়, চৌকি, খাট, বিছানা, কিছু নয়। ঘরের মাঝখানে কম্বলটি বিছানো। সেখানে দ্বিতীয় এবং শেষ পুরুষ বুঝি তার শেষ দিন কাটায়। সংজ্ঞাহীন, অশক্ত, কী কারণে বোঝা যায় না। অপরিমিত ক্লেশ কী অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা? কে জানে!

দুই পুত্র, কন্যা, বিধবা ভগ্নীর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জ্ঞাতি কয়েকজন। রোরুদ্যমান নয় কেউ। মুখে তাদের কোন ছায়া ভাসে কেউ জানে না।

বাইরে থেকে হাঁক আসে– আপনেরা বাইর হন, কাম শুরু করন লাগব অহনই। বুঝি জ্ঞান ফেরে, হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে সে।

টিনের চালে মানুষ উঠার শব্দ হয়। চালের উপরে হেঁটে দেখে মুনীষ, ঠিক কোন মাথা থেকে কাজ শুরু করা যায়।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে এবারে গৃহতাড়িত পুরুষ। পরিজনের কাঁধে ভর দিয়ে দরজা দিয়ে বেরোয়। কিন্তু আর পারে না। সেই মুহূর্তে জ্ঞাতিভাই কম্বলটি বিছিয়ে দেয়। বলে, শোও। তারপর কম্বলের চারকোণা ধরে সকলে ধীরে তাকে বারান্দা থেকে নামায়। নিয়ে যেতে থাকে উঠান পার করে।

এতক্ষণে বেড়ার ওপারে দাঁড়ানো সকলে দেখে ফেলে শবাধারটি, এবং সীমানা পার হওয়ার মুহূর্তে ছুটে এসে কাঁধ দেয়। সকলের কাঁধ দরকার করে না। কয়েকজন কাঁধে নিয়ে হাঁটে। বাকি সকলে পেছনে পেছনে আসতে থাকে।

ঘাটের দিকে যায় তারা। সেখানে কেবল একটি নৌকা বাঁধা আছে। এত সহযাত্রী। কিন্তু কেউ উদ্বিগ্ন নয়। যত যাত্রীই উঠুক না কেন, গন্তব্যহীন তরুণী কখনো ডোবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেহাননামা

কাগজটি তার পিঠের নিচে ছিল। সরকারি টাকা– ছাপমারা দলিল লেখার কাগজ নয়, সাদা মোটা কাগজ। বোঝা যায় দলিল-দস্তাবেজ কি দানপত্র কিংবা বন্ধকি তমসুকের জন্যও এ কাগজ ব্যবহার করা চলে। সবচেয়ে বড় কথা কাগজের নিচে তার স্বাক্ষর। মাত্র দুবছর আগেই সে সই করা শিখেছিল।

সাদা কাগজে কিছু লেখা নেই। শুধু ঐ স্বাক্ষরটি ছাড়া। একটি শব্দও নেই। ইচ্ছাপত্র যদি এটাকে বলা যায়, তাহলে তার ইচ্ছা কী ছিল তার কোনো হদিস নেই। অথচ যেমনভাবে, যেখানে, স্বচ্ছন্দে সই করা– দেখে মনে হয় এই ভূলোকে তার নামাঙ্কিত সব কিছুই সইয়ের ওপরে লিখে নেওয়া যায়।

কেন অমন কাগজে সই করেছিল সে? কী দেওয়ার ছিল তার? কিংবা কিছু পাওয়ার জন্যই কি? তাহলে দাতার সম্মতি কোথায়?

কী দেওয়ার থাকতে পারে তার? ভূমিহীন গ্রামীণ কৃষক, কী আছে তার? ছনের চাল বাঁশের বেড়ার দু'তিনটি ঘর, এই তো। কী আর সম্পদ থাকতে পারে তার যে বিনা কথায় সব লিখে দেবে! অনেক দিনের চেষ্টায় অনেক পথ ঘুরে অন্যের জমি চাষ করে নিজ ঘরে ফসল তোলার ব্যবস্থা করেছিল সে ঠিক। রেহানী জমি, অনেকটা।

অভাবিতই বলা যায়। আর সেজন্যই আনন্দে, আশঙ্কায়, আশায় বলে ফেলেছিল, একবার– একবার ক্ষ্যাতভরা নিজের ফসল দ্যাখার লাইগ্যা জীবনডাও দিতাম পারি। সেই মুহূর্তের অতিশয়োক্তিই কি তার কাল হয়ে দাঁড়াল? জীবন দানের চুক্তি কোনো কাগজে লেখা যায় না। এ কথা সবাই জানে।

আরও একটি ব্যাপার ঘটেছিল। একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমিতিতে যোগ দিয়ে কিছু লেখা, কিছু পড়া, নাম স্বাক্ষর করাও শিখেছিল। জমি রেহান নেওয়ার ঋণ মিলেছিল সেই সংস্থা থেকেই। নিজ হস্তাক্ষরে ঋণপত্র সই করেছিল সে। আর এই অসম্ভব ক্ষমতায় গর্বিত সে কাগজ পেলেই সই করার চেষ্টা করত যাতে স্বাক্ষর আরও ভালো হয়। সাদা কাগজে সই করা কী ঐ জন্যই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে চলেছিল তখন। কার্তিক মাসের রোপা ধান। শীর্ষে পুষ্ট সবুজ ছড়া ঢেউয়ের মাথায় ওঠে, কখনো নিচে পড়ে যায়। গাঢ় সবুজ ফিকে হয়ে এসেছে, সেই ঢেউয়ে বোঝা যায়। কখনো হলুদও প্রায়। এক মাসের মধ্যেই কাস্তে হাতে মাঠে নামবে স্বপ্নদেখা মানুষ। এত দিনের অপেক্ষা, এত দিনের শ্রম, অর্থ মাটিতে মিশেছিল। ক্রমে সবুজ আশা হলুদ বাসনার সঙ্গে ঘরে উঠে আসবে। এই সময় কে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করবে ঐ ক্ষেতের? হোক না তা রেহানী ক্ষেত। সেও তো তার অধিকারের মধ্যেই। সম্পদই তো।

দু'হাত ভরে দেবে ফসলে এমন জমি পাওয়া সহজ নয়। তবে নিজে কিনে নিতে না পারলেও চাষ করার অধিকার পাওয়া যায়। ফসল তৈরির সব খরচ ভাগাভাগি করলে ফসলও ভাগাভাগি। আর নিজে সব করলে ফসলও থাকবে নিজের। এমনও হতে পারে যে জমি রেহান নিয়ে আর একজনকে চাষ করতে দেওয়া যায়। কোনো খরচ নেই। ফসলশেষে কাঠা প্রতি ধান পাবে এক মণ। নিজে সব করলে কাঠা প্রতি সে রকম জমিতে চার-পাঁচ মণ ধানও পাওয়া যাবে, যদিও বন্ধকি টাকা থাকে অক্ষত। জমির মালিক টাকা ফেরত দিলেই ফিরে পাবে তার জমি। রেহানগ্রহীতা ফিরে পাবে তার টাকা।

এমন জমিই সে নিয়েছিল। সমিতির সুপারিশে ঋণ নিয়ে অন্যের সুফলা জমি রেহান নিয়েছিল সে। সব নিজে করবে বলে। আদিগন্ত ধানক্ষেতের আইলের কোণায় সেচ করার কলও বসিয়েছিল ঐ টাকা থেকেই। একটি মাচা তৈরি করেছিল— উপরে সামান্য ছাউনি। মাচার নিচে সেচের পাম্প। মাচার চাটাইয়ে রাত্রিবাস। জল চুরি বন্ধ করার জন্য। কেবল নিজ জমিতেই নয়, অন্যের ক্ষেতেও সেচ করত সে, অর্থের বিনিময়েই। এমনকি এই কাজে তার হাতে হাত লাগানোর জন্য আর-এক ভূমিহীনকেও সঙ্গে নিয়েছিল দৈনিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সবকিছু মিলিয়ে যে বৈভব তার মুঠিতে প্রায় সেটি কেন সে খুলে দেবে?

অবশ্য এই রকম মুঠিও অনেকে খুলে দেয়। রোগশোকে, কন্যাদায় বা আকস্মিক প্রয়োজন অনেককে বাধ্য করে নিজের স্বপ্ন অন্যের কাছে কিক্রি করে দিতে। তার ঐ রকম কোনো দায়, কোনো প্রয়োজনও ছিল না। অন্তত কেউ জানত না। কারো কাছে বলেনি সে।

তাহলে কি আরও কিছু ছিল অন্যের অগোচরে? একাকী কূলহীন পাথারে রাত্রিবাস। দিনশেষের আলো মুছে গেলে রাত্রিবাস তো একাকীই। স্বপ্নও দেখা যায় না তখন। ঘুমকে ঠেকাতে হয়। এসেছিল কি তখন কোনো অভিসারিণী? গ্রামের সীমানা পেরিয়ে, ফলন্ত ধানশীষের আড়ালে? অপরের অধিকার অগ্রাহ্য করে? সেই প্রিয় অপরাধের শাস্তিই তাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কেউ তেমন কিছু দেখেনি, শোনেনি, এমনকি যে মুনীষ কখনো কখনো রাত্রিবাসে তার সঙ্গে স্থান বদল করেছে, গভীর রাত্রিতেই, সেও কিছু শোনেনি কখনো। কেবল কর্মদাতার কাছে আসা দুজন অতিথির কথাই জানে।

প্রায় দ্বিপ্রহরে সরু আইল ধরে ধানক্ষেতের সীমায় দাঁড়ানো গ্রামের গাছপালার ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছিল দুজন মানুষ। সেচকলের সাময়িক সমস্যা নির্ণয়কালে কর্মরত কৃষকের চোখে তা পড়েছিল। ভিন্ন জনপদে যাওয়ার দূরত্ব হ্রাস করতে অনেকে মাঠ পার হয়, তারা জানে। সরকারি রাস্তা ধরে গেলে তিন মাইল, মেঠো পথে তার অর্ধেক– যাবেই-বা না কেন? ঐ রকম কেউ হবে মনে করে তারা কলের দিকে মন দিয়েছিল আবার। কিন্তু সেই দুই মানুষ তাদেরই জমির দাগ ধরে, কলঘর থেকে দূরে জমির অন্য সীমায় দাঁড়ারে তারা বিস্মিত হয়। চোখের ওপরে হাত তুলে দেখলে মনে হয় যেন চেনা। তাই মুনীষকে কল চালাতে বলে আইলে দাঁড়ানো স্পষ্টতই গ্রামীণ নয় এমন দুজনের দিকে এগিয়ে যায় কৃষক। হতে পারে তারা সরকারি কৃষি বিভাগের লোক, অথবা সেই এনজিওর মাঠকর্মী ভেবে মুনীষ তার কাজে মন দিয়েছিল।

অনেকক্ষণ কথাবার্তর শেষে কর্মদাতা কৃষক ফিরেছিল মুনীষের কাছে। তুই বাইত যা, কইবি দুইজন মেহমান লইয়া আমি আইতাছি। তুই একবারে খাইয়া আইস।

ক্ষেতি কাজের দিনমজুর একবার ভালো করে মেহমানদের চেহারা দেখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সূর্য তখনও মাথার উপরে নয়, অতিথির চোখ-মুখ স্পষ্ট নজরে আসে না। সে হাত ধুয়ে উল্টো দিকের আইল ধরে পশ্চিমের গ্রামে চলে যায়। পৌষ যখন দরজায় তখন দুজন অতিথি অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। এই ভাবে সে। হতে পারে ভিন্ন গ্রামের কুটুম্বই তারা। দীন আত্মীয়ের সৌভাগ্যে অংশীদার হতে এসেছে। খাতির যত্নের লোক নিঃসন্দেহে। না হলে এই শেষ কার্তিকের সম্বল ভাগ করবে কেন?

সূর্য মধ্যাহ্নরেখায় দাঁড়ায়, তারপর পশ্চিমের সিঁড়িতে পা রাখে যখন, গৃহস্থ তখনও অতিথিদের নিয়ে ঘরে আসে না। তার স্ত্রী অতিথি কারা না জেনেও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছিল। না, উঠোনে ঘুরে বেড়ানো মোরগটিকে কিংবা বাহির আঙিনায় শস্যকণার জন্য বৃথা ধুলোমটি খুঁজে বেড়ানো মুরগির কোনোটিকেই ডাকে না সে আতিথ্যের প্রয়োজনে। বিল থেকে পলো দিয়ে ধরা মাছ, ঘরের পেছনের সবজি। এই। তবুও সুসময়ের চিহ্ন নিঃসন্দেহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মানুষটি ভাবে হয়তো তার ফিরে যাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে কলঘরের মালিক। একজন কেউ নজর রাখুক সব সময়, এই চায় সে। বেলার তাপ কমে আসে দেখে গৃহিণীও অবশেষে মুনীষের প্রাপ্য আহার্য দিয়ে দেয়।

আহারশেষে সাত বাড়ির আঙিনা পার হয়ে সবুজ মাঠের কিনারায় পৌঁছায় যখন মুনীষ, তখন তার ছায়া সামনে চলে এসেছে। তাপহীন রোদ্দুর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা মানুষটিকে আরাম দেয়। সামনে ছড়ানো সবুজ-হলুদে মেশামিশি দেখে সে। দেখে দূরে তালগাছে আঁকা ভিন্ন গ্রামের সীমানা। অনেক দূর দিয়ে চলে যাওয়া ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার দু'পাশে খেজুর গাছের সারিও চোখে পড়ে তার। এইসব ভালো লাগার জন্য গলায় সম্ভবত কোনো সুরও উঠে থাকবে আর তখনই তারও মনে, এই ফসলশেষ মাঠের খড়কুটো এই মুনীষটির মনেও, জমি রেহান নেওয়ার কথা আসে। আসবেই-বা না কেন? সে নিজেও এখন সমিতির সদস্য। 'অতিদরিদ্রের কাছে যাও' এই কার্যক্রমের আওতায় সে-ও আর ছ'মাস পরেই ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে। হয়তো পাঁচ-দশ কাঠা সে পাবে না। হয়তো কলঘরও থাকবে না তার; কিন্তু তাতে কী? তিন কাঠা জমি তো হতে পারে। ভাগে করলেও অন্তত দু'ফসলি জমিতে পনেরো মণ ধান। ছ'মাসের দিন যাপন।

নানাদিক থেকে উল্টপাল্টে ভাবে সে। হতে পারে তার রেহানী জমিও হবে ঐ কলঘরের পাশেই। ঐ পাম্পই প্রয়োজনীয় সেচ যোগাবে তার জমিতেও। শুধু একটি কথাই সে ভাবে না। সাদা কাগজে সেও কি স্বাক্ষর করবে? ততদিনে সেও শিখবে নিজ হস্তে অক্ষরাঙ্কন। সে ভাবে না, কেননা তখনও সে কিছু জানত না।

সুখের পথটুকু আনমনে পার হয় সে। কিন্তু দূর থেকে কোনো মেহমান দেখে না দাঁড়িয়ে আছে কলঘরের পাশে। মাচা ও চালার মাঝের জায়গাটুকুতেও রাস্তার পোশাক পরা কাউকে দেখে না সে। এমনকি হতে পারে যে উল্টো দিকের পথ ধরে ঘুরে চলে গেছে তারা বাড়িতেই?

আরও কাছে এসে অবাক হয় সে। অতিথিদ্বয়ের চিহ্নও দেখা যায় না। তার গৃহস্থ এই অসময়ে শুয়ে আছে মাচায় বিছানো চাটাইয়ের উপর। ঘুমন্ত কি? ক্ষুধায়?

একটু দূরে থেকেই ডাক দেয় সে। তারপর কাছে এসে আবারও। আবার। আরও কাছে এসে দেখে। পা ধরে নাড়া দেয় আর অসময়ের হিম শরীর তাকে বিমূঢ় করে দেয়। গ্রাম্য ভূমিহীন দিনমজুর তখন সাতগ্রামের পরিচিত-অপরিচিত সকলকে চিৎকার করে 'এই দ্যাহো, দ্যাহো, খুন করছে, খুন করছে' বলে ডাকতে থাকে। খুনের চিন্তা তার মাথায় কেন এলো কে জানে। মৃতের শরীরে কি শরীরের পাশে কোনো রক্তচিহ্ন ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যখানে যখন সাতগ্রামের মানুষের ভিড় জমে তখনও আলো মুছে যায়নি বৃক্ষশীর্ষ থেকে। সবুজ-হলুদ ঢাকা পড়েছে কেবল প্রভাহীন বৈকালের ছায়ায়।

কর্তব্য স্থির করতে সময় লাগে সাতগ্রামের মাতব্বর কৃষকেরও। একবার চাটাইয়ে মুড়ে কাঁধে করে তাকে স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও হয়। কিন্তু তার স্খলিতবসনা কৃষাণী দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য মেঠো আইল বেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মৃতের শরীরে আছড়ে পড়ে।

ইউনিয়নের চেয়ারম্যানও দ্রুত খবর পেয়ে চলে আসে। শেষ সিদ্ধান্ত তারই। চাটাইয়ে মুড়ে দেহটিকে মৃতের নিজ আঙিনাতেই নিয়ে যাওয়া স্থির হয়। আর তখনই দেহটিকে তুলতে গিয়েই তার পিঠের নিচে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করা প্রায়– দলিলটি চেয়ারম্যানের চোখে পড়ে।

হাতে তুলে নিয়ে সে উল্টেপাল্টে দেখে কাগজখানা। তারপর হতবুদ্ধি নিজেই প্রশ্ন করে, এডা কী?

থানায় খবর পাঠায় চেয়ারম্যানই। রক্তপাতের কোনো চিহ্ন দেখে না সে। শরীরে আঘাতের কোনো দাগ নেই। কিন্তু অপরিচিত অতিথিদ্বয় ও সইকরা কাগজ তাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব শেখায় এবং দারোগার অনুমতি ছাড়া সৎকারের কোনো ব্যবস্থা করা সঙ্গত হবে না, সে ঠিক বোঝে। সারা গ্রামের সমব্যথী স্ত্রীকুল শোক প্রকাশে মৃতের পরিজনের সঙ্গে গলা মেলায়।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের এত্তেলা পেয়েই হোক বা ঘটনার বিবরণ শুনেই হোক, দারোগা ঝটিতি তার দল নিয়ে চলে আসে মোটর সাইকেলে চেপে। হাত পেতে কাগজটি নেয়। উল্টেপাল্টে সে-ও দেখে। তারপর ঐ প্রদোষেই সে চলে যায় মাঠ হয়ে কলঘরে। টর্চের আলোয় মাচান ও তার পাশের জমিতে পায়ের চিহ্ন খোঁজে। না, কিছু পাওয়া যায় না। কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন? না, কিছু না, না।

মুনীষটিকে নানাভাবে জিজ্ঞাসা করে দারোগা। কেমন লোক? কেমন পোশাক? চেহারা কেমন? লোক যে এসেছিল তার কোনো সাক্ষী আছে? মৃতের স্ত্রী রোরুদ্যমান জানায়, হ্যাঁ, মুনীষ তাকে বলেছিল, দুইজন অতিথি নিয়ে ঘরে আসবে কৃষক।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপ করে দারোগা। স্বাভাবিক মৃত্যু, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে– এই লিখলেই সব মিটে যায়। চেয়ারম্যান বলে। কিন্তু হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছিল আকস্মিকভাবে? কেন? কোন আনন্দে? কোন দুঃখে? কোন শোকের মুহূর্তে পড়ে যাবে সে মাটিতে? আর সেই লোক দুটি? তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কারা? কী জন্য এসেছিল তারা? কোন কাজে? খবর পেয়ে এনজিওটির থানা অফিস থেকে দুজন কর্মীও চলে এসেছিল। মোটর সাইকেলে চেপেই। না, এই সপ্তাহে এই গ্রামের সমিতি পরিদর্শন বা সদস্যের কর্মোদ্যাগে পর্যালোচনার কোনো সূচিই ছিল না তাদের। কেউ আসেনি এদিকে।

তখন তারা তিনজনে মিলে নানা পরামর্শ করে। আপাতদৃষ্টিতে দেহত্যাগ। কিন্তু ঐ রহস্যময় অতিথিদ্বয়, ঐ সই করা কাগজ? আবার আলোচনার শুরুতে ফিরে যায় তারা। মৃত্যুদূতের কথা অবশ্য বরাবরই বলে গ্রামবাসী।

অন্তত থানা হাসপাতালে নিয়ে একবার ডাক্তারের মত নেওয়া প্রয়োজন– এই স্থির হয় অবশেষে। পরিজন এবং প্রতিবেশীবর্গের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দারোগা শেষতক ঐ রাত্রেই মৃতদেহ থানা সদর হসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

লণ্ঠনের আলো হাতে কয়জন গ্রামবাসীর কাঁধে শুয়ে সে হাসপাতালে যেতে থাকে। আসন্ন ফসলের মাঠ পার হয়েই। শুধু যে দৃশ্য দেখবার জন্য জীবন বাজি রেখেছিল সে, তার কিছুই তখন দেখা যায় না। তার ঐ অতিশয়োক্তির কথাও কেউ মনে করে না। জানত না বলেই।

মোটর সাইকেলে করে দারোগা আগেই চলে যায়। তার হাতে সেই কাগজটি। থানার ডাক্তার যদি মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে না পারে তাহলে মৃতদেহটি জেলা সদর হাসপাতালে পাঠাতে হতে পারে।

কিন্তু ঐ কাগজটি? কাগজটি নিয়ে সে কী করবে? আছে কী এমন কোনো উপায় যা স্পষ্ট করবে অদৃশ্য কালিতে লেখা কোনো চুক্তির বয়ান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাদুকর জাদু জানে না

কোন পথে শহরে এসেছিল সে কেউ দেখেনি। চার রিকশায় চারটি কালো তোরঙ্গ নিয়ে রেলস্টেশন থেকে শহরে ঢোকার কথা কেউ কেউ বলেছিল। কিন্তু রিকশার গদিতে যে চারজন বসেছিল তার মধ্যে না-ছিল কোনো দিব্যসুন্দরী, না-ছিল রুপালি সাটিনের ঝলমলে পোশাক আর রক্তিম উত্তরীয়ে আলৌকিক জাদুকর। তাহলে কি সে দলের সঙ্গে আসেনি? কি নিজের রূপ ইচ্ছামতো পাল্টে ঢুকেছিল ঐসব তোরঙ্গের কোনো একটিতে?

রিকশা চারটি এসে প্রথমে ঢুকেছিল ডাকবাংলোর প্রবেশপথ দিয়ে। প্রাঙ্গণের মুখে কাঠের দরজা জীর্ণ বলে খোলাই থাকে সর্বদা, এজন্য কোনো বাধা পায়নি তারা। কিন্তু ভিতরে ঢুকে কোথায় রিকশা থামবে, কী কোথায় নামবে তোরঙ্গ চারটি– এ নিয়ে সমস্যা হয়। দারোয়ান মাকরু এরকম কোনো অতিথির কথাই জানত না এবং নিজেও কিছু না-বুঝে দিশেহারা হয়ে পড়ে বলা যায়। তখন চারজন বলে আমরা জাদুকরের দল। জাদুর খেলা দেখাতে এসেছি শহরের রঙ্গমঞ্চে। এ ডাকবাংলোয় আমাদের বাসস্থান হবে; অভ্যর্থনার জন্য আয়োজকদের এখানে আসার কথা। কিন্তু মাকরু কিছু জানে না। শেষে রিকশাওয়ালারা তোরঙ্গ চারটিকে লিচুগাছের তলায় নামিয়ে দিয়ে দ্বিগুণ ভাড়া নিয়ে চলে যায়– ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষা করার পরে। শহরের এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে অবশেষে উদ্যোক্তাদের খুঁজে পায় দলপতি কিন্তু ডাকবাংলোয় তাদের জায়গা মেলে না। আবার রিকশা করে সন্ধ্যার মুখে তারা বড়বাজারের পেছনে সারি সারি চৌকি পাতা গ্রান্ড আমজাদিয়া হোটেলে স্থান খুঁজে নেয়। অবশ্য দু'বার রিকশা ভাড়া দেওয়ার পরে দুটি চৌকির মাশুল অন্তত দু'রাতের জন্য আগাম মিটিয়ে দিতে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে দলটি। জাদুকরকে কেউ দেখেনি তখনও।

আলোয় উদ্ভাসিত মঞ্চে দিব্যকান্তি জাদুকর পায়রা উড়িয়ে দেয়। সকালের সম্মুখে মাথার কালো টুপিটিতে টুকরো কাগজ ভরে রুমাল দিয়ে ঢেকে দেয়। সেটি হাতে নিয়ে মঞ্চের এ-মাথা থেকে ও-মাথা যায়। আলোয় ঝলসাতে থাকে কালো সাটিনের আংরাখা। দগদগ্ করে জ্বলে লাল মাখমলের উত্তরীয়। পেছন-উল্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আঁড়চানো পাট পাট চুল চকচক করে। জাদুকর রুমালটি দ্রুত সরিয়ে নেয়। মুহূর্তে টুপির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে সফেদ পায়রা। ডানা ঝাপটায় সে, তারপর উড়ে যায় মঞ্চের বাঁদিকে। দর্শকদের করতালি শোনা যায়— পেছন দিক থেকে বেশি এবং ব্যালকনিতে শোনা যায় বিস্ময়ের নানা শব্দ। মহিলা এবং বালক-বালিকার জন্য নির্দিষ্ট বলেই।

লাল বনাতে ঢাকা বাক্সটি মঞ্চে আনা হয় এবং প্রায় একই সঙ্গে মঞ্চে এসে দাঁড়ায় দিব্যসুন্দরী। কোথায় ছিল সে? কোন দেশের মেয়ে? উদ্ভিন্নযৌবনা মঞ্চ আলো করে দাঁড়ায়। মঞ্চের ঠিক নিচে যারা বসা তাদের চোখে সৌন্দর্য ও যৌবনে কিছু রহস্য আছে বলে মনে হলেও পেছনের প্রেক্ষাগৃহ এবং উপরতলার মুগ্ধ দর্শকসমাজ যথারীতি মোহিত হয়।

বাক্সটি এনে একটি নিচু টেবিলের উপর বসানো হয়। টেবিলের নিচে দিয়ে অপর পাশ স্পষ্ট দেখা যায়। বাক্সটিকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হয় বাজনার তালে তালে। উপুড় করলে বোঝা যায় সেটি শূন্য। টেবিলের উপরে উঠে বাক্সে ঢুকে যায়। মঞ্চের বাঁদিক থেকে সহকারী এসে শাণিত তলোয়ার আনে কয়েকটি। এনে রেখে দেয় বাক্সের উপরে। বাক্সের মুখ ততক্ষণে বন্ধ। জাদুকর এগিয়ে একটি তলোয়ার তুলে নেয়। দর্শককে তার ধার দেখায়, কাঠিন্য দেখায়, তারপর ধীরে বাক্সটিকে বিদ্ধ করে। তলোয়ার প্রবিষ্ট হতে থাকে যতক্ষণ তার অগ্রভাগ বিপরীত দিকে ফুটে না বেরোয়। এমনি করে চারপাশ থেকে সব কয়টি তলোয়ার বাক্সে বিদ্ধ হয়। তলোয়ারের একদিক নাড়ালে দেখা যায় উল্টোদিকও নড়ে। তারপর লাল বনাত দিয়ে ঢেকে দেয় সেটিকে জাদুকর। দারুণ উত্তেজনা, ভয়, সংশয় তার মুখে ফুটে ওঠে। দর্শককে সেটি সংক্রমিত হয়। জাদুকর তখন ধীরে ধীরে তলোয়ার সব কয়টিকে বের করে আনে। আলো মৃদু হয়। দর্শকরা অধীর। হঠাৎ বাক্সটির চারপাশ খুলে যায়। সকলে দেখে উন্মুক্ত মঞ্চে খোলা বাক্সের মধ্যে বসে আছে উদ্ভিন্নযৌবনা। রক্ত, ঘাস, কি অস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন কেশ কি পোশাক— কিছু নয়। কোনো চিহ্ন নেই অস্ত্রাঘাতের। জাদুকর হাত ধরে টেবিল থেকে নামিয়ে আনে তাকে। মঞ্চের সামনে আসে না মোহিনী ঠিক কিন্তু ঐ মাঝমঞ্চ থেকেই ফুলের মাথা পেছনে হেলিয়ে দু'হাত তুলে লাস্য করে। বিনত হয়, তারপর পরদার আড়ালে চলে যায়। জাদুকর প্রশান্ত হাস্যে হস্তনির্দেশ করে তার গমনপথের দিকে। করতালি, শিস, নানা শব্দে প্রেক্ষাগৃহ আন্দোলিত হয়।

এই রকম। দু'ঘণ্টা ঘরে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে চলে ঐন্দ্রজালিক।

ঐ টেবিলটিকেই এবার কালো কাপড়ে ঢাকা হয়। শূন্য বাক্সটির চারপাশ জোড়া লাগানো হলে সেটাকে স্থির রাখা হয় টেবিলের উপরে। দিব্যসুন্দরী ধীরে এসে বাক্সটির মধ্যে প্রবেশ করে। বাক্সের মুখ বন্ধ করা হয়। লাল বনাতে ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় সেটিকে। জাদুকর তার জাদুদণ্ড বুলিয়ে নিলে লাল বনাত সরে যায়, আবার চারপাশ খুলে যায় বাক্সের। কোথায় দিব্যসুন্দরী? বসে আছে সে একটি শ্বেত পারাবত হয়ে। করতালির শব্দে পাখিটি উড়ে যায় বাঁদিকে। ডান দিক থেকে মঞ্চে এসে দাঁড়ায় দিব্যসুন্দরী।

সুবেশ কিশোর সহকারীটিও মঞ্চে আসে। মঞ্চের উপরে পাতা হয় একটি চাদর। তার উপরে শুয়ে পড়ে সে। তার মাথা ও পায়ের কাছে অর্ধবৃত্তাকারে দুটি নমনীয় বেতের কাঠি লাগানো হয়; তারপর কিশোরসহ সবকিছু ঢাকা পড়ে আর এক চাদরে। জাদুকর জাদুদণ্ড স্পর্শ করে চাদরে আর কিশোরসহ সব কিছু উপরে উঠতে থাকে। প্রথমে চাদর ঝুলতে থাকে চারপাশ আড়াল করে, তারপর অনেক শূন্যে উঠে গেলে দেখা যায় নিচে কিছু নেই। ধীরে বস্ত্রাচ্ছাদিত কিশোর নেমে আসে। জাদুকর কাঠি দুটো সরিয়ে নেয় বাজনার তালে তালে। আর একই সঙ্গে টান দেয় বস্ত্রাগ্রে। চাদর দুটি তার হাতে চলে আসে। নিচে কোথায় কিশোর? কেউ নেই। মঞ্চের বাঁদিক থেকে এসে দাঁড়ায় সে বিনম্র ভঙ্গিতে।

সব শেষের খেলাটিই সব কথা বলে। বাক্সটিকে আবার আনা হয়। এবারে রাখা হয় নিচু একটি টেবিলে। শূন্যবাক্স দেখিয়ে নিয়ে তার মধ্যে সফেদ পায়রাটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মুখ বন্ধ করে ঢেকে দেওয়া হয় কালো কাপড়ে। তারপর জাদুর কাঠি। কাপড় সরালে পর পর চারটি পায়রা বাক্স ছেড়ে উড়াল দেয়। জাদুকরের দলে চারজন তাই বুঝি। পায়রা চারটি জাদুকরের হাতে কাঁধে বসে। ঐন্দ্রজালিক তাদের সস্নেহে ধরে নিয়ে আবার বাক্সে ভরে দেয়। বাক্সের মুখ বন্ধ হয়। কালো কাপড় পড়ে। আবার সরে। বাক্সের চারপাশ খুলে দেওয়া হয়। কোথায় পারাবত চতুষ্টয়? বাক্সের মধ্যে দেখা যায় আছে আরও একটি কালো বাক্স। সেই বাক্স থেকে জাদুকর বের করে আরও একটি কালো বাক্স। তার মধ্যে আছে আরও একটি কালো বাক্স। একটির উপরে ছোটটি, সেটির উপরে আরও একটি বাক্স তুলে সাজায় সে। একটির উপরে একটি, বড়টির উপরে ছোটটি, সেটির উপরে আরও ছোটটি। প্রতিটি বাক্সর গায়ে লেখা সাদা একটি অক্ষর। যারা পড়তে জানে তারা লম্বালম্বি পড়ে Magic Myth Vinda– শেষ শব্দটি বুঝি জাদুকরের নাম।

চোখ-ধাঁধানো আলোয় পোশাকে জাদুকর তাঁর তিন সঙ্গীকে নিয়ে মঞ্চে আসতে হয়।

শহরে আরও একজন ঐন্দ্রজালিক ছিল। আদালত পাড়ায় বটপাকুড়ের নিচে, জেলা স্কুলের মাঠে, চাই কি বড়বাজারের চার রাস্তার মোড়েও সে তার ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে। কিন্তু সে জাদুকর নয়। সে মাদানি। একটি অপুষ্ট, শীর্ণ, প্রায়কিশোর তার সহকারী। সে কখনো ঢোল বাজায়, মাদানি নিজে বাজায় যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সেই বালক নানা শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে লোক জড়ো করে। যেমন শরীর একত্র করে বলের মতো গোল হয়ে যাওয়া, কি চাকার মতো হয়ে যাওয়া। কি পায়ে নয়, পা শূন্যে, হাতের উপরে চলা, ক্রামাগত ডিগবাজি খাওয়া। মাদানি তখন নানা কথা বলে, বালকটি প্রতি কথার প্রতিধ্বনি করে যেন, তারপর খেলা শুরু হয়। বল লুকানো, তাসের ভেলকি, সাত বলের লোফালুফি। এই সবের শেষে সে বালকটিকে শূন্যে ভাসায় ঐ কাপড় ঢাকা দিয়েই আর থাকে জিভকাটার খেলা। ধারালো অস্ত্রে সহকারীর জিহ্বাগ্র কেটে ফেলে সে। রক্ত ফোয়ারার মতো ছুটতে থাকে। দাপাতে থাকে যন্ত্রণায় বালকটি আর মাদানি তখন তার রুমালটি বিছিয়ে দেয়। রুমালের উপরে একটি পাত্র। মুখে বলে কাটা জিভ কেবল দর্শকরাই জোড়া দিতে পারে– ঐ পাত্রটি ভরে দিয়ে। ধাতব মুদ্রা পড়তে থাকে; ক্বচিৎ কাগজেরও। আর তখন মাদানি নিচু হয়ে রক্তাক্ত মুখ সামান্য ফাঁক করে জিহ্বাগ্র ঢুকিয়ে দেয়। কিশোর উঠে বসে বলে, 'তালিয়া'। হাততালি পড়তে থাকে।

সেদিন মাদানির খেলা বসেছিল ডাকবাংলোর পেছনের মাঠে। স্টেশনের রাস্তা থেকে ডাকবাংলোর পেছন দিয়েও ঢোকার পথ আছে। সেই পথে ঢুকলে প্রথমে এই মাঠটিই পেরোতে হয়। যাতায়াতের পথে মজা দেখার জন্য অনেকেই ডাকবাংলোর মাঠে ঢুকে পড়ে। আর তাই ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ বিক্রেতাও গণ্ডারের তেলের শিশি নিয়ে সেই মাঠের কোণে বসে যায় আদালত পাড়ায় ব্যবসা জমানোর আগে-পরে।

রঙ্গমঞ্চও মাঠটির কাছেই। প্রকৃতপক্ষে, ডাকবাংলোর তারের বেড়া পেরলেই এডওয়ার্ড পার্ক শুরু। পার্কের এদিকে আছে নানা ফলপাকুড়ের গাছ, পামগাছের শ্রেণি, পাবলিক লাইব্রেরি। লাইব্রেরির পেছনে পুকুর, পুকুরের পেছনে মাটির পাহাড়– ঐ পুকুর আর পাহাড়কে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রঙ্গমঞ্চ। ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়াঙ্গন।

পূর্বরাত্রির মোহজালই সম্ভবত শহরবাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল– এ কারণে ডাকবাংলোর মাঠে জনসমাগম যথেষ্ট নয়। এমনকি এই দ্বিপ্রহরেও। ঢোল বাজাতে থাকে মাদানি, মুখে নানা উত্তেজক শব্দাবলি, প্রায়কিশোর তার প্রতিধ্বনি করে। স্বেদস্রোত প্লাবিত করে উভয়কেই। তখন এক দর্শক বিরক্ত হয়ে বলে, "আর কত বাজাইবা, খেল্ শুরু কর। আর কেউ আইবো না। যে ম্যাজিক মান্ষে দ্যাখছে কাইল।"

মুহূর্তে মাদানি ঘুরে দাঁড়ায় ঐ দর্শকের দিকে। "কি কইলা" বলেই নিজের ভুল বুঝে নেয়, "কেয়া বোলা তুম!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শক হাসে। "জাদু! হেডা তোমার মাদানির খেল্ না। মানুষ উড়াইয়া দ্যায়, পক্ষী বানাইয়া ফেলে, তাউলার দিয়্যা মাইয়া কাটে।"

"হামভি কর সকতা! হ্যার থিক্যাও ভালো পারি।"

"লও, লও জানা আছে", দুর্বিনীত দর্শক বলে, "খেল্ শুরু কর।"

"তুম ভাগো হিয়াসে। তোমারে খেলা দেখামু না।"

ঝগড়ার গন্ধ পেয়ে আস্তে আস্তে লোকজন সরে পড়তে থাকে।

মাদানি তার চাদর আর ঝোলা তুলে নিয়ে আদালতপাড়ার দিকে চলে যায়।

এখন তার পরনে ছাইরঙের মলিন প্যান্ট, কালো বিবর্ণ শার্ট। পূর্বরাত্রির জামাটি নয় তবে এটিও একসময়ে মঞ্চে উঠেছিল নিঃসন্দেহে। রঙ্গমঞ্চের সামনে বসে আছে চারজন। মঞ্চটি মূলত সিনেমা হল— রাত্রিকালে। কখনো নাট্যমঞ্চ। সে কারণে মঞ্চসংলগ্ন অফিসে নানা কর্মকর্তার আসা-যাওয়া। কথা ছিল অনুষ্ঠানের পরদিন সকালেই জাদুকর তার পাওনা বুঝে নেবে। কিন্তু তখন দ্বিপ্রহর। অফিসের দরজা বন্ধ। জাদুকর নাট্যাঙ্গনের বারান্দায় সদলে একই স্বেদস্রোতে ভাসমান। দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাও আজ নেই তাদের।

দলপতি তবুও বসিয়ে রাখে সঙ্গীদের। কৃশকায়, মুখ চাঁছাছোলা যাত্রাদলের সখীটিকেও। তোরঙ্গ চারটি বাঁধা পড়ে আছে হোটেল মালিকের ঘরে। তিন দিনের টাকাই এখন পাওনা তাদের।

রৌদ্র তখনও প্রখর। শরীরের ছায়া পূর্বে লম্বমান হয় ক্রমে। ঐ সময়ে অফিসঘরের সামনে এসে রিকশাটি থামলে পরিচিত দুই মুখ দেখে দলটি হেসে উঠে দাঁড়ায়। গম্ভীর কর্মকর্তাদ্বয় অফিসঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। তারপর দলপতিকে ডেকে পাঠায়। পকেট থেকে বের করা দশ-বিশ টাকার গোছা খুব ভারী নয়। দলপতির হাতে সেটি তুলে দিলে গণনা শেষে কেবল বিস্মিতই নয়, হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে সে। জাদুর কাঠিটি তখন তোরঙ্গের মধ্যে এ কারণেই বুঝি শক্তিহীন। না ওড়ে, না ওড়ায়।

কর্মকর্তা বোঝায় তাকে— টিকিট বিক্রি মোটেই আশানুরূপ ছিল না। এ কারণে যত দেওয়া যাবে ভাবা গিয়েছিল দেওয়া যাচ্ছে না।— কোনোমতে কথা বলে মলিন হৃতশক্তি জাদুকর, হোটেলের টাকা মিটিয়ে দূর শহরের বায়না রক্ষা করতে যাওয়ার ভাড়াও হবে না। এমনকি তিনদিনের আগে সেখানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই তাদের। এই তিনদিনের খাওয়া-থাকাই বা জুটবে কী করে! কর্মকর্তার মুখ ভাবলেশহীন। ঝলমলে সাটিনের আংরাখাটি সামনে এনে নানা স্থানে সেলাই দেখাবে কিনা ভাবে জাদুকর, রক্তিম উত্তরীয় বহু ব্যবহারে মলিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সেটিও দেখাতে পারে অবশ্য ইন্দ্রজাল সংবরণ করেই। কিন্তু সে-সব কিছু করে না ঐন্দ্রজালিক। সে শরীর সামনের দিকে হেলায় তারপর হাত দুটি সম্মুখে বাড়িয়ে কর্মকর্তার করতল স্পর্শ করে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে বুঝি-বা।

বটগাছের নিচে তখন অনেক ছায়া। জজকোর্টের উঁচু দালানও কিছু ছায়া যোগ করে সেখানে। মক্কেলের দাবি মিটিয়ে উকিল-মোক্তার যার যার বিশ্রামস্থলের দিকে যাচ্ছে বার লাইব্রেরির চারপাশে। আপাত দুশ্চিন্তামুক্ত মক্কেলকুল বসে বটগাছের নিচে পাতা চাদরটি এবং তার উপরে রাখা নানা সরঞ্জাম ঘিরে দাঁড়ায়। পরম উৎসাহে ঢোল বাজে। "কাঁহা সে আয়া ইয়ে জাদুগর?" ঢোলের বাজনা ছাপিয়ে কণ্ঠ তার।

"দিল্লিসে" বলে কিশোর।

"কাঁহা সে আয়া ইয়ে খেল্ওয়ালা?"

"মুম্বাইসে" উত্তর এবারে।

"কাঁহা সে আয়া ইয়ে মশহুর ওস্তাদ?"

"পেশোয়ারসে।"

'খেল, দেখাঁউ?"

"দেখা দো, দেখাও।"

"তু দেখা পহ্লে।" বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতের শরীর ওল্টায় পাল্টায় প্রায়কিশোর আর তক্ষুনি মাদানির চোখে পড়ে দ্বিপ্রহরের সেই দর্শক দাঁড়ানো ভিড়ের সামনেই। মামলার কাজ কি ছিল তারও এই আদালতেই।

এক মুহূর্ত চোখে চোখ পড়ে। ঢোলের শব্দ আরও জোর হয়। "আরে খেলা দ্যাখাও" দর্শক বলে। "এইসা খেল্ দেখাউংগা আজ ইঁহা যো আভি তক্ কোই নেহি দেখানে সাকা" বলে লাল চোখে বৃত্তের মাঝখানে ঘুরে দেখে।

"আরে উর্দু বাত রাখো, খেলা দেখাও", আর এক দর্শকের শ্লেষ মাটিতে দাঁড়াতেও যেন দেয় না তাকে।

সব সেরা খেলার আয়োজন আজ তার। বালকের কসরৎ দেখানো শেষ হলে ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ানো ন'ফুট বাঁশটি হাতে নেয় সে। কোমরে বেল্টের মতো কিছু একটা জড়ানো সেই বেল্টের সাথে আটকানো খুব মোটা কাপড়ের একটি কৌটার মতো। বাঁশটির গোড়া সেই কৌটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাঁশটিকে হাতে ধরে স্থির করে, তারপর শীর্ণ অপুষ্ট প্রায়কিশোরের হাত ধরে নিজের কাঁধে তারপর বাঁশের গায়ে তুলে দেয়। মুহূর্তে বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে বালকটি। তারপর বাঁশের ডগা পেটের নিচে রেখে হাত-পা ছড়িয়ে দেয়। বাঁশটিকে সোজা করে দু'হাতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেড়ে দেয় বাজিকর। বালকটি বাঁশের ডগায় ঘুরতে থাকে, হাততালি পড়ে যারা দেখেনি কোনোদিন তাদের হাত থেকেই বেশি।

বাঁশ বেয়ে কসরতি বালক পুরুষের কাঁধে নামে। বাঁশটি ধরে থাকে দু'হাতে মাদানি। তারপর ছুঁড়ে ফেলে পাশে– ফিরতিপথে কাঁধে বইবে বলে।

মাটিতে নেমে পাত্রটি হাতে নেয় বাঁশের খেলোয়াড়, তারপর বিনম্র ভঙ্গিতে বৃত্তের অন্তরে ঘুরে আসে। ধাতব শব্দ হয় কিছু। যদিও আনন্দে মুখ ভাসে না দুজনের।

ঘাসের উপর বিছানো হয় চাদরটি। সঙ্গীকে তাতে শোয়ায় মাদানি। আর এক চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর অর্ধবৃত্তাকার বেত কি বাঁশের বাঁকানো কাঠি কাপড়ের নিচে মাথা ও পায়ের দিকে গুঁজে দেয়। সম্পূর্ণ জিনিসটিকে একটি কাপড়ে ঢাকা কফিনের মতো দেখাতে থাকে।

" দেখ্ দেখ্ মাদানিকা খেল্।" চিৎকার করে। "তুমকো ভেজ দুংগা?"

" ভেজো", চাদরেরর মধ্যে থেকে আওয়াজ।

"কাঁহা?"

"আসমান পে।"

"চলো উঁহাই তব।" বলে সম্পূর্ণ কফিনের এ-মাথা ও-মাথায় জাদুদণ্ড বোলায়। "আব্ চলো" বলার সঙ্গে সঙ্গে কফিনটি সামান্য নড়ে ওঠে। "আওর জরা" বলার সঙ্গে আরও একটু ওঠে। কফিনের চারপাশে কাপড় ছড়ানো যদিও তবু দেখা যায় কফিনটি মাটি ছেড়ে উপরে উঠে আসে। চারপাশে পড়ে থাকা চাদরের অংশও সোজা হয়ে মাটি স্পর্শ করে। "আওর জরা" বলে আর একটু উঠানোর চেষ্টা করে। শূন্যাভিলাষী কিন্তু আর ওঠে না, মাটিতে পড়ে যায়। কিছু শব্দও হয় এবং কাপড় তুলে নিলে কফিনটি চলে যায় আর শূন্যে ভ্রমণকারী উঠে বসে কোমরের পেছনে হাত বোলাতে থাকে। পতনটি ঠিক ইচ্ছানুগ হয়নি এ কারণেই হয়তো।

"তালিয়া, তালিয়া" বলে জাদুকর। ঢোল বাজে। পাত্রটি ঘুরে আসে আর একবার নতুন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে হয়তো বৃত্তের বাইরে, এই আশায়।

ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। আজকের মতন এটাই শেষ প্রদর্শনী বুঝে তার সবসেরা খেলাটির জন্য সকলকে প্রস্তুত করে সে। অস্‌লী চাক্কু আর লোহুর খেলা। জিভ কেটে জোড়া দেওয়ার খেলা। সব জাদুকর এই খেলা পারে না। ঝকমকে আলোয় স্প্রিং লাগানো তলোয়ার নয় এটি। যদি ঠিকমতো কাটা না হয় তাহলে এই জিভ আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না। ঐ মাসুম বাচ্চা জিন্দেগির জন্য গুংগা বনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

যাবে। বৃত্তের অন্দরে ঘুরে ঘুরে বলে সে। ব্যাখ্যা করে। মাঝখানে চাদরের উপর শুয়ে আছে মাসুম বাচ্চা। ঢোলা হাফ-প্যান্ট, গায়ের মলিন হাফশার্টটি অবশ্য সে যে মাসুম সেটি সমর্থন করে।

"তালিয়া বাজানা মৎ," বলে জাদুসম্রাট। একটুও যেন শব্দ না হয়। হাসি কি কান্না কি ভয়ের শব্দ কিছু না। কথা শেষ করে গলা থেকে ঢোল নামায়। সরঞ্জাম খুঁজে চাক্কুটিকে বের করে আনে। ধার দেখায়। কাগজের একটি টুকরা তুলে ধরে চাকু দিয়ে টুকরো করে।

মাসুম বাচ্চা স্থির হয়ে শুয়ে আছে। ছুরি হাতে সে কাছে আসে। হাঁটু গেড়ে শরীরটির কাছে বসে। হাত তুলে করুণা ভিক্ষা করে অদৃশ্য শক্তির। বালক মুখ খোলে। মুখগহ্বরে বাঁ হাত দিয়ে চাকু এগিয়ে আনে ডান হাতে। ঝটিতি জিহ্বাগ্র কেটে হাতে তুলতে চায়, পারে না– একটু বাধা এবং সঙ্গে সঙ্গে মাসুম বাচ্চা তীক্ষ্ণ শব্দে যন্ত্রণা জানায়। মুহূর্তের জন্য জাদুকরের মুখের ভাব কেমন হয় কিন্তু এই রকমই হওয়ার কথা ভেবে জাদুকর জিহ্বাগ্র কেটে হাতে আনে। সেই রক্তে ভেজা জিহ্বাগ্র আঙুলে টিপে ধরে বৃত্তের সকলকে দেখাতে থাকে। নিজেও বারবার দেখে। প্রবল আর্তনাদে প্রায় কিশোর একবার উঠে বসার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাকে "সো যাও, উঠো মৎ" বলতে বাধ্য হয় জাদুকর। তখন সে শুধু শুয়ে পা দাপায়, ঠোঁট ভিজিয়ে দু'পাশ থেকে রক্তিম প্রস্রবণ নামে। দর্শককুল বিমোহিত, স্তম্ভিত। শুধু এক অবিশ্বাসী তার সঙ্গীকে বলে ওর হাতে এটা ছাগলের জিহ্বা। মুখের মধ্যে রাইখ্যা দেয়। সঙ্গী সাড়া দেয় না।

সকলকে দেখানো শেষে ফিরে যায় সে বৃত্তের মধ্যখানে। রুমাল পেতে পাত্রটি রাখে, এবং বলে ঐ মাসুম বাচ্চার জিভ জোড়া লাগানো এখন দর্শকের হাতে। তারা যদি ঐ পাত্রটিকে ভরে দেয় তাহলেই বাঁচবে ঐ শীর্ণ জাদুই বাচ্চা। মুদ্রা পড়ে, কাগজও, অনেকে মাসুমের ঠোঁট ফাঁক করে জিহ্বাগ্র ঢোকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুখ খোলে না সে। প্রচণ্ড গোঙানির সঙ্গে পা দাপায়, মাথা নাড়ায় এ-পাশে, ও-পাশে, রক্তের স্রোত যেন প্রবাহিত হয়। জোর করে মাদানি বালককিশোরের মুখ খোলার চেষ্টা করে। হতে পারে সে তার আত্মজও। এ-কারণেই কি উত্তেজিত সে? বালক মুখ সামান্য খুললে রক্তস্রোত যেন ফোয়ারার মতো শূন্যে উঠতে থাকে।

ঐন্দ্রজালিক তার দল নিয়ে ফিরে চলেছে স্টেশনের দিকে। এবারে দুটি রিকশাতেই তোলা হয়েছে চারটি তোরঙ্গ। রিকশাওয়ালা দুটির সঙ্গে হেঁটে হেঁটেই চলেছে চারজন। পদক্ষেপ সামান্য অসমান হয়তো। ক্ষুধাতুর সকলেরই অমন হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলপরী নাচে

পরী তাকে উড়িয়ে নিয়ে এসে মাদারটেকের বিলে, ছোট ছোট কালো ঢেউয়ের পাশে বসিয়ে দিয়েছিল। ঐ সময় জ্যোৎস্না ছিল না, আকাশের ম্লান আলো যেমন শিমুল কি মাদার কি জারুল স্পষ্ট করেনি, তেমনি ছোট ঢেউয়ের ডগায় ছলকে ওঠা সহস্র শ্বেতকণিকাও বসিয়ে দেয়নি।

সে নিজে কি সবকিছু দেখেছিল? কিছু শুনেছিল? বাতাস কি তার কানে বিলের কিনারায় পুঁতে রাখা খরার বাঁশে শব্দ তুলে তাকে চমকে দিয়েছিল? অথবা পরী তার অলৌকিক কোমল স্পর্শে তাকে শিহরিত করে কানে প্রায় অশ্রুত পুলকবাণী শুনিয়েছিল? না, সে রকম কিছু নয়। কিছু শোনেনি সে। পরী তাকে কী বলেছিল, কোন ভাষায় কথা বলেছিল, সামান্য অক্ষরজ্ঞানী পদ্যপড়া গ্রাম্য যুবক কী বুঝবে তার? থাকুক না সোনাভান বিবি কি লাইলী-মজনুর পুঁথির অনেকটাই তার স্মৃতিতে। শ্রীকান্ত সে নয়। ঘোর অমাবস্যার রাতে মহাশ্মশানে হঠাৎ ঝড় তাকে মড়ার মাথায় দীর্ঘশ্বাস শোনায়নি, অথবা তার পিছনে দাঁড়িয়ে ডান কানে অবিশ্রান্ত তুষার-শীতল নিঃশ্বাস ফেলেনি। শকুনশিশুর রাত্রিকালীন শব্দ মানবশিশুর গোঙানো কান্না বলে ভুল করেনি সে। ওসব কিছুই সে জানে না। শোনেনি।

সে কেবল জানে ঐ নিশীথ আকাশের নিচে সে চরাচরে একা। দিকচিহ্নহীন, মাটি-আকাশ-বৃক্ষশূন্য প্রান্তরের শেষে জলসীমায় সে একা। পরী ছাড়া কে তাকে ওখানে নিয়ে আসবে উড়িয়ে?

নিজেকে যখন ফিরে পায় তখন সে মুহূর্তে উন্মাদ। দমবন্ধ করা ভয়, জীবনশূন্যতার আশঙ্কা তাকে ক্রমাগত কাঁপাতে থাকে। সে মুখে কেবল অব্যক্ত শব্দ ছাড়া আর কিছু আনতে পারে না এবং দীর্ঘকাল এক স্থানে ভূতগ্রস্ত প্রস্তরতুল্য দাঁড়িয়ে থাকার পরে পায়ে অকস্মাৎ শক্তি ফিরে পায় এবং ছুটে গ্রামের পথে চলতে গিয়ে দু'একবার হোঁচট খেলেও ঠিক নিজ ঘরের দরজায় পৌঁছে যায়। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকবার পরেই ক্রমে তার মা, ভগ্নী, ছোট ভাই, বিধবা মাসি সকলে বিছানা ছেড়ে ওঠে। কোলাহল করে। তার সিক্ত, ভীত, ভূতগ্রস্ত, নিশিতে পাওয়া শরীরকে শুইয়ে দিয়ে নিজেরা চারপাশ ঘিরে বসে। শেষ মুহূর্তে বিলের কোণটুকু দ্রুত পেরতে গিয়ে সম্ভবত সে জলকাদায় মাখামাখি। ঘনিষ্ঠ পরিজনের কলরবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ক্রমে অন্যান্য ঘর থেকে মামা-মামি কি আর আত্মীয়-স্বজন উঠে আসে। দরজা থেকে উঠান পর্যন্ত তখন আত্মীয়-স্বজনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তারা সকলেই জানতে চায়– কোথায় ছিল সে? কে নিয়েছিল তাকে? কোথায়? কেমন করে?

এই সময় তার মুখচ্ছায়ায় ত্রাস ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষ ভাব ছিল না। কিন্তু কেউ কেউ বলে ঐ সময় তার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির ঝিলিক মুহূর্তের জন্য হলেও এসেছিল।

রাতের অবশিষ্ট সময় সকলে বসে থাকে তাকে ঘিরে। হাতে হাত লাগিয়ে। এই বুঝি পরী তাকে আবার উড়িয়ে নিয়ে যায়। ভোরের আলো স্পষ্ট হওয়ার আগে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। অন্যরাও যে যেখানে ছিল সেখানে বসেই চোখ বন্ধ করে।

ভিন্ন গ্রামের মানুষও তাকে সকালবেলায় দেখতে আসে। পরী উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পরেও সে ঘরে ফিরে এসেছে এ সংবাদ চারপাশে ছড়িয়ে যায়। সকলে সাগ্রহে তাকে একবার দেখতে চায়– কোথাও কোনো দাগ, চিহ্ন কি পরী রেখে যায়নি?

কিন্তু তার অবয়ব তেমনি আছে। সামান্য রাত্রিজাগরণে অক্ষিকোটর কৃষ্ণাভ। দু'দিনের না-কামানো দাড়ি গালো মুখে। এই। কিন্তু কিছু তার মনে পড়ে না, কিছু শোনেনি, কিছু দেখেনি– এ কেমন পরীর মানুষ? বহু প্রশ্নের জবাবে বিরক্ত সে আবার ঘরের ভিতরে চলে যায়।

তখন নানারকম কথা ওঠে। পরী তাকে আদৌ নিয়েছিল কি-না সন্দেহ হয়। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল এ কথাও সকলে বিশ্বাস করে না। মাঝরাতে গেঁয়ো কুকুর পিছনে ছুটলে মাদারটেকের বিল তো কোন ছার, চলনবিলও সাঁতরে পেরবে অনেকে। গ্রাম্য স্বৈরিণীর ঘর থেকে আলগোছে বেরনোর পরে কেউ যদি দেখে ফেলে এই ভয়ে দৌড়ে পালাতে গেলে অন্ধকারে দিক্‌ভ্রম হতেই পারে এবং মাদারটেকের বিলের ধারে পৌঁছানো অমন অবস্থায় আদৌ অসম্ভব নয়। তাছাড়া মধ্যরাতে ঘরে ফেরার আর কোনো যুক্তি খুঁজে পাবে ঐ নাগর? পরী না উড়িয়ে নিলে?

কিন্তু একজন কিছু বলে না। গ্রামের শেষপ্রান্তের কুটিরে অশক্ত, বৃদ্ধ স্বামী ও তিনটি সন্তানের মুখে শাকান্ন যোগায় যে অকালবৃদ্ধ। তার অনেক কথা মনে পড়ে। পরী তাকে নেবে না, নেবে জিন, সে-ও তার কাছে আসেনি। খবর পাঠিয়েছিল শুধু। মধ্যরাতের মাদারটেকের বিলে সে-ও ছুটে গিয়েছিল তাই। সে-ই বুঝি কিছু জানে। ভেজা কাপড়ে সন্তান তিনটির পাশে একাই শুয়েছিল সে, এই কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তফাত। ভূমিহীন কৃষক, কর্মহীন ক্ষেতমজুর শহরে অন্নের সন্ধানে চলে গেলে দীর্ঘকাল ফেরাপথের চিহ্ন তার সামনে থেকে মুছে যায়। তিনটি সন্তানের মুখে কৃষাণী কী তুলে দেবে তখন? বিলের কোমর জলে, খরার পাশে ঘাই তুলে বেড়ায় বোয়াল, কাদামাটির সঙ্গে মিশে থাকে শোল কি সর্পভ্রমে তুলে আনা যায় হাঁটুজল গর্ত থেকে দেড়হাতি বাইন– এই সবই নিশিরাতে ডাকে ঐ কৃষাণীকে। দিনের আলোয় তো নয়ই, প্রত্যুষেও ছায়াহীন ক্ষেতের মাটি পার হয়ে বিলের দিকে যাওয়া যায় না। তাই রাতই আশ্রয়। নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে মিশে বিলের ধারে যায় সে, খরার বাঁধের পাশে। শক্ত হাতে পলো ডোবায়। পলোর গোল মুখে সমস্ত শরীর ডুবিয়ে তুলে আনে যা পায়। ছিন্ন শাড়িটি পড়ে থাকে তীরে। দিনের আলোয় সে সব দেখা যায় না। ভিন্নগ্রামের বাজারে ঐ নিশীথ ফসল তাকে জীবন দেয়।

রাতের ডাক শোনে সে। অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সে বোঝে না রাত্রির কোন প্রহর তখন। কিন্তু বিলের জলে ঘাই মারে বোয়াল– তার চোখে ভাসে। ঘুমন্ত শিশুটিকে বুক থেকে নামিয়ে, বালিকা কন্যা, কিশোর পুত্রটিকে দেখে কি দেখে না, খরার পাশে আটকা পড়ে আছে মৃগেল, সে ঘরের ঝাঁপ খুলে অন্ধকারে মিশে যায়।

সে-ও কিছু দেখে না। জারুল না, শিমুল না, মাদার না। বেনোঘাসের গোছা তার চোখেও পড়ে না, মড়ার খুলি তার পায়ে লাগে না, কেউ তার ডানকানে হিমশীতল নিঃশ্বাস ফেলে না। বিলের টলটলে হিম জলে অন্ধকারের ছোট ছোট ঢেউ। এখানে ঘাই তুলে সরে যায় বোয়াল, সে সেখানে পলো ডোবায়, না কিছু নেই। ঐখানে আলোড়ন– কী আছে ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কোমর জলে, না, কিছু না। দু'হাত দূরে ঐ কি রাতের শিকার? না, কিছু না। অকস্মাৎ বোধ ফিরে পায় সে। এ কেমন রাত? এ কেমন বিল? এ কেমন জীবিকা? ঘরে ঘুমন্ত তিনটি প্রাণের কী হবে যদি সে না ফেরে আর? ত্রাসে দ্রুত জল ছেড়ে ওঠে সে। খুলে রাখা শাড়ি হাতে নেয়। শস্য চাষ করা মাঠের মাটি মাড়িয়ে ঘরে ঢুকে ভেজা সায়াতেই শিশুটিকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। সমস্ত শরীর কাঁপে তখন। ক্রমে বোঝে রাত শেষ হওয়ার তখনও অনেক বাকি।

অন্ধকারের নেশা কি সে জানে। লোকসমাজে তাই কিছু বলে না।

সারাদিন পথেপ্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় যুবক। কৃষিকর্মে মন নেই। ঐ সামান্য বিদ্যালাভ তাকে কোনো পেশায় নিয়ে যাবে না। ব্যবসায়ের উদ্যমে ভাঁটা পড়েছে মজুদ ধানের দর পড়ে যাওয়ায়। কর্মহীন পুরুষের তাহলে আর কী থাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'পরী তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল' এই পরিচয় বিস্ময়, সন্দেহ, উপহাস, কিঞ্চিৎ সমীহও তার কাছে নিয়ে আসে। উপহাসই তার অসহ্য। বড় সড়কের পাশে গ্রামের মুদি দোকানের সামনে বসা অথবা সেলিম রেস্টুরেন্টে চা-খোর সমবয়েসীরা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে—"পরী তর কাপড় খুলছিল না তুই হ্যার কাপড় খুলছস? কেমন দ্যাখতে রে", এমন বলে গ্রামের পরিচিত স্বৈরিণীর দেহসৌষ্ঠবের প্রতি ইঙ্গিত করে। লালমুখে ঘরে ফেরে সে।

রাতে তাকে মাঝখানে রেখে চারপাশে বেড়ার মতো শুয়ে থাকে পরিজনরা। প্রত্যেকেরই অঙ্গে অঙ্গ লাগানো। এই বিশ্বাস থেকে যে কায়াহীন কেউ শরীরী অস্তিত্ব পার হয়ে যেতে পারে না। পরী যদি আবার তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে আর ফিরে নাও আসতে পারে সে। ঘিরে শুয়ে সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করে আবার। "কিছু দ্যাখছো না, কিছু হুনছ না।" সকলের মুখে তীব্র আগ্রহ। সে সবকয়টি মুখের দিকে তাকায়। নিজেকে দেখে সব আবেগের কেন্দ্রে। কিছু ভাবে, বলে, "দেখছি।"

পরম বিস্ময়ে উঠে বসে সকলে, "কী দ্যাখছো"।

সে বলে, "পরী। তয় একটা না, সাতটা।"

"কি কও।" সাতটা! কেমন দ্যাখতে, চোখে দ্যাহা যায়নি? রোশনিতে ধান্দা লাগে না?"

শত প্রশ্নের জনাব না দিয়ে পরীর বর্ণনা দেয় সে। পরীর রূপ বর্ণনার ক্ষমতা তার নেই। ঐ ভাষা কারও থাকে না। পরী কি বাতাস না নূরের তৈরি তাও সে জানে না। পরী যেখানে দাঁড়ায় সেখানেই শুধু আলো, আর সব অন্ধকার। আর সাতটি আলোর বৃত্তে সে দেখে সাতটি পরী নেচে চলেছে। বাজনা ছিল কি? মনে পড়ে না। বিবশ বিস্ময়ে সে কতকাল ঐ নাচ দেখেছে জানে না। জ্ঞানহীন প্রায় সে। অবশেষে একটি আলোর বৃত্ত দেখে তার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। সে দেখে পরীর হাতে একটি সোনার মূর্তি। তার দিকে বাড়িয়ে দেয় পরী কিন্তু অবশ তার হাত ওঠে না। বারবার চেষ্টা করে, কিন্তু হাত ওঠে না। মাদার গাছের নিচে নিমীলিত নয়ন সে তখন। চোখ খুলে দেখে কেউ কোথাও নেই। বিলের কিনারায় শুয়ে আছে সে। অন্ধকার। একা। ঝটিতি উঠে বাড়ির পথে দৌড়ায় সে।

হতাশা, বিস্ময়, অবিশ্বাস, বিশ্বাস সব মিশিয়ে প্রিয় পরিজন আর্তনাদ করে, "সোনার মূর্তি দিল তোমারে, নিলা না।"

বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে, "ঐসব হাছানি? রোশনিতে তৈয়ার। মানুষে হেইডা ছুঁইব ক্যামতে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু হাত বাড়ালেই কিছু তো হাতে দিত পরী— একথাও কেউ ভোলে না। হয়তো সোনার মূর্তিই। জিন-পরী কি না পারে?

মাটে ঘাটে বেড়ায় না সে আর। ক্বচিৎ বাইরে গেলে সেই পরিহাস, "সোনার মূর্তিডা কোয়ানে?" সোনার মূর্তি না পাওয়ার আফসোস পরিবার-পরিজনের থাকলেও তারা ক্রমে লক্ষ করে সে কেবল হীনবল, উৎসাহহীনই নয়, কৃশকায়ও। মাঝে মাঝেই শোনা যায়, রাতের ডাকে মাঠে গেলে, এমনকি সন্ধ্যাবেলায়ও ঢিল ছুটে আসে তার দিকে। আর কারও দিকে নয় তারই দিকে। শোনা যায় ঢিল ছুটে আসার পর মিশ্রিত কণ্ঠে হাসি। উদ্বিগ্ন পরিবারের ডাকে তিন গ্রাম পার হয়ে ওঝা আসে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে সে নিশ্চিত রোগ নির্ণয় করে। নিজের অজান্তেই পরীর সঙ্গে রোগীর সম্মিলন ঘটে প্রতিরাতেই। কেউ জানে না। কেউ দেখে না। মহাশক্তিশালী তাবিজ একটি ওঝা দেবে ঠিকই তাতে পরীও দূরে যাবে। তবে স্বাস্থ্যক্ষয় রোধ করার জন্য বিবাহ অতি জরুরি। অতি শীঘ্রই। পরী যেন দূরে থাকে তার আরও ব্যবস্থা করে সে। মা-র মুখের কুলকুচির জল ঘটে ভরে ঘরের চার কোণে পুঁতে দেয়। পরী তাতে আরও রেগে যায়— ঢিল পড়ে আরও বেশি। সঙ্গে মিশ্রিত হাসি। বিবাহ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

ঘরের বারান্দায় বসে আছে সে। ভগ্নস্বাস্থ্য, কৃশকায়— যেন বিগতযৌবন যুবক। বাড়ির উঠানে, ঘরের চালে সর্বত্রই হীন দিনযাপনের চিহ্ন স্পষ্ট। উঠানে কর্মরত যে মলিনবসনা যুবতী সে মাতা এবং সন্তানসম্ভবা। এই মুহূর্তে সে ক্রুদ্ধ। ক্রন্দনরত শিশুটিকে কোনোমতে থামাতে পারে না। হাতের কাজ ফেলে তাকে সে তুলেও নিতে পারে না। নগ্ন শিশুর চিৎকারে তার পিতা কেবল বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

"ক্যারায় কইছিল বিয়া করবার? ভাত দ্যাওনের খ্যামতা নাই", ফুঁসে বলে নারী, "পরীয়ে তারে সোনার পুতুল্যা দিব, হেইডা বেইচ্যা ঘর তুলব—।"

অন্য ঘর থেকে বৃদ্ধা মা বৌ-কে তারস্বরে বকাবকি করতে থাকে, "আবার যদি ঐ কথা কস।"

"কমুনা কিয়ের লাই? সোনার মূর্তি দিছিল পরীয়ে, নেয় নাই। হাত উঠছিল না। গপ-এর বাদশা। যাও অহন সোনার মূর্তি লইয়া আহো। এহনও তো পরী তোমারে ছাড়ে নাই, অহনো রাইতে আহে। রাগ কইর‍্যা নাকি আবার লইয়া যাইবো কয়।"

কৃশকায় শরীরেও ক্রোধের সঞ্চার হয়। মুষ্টিবদ্ধ হয় হাত। বিদ্যুৎগতিতে উঠে চুলের মুঠি ধরতে চায়, কিন্তু না, সে অসমান পায়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

এখন সেই রাত। ঘোর অমাবস্যার নয়। কিন্তু তেমনি অস্পষ্ট অন্ধকারের। ঘষা কাচের আকাশ। উপরে তাকালে তারা দেখা যায় না। সদ্যকর্ষিত ক্ষেতের আইল ধরে যেতে থাকলে দূরের গাছপালাই বুঝি মাঠের সীমানা বোঝায়।

এই সবই সে দেখে এখন। দেখে মেঘলা আকাশ। দেখে, দূরে কৃষ্ণস্তূপ গ্রামের আভাস কি গাছপালা। বর্ষার সতেজ নলখাগড়ার ঝোপ বিলের কোণা পেরনোর সময় বাহুতে দাগ কেটে দেয়। সে কিছু খেয়াল করে না। শিমুলশীর্ষে নরশিশুর মতো স্বরে কাঁদে না কেউ। কেবল বাতাসে পাতার সর্ সর্ শব্দ। হঠাৎ কোনো নিশাচর পাখি এক ডাল থেকে আর এক ডালে স্থান বদল করলে বৃক্ষটি আন্দোলিত হয়। কলমিলতা সে চোখে দেখে না, দেখে বিলের প্রায় স্থির জলরাশির কিনারা লতাপাতায় ঢাকা। সে স্থির জানে, এখন খরা চলে না, বিলের বুক অতল। মাদার গাছের নিচে এসে দাঁড়ায় সে। দু'পা এগিয়ে বিলের কিনারায় আসে। দূর পাড়ে একটি-দুটি আলোর কণিকা দেখা দেয় ক্বচিৎ। বাতাস হিমশীতল নয়। সজল, এই বোঝা যায়।

সে জলের ধারে এসে দাঁড়ায়। আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এলে প্রকৃতি আরও অস্পষ্ট হয়। বৃক্ষ, লতা, পাখি, নিশাচর জীব সব আলাদা করে আর বোঝা যায় না। হঠাৎ বাতাসের দমকা আসে। তাতে বিলের বুক আবার আন্দোলিত হয়। ছোট ঢেউয়ের মৃদু শব্দও শোনা যায়। কলমিলতার দল কাঁপে, নলখাগড়ার ঝোপ দুলতে থাকে। ভাঁট ফুলের জঙ্গল মিশে আছে পারের অন্ধকারে।

সে জলের ধারে দাঁড়ানো। অনেক দূরে কিন্তু বিলের কোনোখানে কি জ্বলে উঠবে আলো? তার দীপ্তি কোল তাকেই দেখাবে। আর কিছু না।

সে বিলের দিকে তাকিয়ে আছে। সাতটি আলোর বৃত্ত ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হবে, এই বুঝি আশা। অনেক দূরে জ্বলে নেভে এমন প্রদীপ নয়, বৃত্তের মধ্যভাগে থাকবে অপরূপ রোশনি। কাছে এলে দেখবে তার মধ্যে নেচে চলেছে অবর্ণনীয় রূপহীন অপরূপা রমণী। প্রিয় জলপরী। শেষে একজন কাছে আসবে। আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আলোকরমণী তার সামনে দাঁড়াবে। জলের উপর দাঁড়ানো কিন্তু পা বিলের বুক স্পর্শ করে না।

হেসে সেই অধরা তার সামনে এগিয়ে ধরবে সোনার মূর্তি।

এবারে সে অস্থির আগ্রহে দ্যুলোকবাসিনীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বলবে, "দে, দে, সোনার মূর্তি দে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন ফুরানোর খেলা

হাহা রবে ওরা ছুটে আসে। পুকুরের পাড় দিয়ে, খোলা মাঠের বুক বেয়ে, জঙ্গলের ভিতর থেকে। চুন-কালিতে আঁকা বিকট মুখ, হাতে রক্তের লালে মুঠি করা তলোয়ার। ওরা কালান্তকসম, ওরা ডাকাত। যা আছে সব দাও। নিরীহ গৃহস্বামী ভয়কাতর। কিন্তু না, ঐ যে প্রচণ্ড সাহসী রক্ষীর দল ছুটে আসছে। যুদ্ধ, গুলি, ধোঁয়া। আগুনের খেলায় শূন্যবিক্রম ডাকাতরা তখন ধরাশারী।

যুদ্ধ শেষে হতাহতের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, ঘরে ফিরে যায় সবাই। নিহত যারা, আহত যারা— সবাই। অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়। অন্ধকারের ভয় আছে, গুরুজনের ভয় আছে। রাতশেষে স্কুলে পড়া না-পারার ভয় আছে।

ঘরে ফেরার আগে ডাকাত দলের সর্দার এসে পুলিশপ্রধানের কাছ থেকে ঝকঝকে বন্দুকটি হতে নেয় একবার। উজ্জ্বল চোখ। আমারও যদি এমন থাকত।

সঙ্গীরা চলে গেলেও পুলিশপ্রধান আরও কিছুক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায়। এই মুহূর্তে তার মন বিজয়ের আনন্দেই শুধু নয়, আগামী সান্ধ্যক্রীড়ার উত্তেজনায়ও ভরে আছে। চোর-পুলিশের খেলা এত ভালো লাগবে কে জানত। অবশ্য এমন জমজমাট খেলা কিছুদিন আগে দ্বিতীয় অস্ত্রটি হাতে আসার ফল। তাতে দলের শক্তি এবং উৎসাহ অনেক বেড়েছে। বিদেশপ্রত্যাগত এক আত্মীয় মানুষ মারার নকল খেলনাটি তাকে দিয়েছেন— সেই মহাজন আত্মীয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন নুয়ে পড়ে।

এর আগে তাদের দখলে ছিল মাত্র একটি অস্ত্র। তার শব্দও এমন কিছু কানে তুলো দেওয়ার মতো ছিল না। তবুও তারই প্রভাবে শীতশেষের পলায়মান সন্ধ্যায় বেশ কিছু ডাকাতকে ধরাশায়ী হতে হয়েছে। বন্দুকের শব্দ হলেই একজন ডাকাতকে মাটিতে পড়তে হবে। এ-ই নিয়ম। ডাকাতদলের হাতে যে বাঁশের তলোয়ার তা একবারও তোলা যাবে না। যদিও এই নিয়ম কারোরই পছন্দ নয়।

কিন্তু ডাকাত তোমাকে হতেই হবে। নইলে পরদিন পুলিশ হওয়া যাবে না এবং পরমকাম্য ঝকঝকে বাঁটসুদ্ধ নলটাতেও হাত দেওয়া যাবে না। আজ সন্ধ্যায় ডাকাত কাল সন্ধ্যায় পুলিশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মটিতে পড়ে যাওয়ার এই প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখে পাড়ার লোকে হাসে। বলে, "তোরা কি ঘুঘু? না পায়রা? শব্দের সঙ্গেই মাটিতে পড়ে যাস?"

বড় রাস্তা থেকে তাদের পাড়া একটু দূরে। পাড়ার শেষে ধূপখোলার মাঠে। বড় রাস্তা থেকে বেরনো গলির মতো পথ পাড়ার মধ্য দিয়ে, পুকুরের পাড় দিয়ে, জোড়া তালগাছের পাশ দিয়ে পাড়ার শেষ মাথায় কামারখালি যাওয়ার সড়কে গিয়ে মিশেছে। কামারখালির দিকে মুখ করে দাঁড়ালে হাতের ডাইনে নদী, একটু দূরে। মহকুমা শহর থেকে বাস এসে সেখানেই থেমে যায়।

হালকা আঁধারে পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটে বসে এইসবই দেখছিল পুলিশ প্রধান। সব ঘরে আলো জ্বলতে দেখে সে। দূরে গাবতলির রাস্তা দিয়ে শেষ বাসটি চলে গেল। কয়েকজন বাস থেকে নেমে সওদা হাতে তার পাড়ায় ঢুকবে এখনই। পুকুরপাড়ের জোড়া তালগাছের মাথা আস্তে আস্তে কেমন জমাট অন্ধকার হয়ে গেল। তালগাছের মাথায় কোন্ পাখি থাকে? বইয়ে বাবুই পাখির কথা লেখা। বাবুই দেখতে কেমন?

ধূপখোলার মাঠের দিক থেকে শেষ বসন্তের হাওয়া উঠে আসে। সরষে ফুলের হলুদ এখনও কালো নয়। ফসল কাটা মাঠে বিন্দু বিন্দু শিশির বুঝি এখনও আছে। মহীউদ্দিনদের কলাবাগানে একটু পরে ম্লান জ্যোৎস্নার আলো পড়লে জিন-পরী মাথা দোলাবে।

নদীতে লঞ্চের শব্দ। দিনে সবসময় শোনা যায় না। কিন্তু এখন রাত। হাইস্পীড লঞ্চ বরিশাল ছুটে যাওয়ার সময় ঠিক শোনা যায়।

সে ঘরে যাবে বলে উঠে দাঁড়ায়। অনেক দেরি হয়ে গেছে। যদিও বাবা এখনও ঘরে ফেরেনি সে জানে। মা তাকে কখনো মারবেন না। দিদিরা কাপড়-জামা আলনায় গুছিয়ে পড়তে বসেছে, সে ঘরে ঢুকলে 'গুণ্ডা', বলে চিৎকার শুরু করবে। সে কিছু নয়।

পঞ্চার মা গজমতি পুকুরে গা ধুতে এসে তাকে দেখে বকতে শুরু করে। অবশ্য পঞ্চার মা বুড়ির নাম গজমতি কিনা সে জানে না। দিদিরা তাকে এই কিছুদিন আগেও 'গজমতির বর' বলে ক্ষেপাত। পঞ্চার মা নাকি পঞ্চা মারা যাওয়ার পরেই ঐ রকম যাকে পায় তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

দুটো বন্দুক নিয়ে আগামীকাল মাঠ ও নদী দু'দিক থেকেই যুদ্ধ চালানোর কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘরে ঢুকে দেখে, বাবা চৌকির উপরে বসে আছেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় তাঁর মুখ ভালো দেখা যাচ্ছিল না। মা রান্নাঘরে উনুনের সামনে। দিদিরা কেউ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একবারও সংশয় প্রকাশ করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু পরে মানুভাই বাইরের ঘরের দরজায় এসে ডাক দিলে বাবা উঠে গেলেন। আড়চোখে দেখল বাবা খুব নিচু গলায় কী বলছেন। মানুভাইকে সবাই খুব খাতির করে। মিছিলে মানুভাই প্রথম সারিতে, সভায়ও মানুভাই প্রথমে বক্তৃতা করেন।

বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে, অনেকক্ষণ ভেবে, অনেকক্ষণ বসে থেকে মানুভাই পাশের বাড়ির দরজার কড়া নাড়ছেন সে শুনল।

ধূপখোলার মাঠের পাশে গাছের নিচে সে বসেছিল। আজ এখনও কেউ আসেনি। হয়তো কেউ আসবেও না। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে ডাকাত আর পুলিশদের অনেকেই কোথায় চলে যাচ্ছে। সবার বাড়িতেই মা-বাবা ভাবছেন। প্রায় শোনা যায় না এমন আওয়াজে রেডিওতে খবর শুনছেন। কারো কারো বাড়িতে বাক্সে কাপড়-জামা, পোঁটলায় খাবার বাঁধা হয়ে আছে। মনে হয়, এক্ষুণি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

অথচ মাত্র ক'দিন আগে সবাই কত খুশিতে ছিল। পাড়ার রাস্তায়, স্কুলের মাঠে, শহরের পথে জোরে জোরে কথা বলেছে, চিৎকার করেছে, মিছিলে নিশান তুলে ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন সে সব কিছু নেই। নিশান লুকানো, গলায় শব্দ নেই। যারা রাস্তার মিছিলে সবচেয়ে জোরে জোরে আওয়াজ করত তাদের কাউকে আর দেখা যায় না। শুনেছে মানুভাই অন্য সবাইকে নিয়ে বড় রাস্তায় আর নদীর ধারে ঘুরে বেড়ান।

পাড়াতে এখনও অনেকেই আছে। অনেক ঘরেই আলো জ্বলে, কথা শোনা যায়। বাতাসে ভাসা না-শোনার মতো খবর শোনা যায়। তবুও বড় রাস্তা দিয়ে রিকশা করে চমৎকার পোশাকের লোকেরা চলে যাওয়ার পরে 'দালাল' বলে গাল দেওয়ার লোকের বড় অভাব।

এইভাবেই সমস্ত বিকাল কাটে তার। ধূপখোলার মাঠে গাছের নিচে, পুকুরের সিঁড়িতে বসে। কোমরে গোঁজা পরমকাম্য যুদ্ধাস্ত্রের কথাও যেন আর মনে পড়ে না।

মাঠের ধার থেকে উঠে বাড়ির কাছে পুকুরের ঘাটে এসে বসল সে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কোনো কোনো বাড়িতে আলো জ্বলেছে। কিন্তু আজ কোনো বাড়িতেই কেউ পড়া তৈরি করছে না, গানের মাস্টার আসেনি। কিছু ভালো লাগছিল না— এ কেমন? কেউ কথা বলে না, হাসে না, ঘর থেকে বেরোয় না।

হঠাৎ কোমরে হাত চলে যায়। আচ্ছা, বন্দুক ফোটালে কী হয় এখন? সবাই বেরিয়ে আসবে কি? ভালো করে কিছু ভাবার আগেই বন্দুকের চাবি টিপে দেয় সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মুহূর্ত শব্দ ও সামান্য ধোঁয়া। সঙ্গে সঙ্গে নানা আওয়াজ, দরজা খোলার শব্দ। পুকুরের ওপারে পালানের বাড়িতে কান্নার আওয়াজ। পালানের বাবা-মা পালানের হাত ধরে, পোঁটলা হাতে নিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে আসে। তাদের বাড়ির পাশের মুহরি সাহেব শুধু লুঙ্গি পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে ধূপখোলার মাঠের দিকে ছুটে যান। কালীপদ প্রফেসর বৌ আর মেয়ের সঙ্গে দৌড়ে সরষে ক্ষেতের দিকে যেতে থাকেন। আরও দু'চার বাড়িতে কান্নার রব উঠেছে। সব আলো নিভে যায়।

রাস্তার মোড়ে নদীর দিকে চোখ রেখে মানুভাই আর যারা বসে ছিল, তারা ছুটে পাড়ার ভিতরে আসে। এ বাড়ি যায় ও বাড়ি যায়। কেউ মাঠের দিকে ছোটে। কেউ সরষে ক্ষেতের দিকে যায়। না, না, না, কোনো ভয় নেই। না, না, না, কোনো ভয় নেই। তারা আসেনি, তারা আসেনি।

আস্তে আস্তে কালীপদ প্রফেসর, মুহরি সাহেব, মা-বাবার হাত ধরে পালান, ফিরে আসে। দু'একটি আলো জ্বলে আবার। দু'চারজন বেরিয়ে পুকুরের দিক থেকে ওঠা শব্দ খুঁজতে আসে। যুদ্ধাস্ত্র হাতে সে একই জায়গায় দাঁড়ানো।

সবাই সামনে এলে সে চুপ করে থাকে। পিতার ক্রুদ্ধ তর্জন সে মাথা পেতে নেয়। তিনি তার হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে যান। যে মা কোনোদিন তার গায়ে হাত তোলেননি, সামনে এসে গালে একটি চড় বসিয়ে দেন। হাত থেকে প্রাণপ্রিয় খেলনাটি ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দেন।

সে কাঁদে না। এমন হবে সে বুঝতে পারেনি। সেদিন বিকেলেও তো খেলনা বন্দুকের কাগজে মোড়া গুলির আওয়াজে মাটিতে পড়ে গেলে সবাই হেসে বলেছে, "তোরা পায়রা। ঘুঘু। তোরা আবার যুদ্ধ করবি।"

সে চুপ করে বারান্দায় বসে থাকে। অন্ধকারে মাঠ দেখা যায় না। পুকুর দেখা যায় না। নদী অনেক দূরে।

একটু পরে ছোট এক ফালি চাঁদ জোড়া তালগাছের ফাঁক দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করে। হালকা আলোর ভাব। খুব ভোরে যেমন হয়। ভালো করে তাকালে অনেক কিছুই চেনা যায় তখন। এই তো পুকুরে যাওয়ার পথ। ওই তালগাছের মাথায় জমানো অন্ধকার। ঐ তো তালগাছের পাতায় জ্যোৎস্নার জিন-পরী মাথা দোলাচ্ছে। সবই তো তেমনি আছে। তাহলে বদলাল কী?

সে অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্য গগনবিহারী

লোকটি নাকি আকাশ দেখতে ভালোবাসত। না হলে চোখ কেন খোলা থাকে ঐদিকে অপলক? গ্রামীণ কৃষক— কী দেখে সে আকাশে? কেবল আদিগন্ত নীল চাঁদোয়া ছাড়া? আকাশে উড়ে যাচ্ছে হালকা মেঘের যে রাশি তার নাম সে জানে না কি আরও ঘন পেঁজা তুলার মতো যে মেঘ উড়ে যায় তা সে চেনে না। স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত মেঘ কি স্তরে স্তরে স্তবকে সাজানো নানা বর্ণ, নানা দৃশ্যের মেঘ, গগন পূর্ণ করা ঘনঘোর দিগ্বলয়হীন জলদ, কিছুই তার বিবেচনায় আসে না।

তার স্ত্রীর এই কথা জানা ছিল। অনেক অনেক আগের স্মৃতি মনে পড়লে নিস্পন্দ হয় সে। এক পা ফেলার পর আর এক পা ফেলার আগে দেখতে হয় সামনে কী আছে কিন্তু সে কথা মানুষটির মনে পড়ত না। সে নির্দ্বিধায় পথচলাকালীন সব শক্ত মাটির কাঁকর উপেক্ষা করে ঈশানের কালান্তক অতিথির আসা পথে ছুটে যেত।

স্ত্রী অনেকবার তাকে বুঝিয়েছে— দেখে কী লাভ, জেনে কী লাভ, 'অহন তো বইয়া রইছি চালের উপরেই।' খাওয়া-থাকা সবই সেখানে।

পোড়ামাটির দিনে, পথেপ্রান্তরে কেবল ধূলিরাশি উড়ে যাওয়ার দিনে, স্রোতস্বিনীর হাজারো রেখায় ফেটে-যাওয়া শুকনো বুক চাপড়ানো দিনেও তার আকাশে চোখ তোলা থামত না। ঝকঝকে পেতলের চতুর্দিগন্তবিস্তৃত থালা শুধু ঝলসে ওঠে এই দেখত সে।

দু'হাত দূরের গাছটি দেখা যায় না ঘন কুয়াশার আড়ালে কি মরা আলোর অনেক লম্বা সকালেও সে ধোঁয়ার আড়াল পার করে আকাশ দেখতে চাইত। আবার কখনো অবিশ্রান্ত বর্ষণে চরাচরের সীমারেখা মুছে গেলে সে দেখতে চাইত ধূসর স্লেটের গায়ে ফাঁক দেখা যায় কি?

তা এতসব কথা ভেবে-চিন্তে দেখার চাইতে এই কথাই সহজে বলা ভালো লোকটি মুক্ত আকাশ দেখতে ভালোবাসত।

যার সঙ্গে ঘরে বাস করে সে— তার স্ত্রী, আসলে তার হবে এমন কোনো কথা ছিল না। বরং উল্টোটাই ছিল। না, লোকটি ভূমিহীন কৃষক এখন দিনান্তের মজুর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আর তার স্ত্রী সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা, এমন নয়। পূর্বাপর পরিচয়হীন নিশ্চিত অতীত ভিন্ন গ্রামগঞ্জের মুনীষ, এমন কিছু লোভনীয়ও ছিল না কন্যার পাত্র হিসেবে। তবুও যে ঐ গ্রামে সে ঘরজামাই থাকবে বলে প্রতিশ্রুত হয় সে কেবল তার স্ত্রী, তখনও স্ত্রী নয়, তারই আগ্রহে।

কন্যার পিতা অনেক আপত্তি তুলেছিল। বিশেষত ভিন্ন গ্রামের এক মানুষ এই গ্রামের মাঠ দিয়ে বড় সড়কে উঠবার মুখে লোকটিকে দেখেছিল এবং নিজ গ্রামের ঘরজামাই বলে শনাক্ত করেছিল। বলেছিল তার গ্রামে আসা আর এক ভিনদেশি মানুষ নাকি ঐ ঘরজামাইকে আর-এক গ্রামের ঘরজামাই বলে চিহ্নিত করেছিল।

ফলে কন্যার পিতা এক হাঘরে দুই গ্রামের ঘরজামাইকে আবার তার ঘরজামাই করতে প্রচণ্ড আপত্তি করেছিল।

যতই তার একজন মুনীষ কি একজন কামলার দরকার থাকুক না কেন, মেয়েটি তার সুরূপা না হলেও সুগঠিতা তো ছিলই, তাহলে কেন হাত-পা বেঁধে দরিয়ায় ছুঁড়ে দেওয়া?

তার স্ত্রী সব শুনেও বাপকে বলেছিল ঐ হাঘরের সঙ্গেই তার বিয়ে দিতে। বাপের ক্ষেতখামারে কাজ করবার সময় একবার কেন অনেকবারই মেয়েটি লোকটিকে দেখেছিল। কখনো কখনো ধান মাড়াইয়ের সময়ে বাড়ির বাইরের আঙিনায় দুপুরের খাবার যে নিয়ে যেতে হয়নি এমনও নয়। অনেকবারই হয়েছে। ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন দেশের মানুষ, গাছতলায় তো আর রাত কাটাতে পারে না, তাই বৈঠকখানার বারান্দায় কি ঠাণ্ডাবাদলের দিনে ঘরের ভিতরের চৌকিটিতেও শুয়েছে কখনো। আর সব সময় যে দুচোখ বন্ধ করেই সারারাত কেটেছে এমন নয়, এমনকি একা একাই যে কেটেছে এ কথাই-বা নিশ্চিন্তে বলবে কে?

শ্বশুর তার বিরক্তই হয়েছিল বলা যায়। তবে সেও তো গৃহস্থ বৈ কিছু নয়। মেয়েটি ঘরেই থাকবে, পেটেভাতে কাজের লোক বারোমাস— এসব চিন্তাও বোধ করি তার মাথায় ছিল। তাছাড়া নগদ টাকা দিতে হবে না, শাড়ি-গহনা-কাপড়ও এমন কিছু নয়, এইসব ভেবে লোকটিকে ঘরজামাই রেখে দেয়। এই গ্রামে আসার আগে কোথায় ছিল, কী করেছে, তার জেনে কাজ কি?

বর্ষার এক প্রত্যুষে ঘরজামাই ঘর ছেড়ে যায়। শ্বশুর কন্যাটির বাপান্ত করে চার গ্রামে লোকজন দিয়ে কিছু খোঁজখবর করায়। মেয়েটি মনে মনে কাতর হলেও বাইরে ফুঁসছিল। তার ভাবনা আর দশজনের পথেই চলতে শুরু করে— সামনে নতুন ফসলের দিন, নিঃসন্দেহে আরও যে দুই ঘর আছে কিংবা হয়তো আরও বেশি, সেইসব কোনো ঘরে উঠেছে। অথচ কোন্ ঘরে কেউ জানে না বলে লোকটি নিরুদ্দেশই থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এত কথার মধ্যে কারো মনে আসে না যে শরতের নীল আকাশ মেঘের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে লোকটিকে ডাকছে। আগেও একবার ডেকেছিল। এটি সেই সময় যখন লোকটি শুকনো খড়ের বিছানায় ধান কাটা মাঠে শুয়ে থাকত সারারাত। চোখ তোলা থাকত নীল চাঁদোয়ার তারার মেলায়। কবে ঐ আকাশে নীল ফিরবে।

তার স্ত্রীর মনে কথাটি এসেছিল। সম্ভবত এ জন্যই কখনো প্রদীপনেভানো রাতে বাইরের আঙিনার খড়ের মরাইয়ের নিচে সে খুঁজে আসত— আকাশের দিকে চোখ মেলে কেউ শুয়ে আছে কিনা, এবং আশ্চর্য এক প্রভাতে সত্যিই সে লোকটিকে খড়ের মরাইয়ের নিচে ঘুমাতে দেখেছিল যদিও ততদিনে ঐ রকম দুই হালকা মেঘের কাল পার হয়ে গিয়েছিল।

শ্বশুর তার মুখদর্শন করেনি অনেকদিন। স্ত্রী বাইরের বারান্দায় মাদুর-বালিশ কিছু ছুঁড়ে দেয়নি। মাটির দাওয়ায় মাথার নিচে দু'হাত রেখে দু'রাত কাটানোর পরে সে যখন প্রায় বিশ্বাস করে যে এই ঘরে জামাই চাই না তখন একটি মাদুর আর বালিশ বারান্দায় উড়ে আসে এবং বালিশ আর মাদুরের উৎসমুখ আবিষ্কার করে কিছু চেষ্টায় লোকটি বালিশ-মাদুরের উৎসস্থলে পৌঁছে যায়।

কোন্ দেশের কোন্ গ্রামের কোন্ ঘরের বারান্দায় চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখেছে সে এতদিন জানতে চেয়েছিল তার স্ত্রী। এবং উদ্যত ঝাঁটার মুখে সে বলতে বাধ্য হয়েছিল ঐসব গ্রামের ঘর নয়, মাটিও নয়, খোলা আকাশ তাকে টেনেছিল।

কার আর কী বলার থাকে তখন?

কিন্তু এসব কোনো যুক্তিই কেউ মানে না যখন দ্বিতীয়বার অমন ঘটে। দুই ফসলের মৌসুম পার করে দিয়ে আবার এক নীল আকাশের প্রত্যুষে যখন সে দেখা দেয় তখন তার শ্বশুর কন্যাটির তত্ত্বাবধান করে না আর এবং নিঃসঙ্গ কৃষককন্যা এই দ্বিতীয় যাত্রাও যে দ্বিতীয় ঘরের দিকেই এই অভিযোগ করেও তাকে সম্মার্জনী দিয়ে উঠোন থেকে সাফ করে দেয় না। লোকটি যে এই তৃতীয় ঘর থেকে বেরিয়ে চতুর্থ এবং পঞ্চম ঘরেও প্রবেশ করেনি একথাই-বা বলবে কে?

লোকটি অবশ্য ঐ এক কথাই বলে। খোলা নীল আকাশ কোথায় কোথায় পাওয়া যায় দেখে বেড়ানোই তার উদ্দেশ্য।

তার স্ত্রী ঐসব কোনো কথাই মানে না। সাবধানী চোখও সরায় না আর। মৌসুমি মুনীষ কি পরিজন-প্রতিবেশী সকলকে বলে রাখে কোনোমতে যেন ভিন্ন আকাশের নিচে না যায় লোকটি। ফাটা মাঠ, পোড়া মাটি, শুকনো নদী, ধূসর ঝরাপাতার এক শেষ রাত্রিতে আস্তে ঘরের দরজা খুললেও সন্তানকামী রমণী সেটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ঠিক টের পায়। নিঃশব্দে পেছন পেছন এসে সীমানার শেষে তরল অন্ধকারে লোকটি যখন প্রান্তরমুখী হয় তখনই স্ত্রী তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে। কিছু সময় কে জেতে এই টানাটানির পর এমন অবস্থা হয় যে লোকটি কিছুতেই তুলে নেওয়া পা নামায় না আর কৃষাণীও কোনোমতে সন্তানের দাবি ছাড়ে না, নিরুপায় লোকটি তখন আপন স্ত্রীকে– হোক প্রথম কি তৃতীয় অথবা পাঁচজনের একজন, অপহরণ করে।

সারিবাঁধা খুপরির বাইরে দাঁড়ালে সামনে ঐ সারিবাঁধা খুপরিই দেখা যায়। বাঁশচাটাইয়ের জঙ্গল পার হয়ে এলে দেখা যায় সরে যাওয়া নদীর বুক কাছেই। কাদাবালি, আগাছা, জঙ্গল, কচুরিপানায় আটকে থাকা মৃত পশুদেহনিমজ্জিত মসীকৃষ্ণ তরল। বাঁশের সাঁকো পাতা আছে ঐ ক্ষীরসমুদ্র পারাপারের জন্য। নদীর তীরে সহস্রজনের কোলাহল। দোকানপাট, বাজার, অট্টালিকার সারি। বিমূঢ় নভোচারী কোনোমতে সন্তানকামী রমণীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল কিনা সেটি বড় কথা নয়– একদিনের জন্যও আকাশ দেখতে পায়নি এই বিবেচ্য। ক্রমে একদিন ঘষা কাচের মতো নগরীর ওপরের ঐ আচ্ছাদান অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বৃষ্টিধারার বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চরের মাঝখানে আটকে পড়া বন্ধ জলাশয়, খাঁড়ি সব ভেসে যায় এবং নদী ছুটে এসে বাঁশ-চাটাইয়ের খুপরির মাঝখানে বুকসমান খাটপালঙ্ক পেতে দেয়। লম্বা টিনের চালায় আরও শতজনের সঙ্গে দু'রাত কাটানোর পরে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাওয়া কর্দমাক্ত নদীতীর পার হয়ে অবশেষে শহরের বাইরে চলে আসে তারা। গ্রামমুখী রমণী এবারে পুরুষের দুহাত শক্ত আঁচলে বেঁধেছিল।

বারান্দায় স্থির হয়ে বসেছিল সন্তানসম্ভবা রমণী। বাঁপাশের চালাঘরে এখনও শোনা যাচ্ছে পাখা ঝাপটানোর শব্দ। খাঁচায় আটকানো মুরগির স্তূপ থেকে বিক্রেতা একটিকে বেছে নিতে চাইলে যে শব্দ হয় তার শতগুণ শব্দ মাঝে মাঝে চকিত করে দূর প্রতিবেশীকেও।

সারা বিকাল, সন্ধ্যা এই আঙিনায় প্রতিবেশীর ভিড় ছিল। নারী-পুরুষ-শিশুতে পরিপূর্ণ ছিল উঠান। অসমসাহসী প্রতিবেশী দু'একজন চালাঘরের দরজা খুলে ভিতরে যেতে চেষ্টাও করেছিল, পারেনি। গলা ছেঁড়া, মোচড়ানো মুরগি আর রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। সন্ধ্যার কিছু পরে চৌকিদারকে ডেকে নিয়ে এসেছিল একজন। শক্তিধর একবার চারপাশ জরিপ করে দরজা খুলে লোকটিকে দেখে। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে বলে, লোকটিকে টেনে বের করে আনা তার সাধ্যে নেই। আর লোকটি এমন কিছু বেআইনী কাজও করেনি। নিজের মুরগির ঘাড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি নিজেই মুচড়ে দিয়ে থাকে তবে কার কী? আইনের কিছু করার নেই এখানে। 'চ্যারম্যানেরে ডাক', এই ছিল তার পরামর্শ।

রাত্রি বাড়লে, প্রতিবেশীদের শেষ দলটিও চলে গেলে, অনেক অনুরোধে চৌকিদার আরও কিছু সময় থাকে। উঠোনের মাটিতে বসে থাকার সময় অন্ধকারে তার বিড়ির আগুন মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে। অবশেষে মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে সে অবশ্যই সকালবেলা ফিরবে।

অন্ধকার সমুদ্রে দ্বীপটির মতো লণ্ঠন জ্বালিয়ে বারান্দায় বসে থাকে অস্থির জ্ঞানহীন লোকটির প্রণয়িনী নিজেও সে অস্থির নিঃসন্দেহে নাহলে শূন্যাভিলাষীকে ধরে রাখতে চায় কেন?

রাত্রি গভীর হলে চালাঘরের মধ্য থেকে শব্দও কমে আসে। এক সময়ে সবই নিঃশব্দ হয়ে যায়। বারান্দয় বসে থাকা একাকী নারী, সঙ্গী বৃদ্ধা আত্মীয়া চাটাইয়ের উপরে নিদ্রিতা। লণ্ঠনের নিস্তেজ আলোয় রমণী নিজেও এক সময়ে ঢলে পড়ে। আধো ঘুমে একবার মনে আসে চালাঘরের দরজা খুলে দাঁড়াবে তার সামনে। শুকনো রক্তের দাগ থাকবে নিশ্চয়ই ঐ হাতে তখন। তাতে কি— সেই হাতটিকে নিজে শরীরে তুলে দিয়ে বলবে, 'দ্যাখো, এইখানে কে?' ভুলে যায় এ-কথা প্রথম শোনার পরেই এলোমেলো হেঁটেছিল লোকটি।

আকাশ আর মাটি ক্রমে নিজ নিজ সীমা স্পষ্ট করে। বৃক্ষাশ্রিত লতা কি তরুশাখা ক্রমে নিজ নিজ অবয়ব ফিরে পায়। দিগন্তের কৃষ্ণসীমায় মৃদু আলোর রেখা ক্রমে বিস্তার লাভ করে। বৃক্ষবাসী সকলে নানা শব্দে পরস্পরকে জাগরিত করে দিগন্তবিস্তৃত শূন্যে ডানা মেলে দেয়।

বাতাসে সুগন্ধ ভাসে। শিশির কি শিউলির ঘ্রাণ। ঝিলে ফোটা শাপলা কি সুবিলের পদ্ম কি বাড়ির উঠোনে ফুটে থাকা টগর-গন্ধরাজ তারাও কিছু সুবাস রেখে যায় বাতাসে। উঠোনে নামলে দেখা যায় অনেক উপরে মেঘের হালকা রেখাই মাত্র। স্পষ্ট হচ্ছে নীলিমা।

লণ্ঠনের কাচ ধোঁয়ার দাগে মলিন। মৃদু শিখাটিকে দেখা যায় না। তবুও আসন্ন সন্তানবতী চকিত উঠে বসে দেখে চারপাশ। ভোরের শব্দ শোনা যায় কেবল, আর কিছু নয়। ঘুমন্ত সঙ্গিনীকে ডাকে না সে। বারান্দা থেকে নেমে আসে।

চালাঘরের সামনে দাঁড়ায় কিছু সময়ের জন্য। দরজার শিকল খুলে কী দেখবে ভেতরে এই আশঙ্কায় চোখ বন্ধ ছিল। সজল তো নিঃসন্দেহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে শিকল খুলে ঘরে ঢোকে সে। যেন কেউ না জাগে। বুঝি মৃত মুরগিটিও নয়। চোখে ভালো দেখা যায় না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে যে সামান্য আলো আসে তা কিছুই স্পষ্ট করে না।

রমণী দেখে লোকটি চালাঘরের মাঝখানে শোয়া। ইতস্তত ছড়ানো মৃত প্রাণীকুল। মেঝেতে গাঢ় কালো দাগ।

লোকটির কাছে যায় সে। ভাবে তার হাত ধরে বাইরে নিয়ে এসে বলবে, 'দ্যাহো, দ্যাহো, না হয় আকাশই দ্যাহো তুমি।'

নিচু হয়ে লোকটির মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায় তার স্ত্রী। খুব স্পষ্ট না হলেও সে বোঝে লোকটির চোখ খোলা, অপলক। শুধু দৃষ্টি আটকে আছে টিনের চালায়।

বাপমায়ের চোখ এড়িয়ে একদিন এক তরুণী দূর প্রান্তরের সন্ধ্যায় ভিনদেশি একদা মুক্তিকামী, মুক্তিদাতা, তখন প্রবঞ্চিত এক যুবকের পাশে শুয়েছিল। এমনি করে প্রেমিকের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিল তার শূন্য দৃষ্টি।

জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী দ্যাহো তুমি?"

আকাশ, আকাশই দেখে বুঝি লোকটি, বলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য মুছে গেলে

ভূমি শূন্যে ভাসে। জলপ্রপাত উর্ধ্বগামী— ভূমিলীন জলাশয়কে ধারণ করে আছে শীর্ষে। বৃক্ষাদি নিম্নমুখী। আকাশ ঘষা কাচের মতো মিশে আছে সেই অক্ষিপটলে, অক্ষিতারকায়। অথবা তাই কি?

যারা কাছে আসে, দেশান্তরী— পরিজন কি প্রতিবেশী, চোখের কাছে ভিড় করে আসে না কখনো। একজন কাছে বসে মুখের দিকে তাকালে দৃশ্য মুছে যায়। ছায়া থাকে, পিছু হেঁটে চলে। তখন সব দেখে সে। শ্বেত অক্ষিপটল কৃষ্ণবিন্দু হয়। আটচালা ঘর থেকে নিকোনো উঠানে নামে। পেয়ারা, আম, জাম, কাঁঠাল ইতস্তত দাঁড়ানো কিন্তু সারিবদ্ধ সুপারিই সীমানা নির্দেশ করে। সীমানার শেষে পলাশ, আছে শিমুলও। সময়ে নিচ লাল হয়। এগুলে পথে পড়বে শানবাঁধানো ঘাটের পুকুর। চারপাশ তার ঘিরে আছে নারিকেলশ্রেণি। ছুঁয়ে আছে দিঘির বুক হিজল কয়েকটি এখানেও, আশ্চর্য! পুকুরপাড়ের ঝকঝকে রাস্তাটি বেঁকে চলে গেছে পড়শির বাড়ির সম্মুখ দিয়ে। মিশেছে দূরগ্রামের রাস্তায়। পুকুরের পাড়ে দাঁড়ালেই দেখা যায় কৃষ্ণছায়া হলুদ শস্যপ্রান্তরের শেষে। সময়ের রবিশস্য কি সরিষা দুলতে থাকে, মৃদু বাতাসে আদিগন্ত পুষ্ট ধানের শিষও।

এইসব ভাসে শূন্যে। দৃশ্যে। কিন্তু সকলে দেখে না।

শীর্ণ, প্রায়কঙ্কাল দেহটিকে সরিয়ে নেয় পুত্রবধূ। বিছানা পালটায়, বদলে দেয় পরিধেয়। তারপর রাখে শিশুতুল্য শরীরটিকে পূর্বস্থানে। এই সময়ে নাতিটি, কি নাতনিটিও কাছে থাকে না। পতিহীনা নীরবে হ্রস্বমান দেহটির পরিচর্যা করে। হোক শিশুতুল্য ওজনই না-হয় শীর্ণ বৃদ্ধার শরীর, কিন্তু সেটিও দীর্ঘকাল ধরে রাখা যায় না বুকে। কিন্তু সে রেখেছিল। পুত্রবধূর গলা ধরে বৃদ্ধা পার হয়েছিল দুস্তর পারাবার। ক্বচিৎ কখনো বাঁশবনের ছায়ায়, কি আখক্ষেতের আড়ালে ক্ষেতের আইলে শাশুড়িকে শুইয়ে দিয়ে কিছু সময় জমে যাওয়া শরীরকে আবার সচল করা।

শুকনো বিছানায় শুইয়ে দিয়ে শরীরটি ঢেকে দেয়। বন্ধ চোখের স্থির দেহটিকে গতায়ু এমনও মনে হয় তখন। এবং তখনই সে চোখ খোলে, ভাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ভূমিহীন দৃশ্য, আর সে বলে, মনুরে ডাক না বৌ! ভাষা ছিল না তার অনেককাল। মাঠ, খাল, বিল, নদী, জনপদ পার হয়ে এই ভিন্ন জনপদে শুইয়ে দেওয়ার পরেই সব কথা শেষ হয়ে যায় তার। এবং এমন নিঃশব্দেই চলে যাবে এমনি বিশ্বাস যখন সকলের তখন পরম বিস্ময়ে পুত্রবধূকে ভাসিয়ে দিয়ে সে বলেছিল, 'মনুরে ডাক না বৌ! মনু আয় নাই। অরা তারে ডাইক্যা নিয়া গেল। অখনো আয় নাই?'

দীর্ঘ সময় পরে শোক ফিরে আসে, স্বামীহীনা কাঁদে। হয়তো ওই একবারই, তবুও দীর্ঘকাল বাকহীনা তখন পুত্রমুখই দেখতে চায়, হোক সে-ও গত অনেককালই। শাশুড়ির বারবার 'ও বৌ মনুরে ডাক' পুত্রবধূকে কাঁদায়। নিশ্চিত বোঝে ভাসা দৃশ্য আর কেউ দেখবে না অক্ষিপটলে।

'মনুরে ডাক। খাইতে দাও, ভাত অয় নাই? লও আমিই না-অয় ভাতটা বহাই।'

উঠবার চেষ্টা করে, শরীর সামান্য আন্দোলিত হয়, হাতটি বিছানা থেকে উঠে কাঁপতে থাকে। পুত্রবধূ সেটিকে নামায়, 'আপনি শোন, তারে ভাত দেই।' কিন্তু মা মুতূর্তে সরে যায়, 'আমারে খাইতে দিবা না?' কিছু সময় আগেই পুত্রবধূ শাশুড়ির জন্য প্রস্তুত প্রায়-তরল আহার্য ঝিনুক দিয়েই মুখে তুলে দিয়েছিল।

এইরকম শোনা যায়, শেষযাত্রার মুহূর্তে সব কথা স্পষ্ট হয়, স্মৃতি সুখের হয়, যাত্রী নিজ জীবন ও গৌরবের কথা বলে। 'আমার ডাইলটা দিও তো মনুরে, খাইতে ভালোবাসে সে আমার রান্দা।' স্মৃতি স্পষ্ট। জীবদ্দশায় পুত্র তার প্রতিদিন আহারকালে মায়ের রান্নার খোঁজ করতই।

মুখে কথা ফেরার পরে নাতি-নাতনিরাও তার পাশে এসে বসে। লেখাপড়া, কাজকর্ম, কি কাজ খোঁজার ফাঁকে ফাঁকেই। বিমূঢ় তারাও। বলে, 'দ্যাখো মা, বুড়ি আমাদের চেনে না কিন্তু ছেলের কথা মনে আছে ঠিকই।' নাতি-নাতনির মুখ সে চিনতে পারে না, চিনবে কী করে এ কথার জবাবে তারা বলে, 'কেন গলার আওয়াজ!' তারা নানা কথা জিজ্ঞেস করে তাকে। এই দুবছর আগেও কিছু বুঝত সে। পারাপারের কথাও, সামান্যই। এখন সে-সব কিছুই বলে না সে। মাঝে ক্বচিৎ বিদেশবাসী আর দুই দৌহিত্র-দৌহিত্রীর নাম মুখে আসে তার। কোথায় তারা? ওই কথা বলার পরেই সে ফিরে যায় তাদের বাল্য ক্রীড়াকালে। পুত্রবধূকে নিষেধ করে কোনোমতেই যেন বৌ তার বড় ছেলেমেয়ে দুটিকে বাইরে না যেতে দেয়।

সন্ধ্যার পরে কোথাও যাওয়ার থাকে না কারও। নতুন ভূমিতে বাস যত দীর্ঘকালই হোক, বান্ধবসঙ্গে সময় কাটে না। তখন পাশের ঘরে সকলে নানা কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে। কখনো উঠে যায়, দেখে শরীর কি শীতল? তারপরে সকলেই ফেরে স্মৃতিতে।

অন্ধকারের আশ্রয়ে ঘরের বাইরে আসে ক'জন। সদ্য স্বামীহীনা বুকে তুলে নেয় অশক্ত শাশুড়িকে। বৃদ্ধা কাঁদে, 'আমারে রাইখ্যা যা, ও বৌ আমি যাইতাম না, হাঁটতে পারি না।' বৌ মুখ হাত দিয়ে ঢাকে তাঁর। 'কথা কইবেন না, কাইন্দা লাভ নাই', আটচালার টিনে ঘরকাঁপানো শব্দ হয়। বৃদ্ধা বলে, 'চাইলতা পড়ছে বৌ, কুড়াইবি না?' পাকা চালতা কি পেয়ারা কি ফলসা কিছুর জন্যে দাঁড়ায় না বৌ। এমনকি ক্বচিৎ ফলন্ত গোলাপজাম গাছটার নিচেও নয়। পথপ্রদর্শক ছায়া থেকে বেরিয়ে আসে। কখনো হাঁটাপথে, কখনো নৌকায়, কখনো রিকশায় রেলগাড়ির সীমানায় পৌঁছে দেবে সে।

সারি বেঁধে হাঁটে তারা। পথপ্রদর্শক, স্কুলের ছাত্র দুটি, কিশোর ভাইটি তাদের বৃদ্ধা শাশুড়িকে সন্তানসম কোলে নিয়ে কষ্টে হাঁটে পুত্রবধূ এবং শেষে কলেজপড়ুয়া তরুণ। ভাইবোনসহ সম্পূর্ণ পরিবারটির আশ্রয়।

পথপ্রদর্শকের এক বন্ধু-পরিবারে রাত্রিযাপন হয়। প্রায় অচল বোধহীন শরীর থেকে অবশেষে মাটিতে রাখে যেন শিশুটিকে পতিহীনা। সীমিত আহার্যের শেষে হাতের উপাধানে ভূমিশয্যার নিদ্রা। আর একবার মিনতি 'আমারে রাইখ্যা যা, আর পারি না।' নিঃশব্দে রাত্রিবাস। প্রত্যুষে পুনরায় পথে।

কিছু মনে পড়ে না? কোনো কথা নয়! তারা আলাপ করে। শ্মশ্রুমণ্ডিত ছদ্মবেশী পরিবারের আশ্রয় তরুণ এখন অর্থোপার্জনে প্রতিজ্ঞ, তাই বিদেশে। পরিবারের মুখে আহার তুলে দেয় সেই যুবকেরও কিছু মনে থাকবে হয়তো।

পাশের ঘরে তারা বিস্মিত, বলে, 'একটি কথাও নয়! একটি দৃশ্যের স্মৃতিও মনে নেই! এ কেমন?'

কখনো এ ঘরে এসে তারা দেখে। চোখের পাতা কি বন্ধ? ঠোঁট নড়ে কি? বলে কিছু কি? কখনো উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে, 'দেখতে পাও? আমি কে? চোখের তারায় তবু দৃশ্য ভাসে না। তাহলে? রাত্রি গভীর হয়। ঘরের পাশের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ কমে আসে। সামান্য দূরের রেললাইনে শহরতলির দৈনিক যাত্রীও। ভরে যাওয়া নর্দমা থেকে সারা দিন জমে থাকা মশককুলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সদ্যোজাত আরও অনেক। অন্তযাত্রীর শরীরেও তারা বসে। পরিজন হাতে পাখা নিয়ে অনুমিত ক্লেশ দূর করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বন্ধুহীন হলেও সমব্যথী কিছু তো থাকেই। একই মাঠ, বাঁশঝাড়, আমবাগান, পরিবার তারাও ফেলে এসেছে। বৈকালে কি সন্ধ্যায়, কি অসময়ে এসে তারাও খোঁজ নিত অক্ষিপটলে ছায়া ভাসে কি?

মধ্যরাত্রির প্রহর কেউ ঘোষণা করে না। কেবল শহরতলির পাটকল রাতের শ্রমিক আহ্বান করে। আর তখনই চোখের পাতা খুলে যায়। স্পষ্ট দেখে সকলে স্ফটিক চক্ষুতারকায় কৃষ্ণবর্ণ দ্যুতি।

পুত্রবধূ দেখে তার আটচালা ঘর। উঠানের মাথায় বাঁধা সবৎসা গাভী। আছে লাউ-কুমড়ো-ঝিঙ্গের মাচাটা। সময়ে-অসময়ে নারকেল ঝরে পড়ে। তর্ তর্ সুপারি গাছ বেয়ে উঠে যায় দক্ষ আহর্তা, কেটে আনে ছড়ার পর ছড়া। দেখে চিকিৎসক স্বামী তার কোনোমতে ঘরে আসতে পারে না। অসুস্থ দরিদ্রজন তাকে ঘিরে রাখে আরোগ্যের আশায়। চিকিৎসকেরও পরিবার থাকে, তাদেরও বাসস্থান আহারের প্রয়োজন হয় একথা বুঝেও শূন্য হাতে আসে তারা। চিকিৎসক কেবল ঔষধ নয়, অনুপানটিও তুলে দেন তাদের হাতে কখনো। পড়ন্ত বেলার সামান্য অর্জনে যেন দিন-ও চলে না। দেখে মা তার চিকিৎসক সন্তানের স্বাস্থ্য কামনায় নিজে রান্নাঘরে ঢুকতে চাইলে বৌয়ের 'আমি কি রানতে পারি না' কথার জবাবে, 'হেইটা কই নাই, মনুয়ে ভালোবাসে', বলে হাসে, বৌয়ের মন রাখার জন্য। দেখে অসময়ের ফল কি সময়ের আনাজ মাথায় করে নিরাময় গ্রামবাসী চিকিৎসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। গর্বে তার বুক ভরে বৈকি!

দৌহিত্র তার শরীর ছুঁয়ে বসে থাকে। তাকালে দেখে তিন শিফটের কলেজের পথে সে নয়, চলেছে প্রত্যুষের প্রথম ট্রেনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে। ছুটিতে ঘরে ফিরলে আনন্দিত পোষা কুকুরটি তার চলে যাওয়ায় খাবার ছেড়ে শুয়ে আছে ঘরের ছায়ায়। ফিরে যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় পুরনো স্কুলের খেলার মাঠে বন্ধু-সম্মিলন, তারাও এসেছে শহর থেকে ছুটিতে।

তরুণী দেখে কৃতবিদ্য অগ্রজার সেই কলেজ থেকেই সোনার মেডেল জুটেছে তার। অগ্রজার মতোই বৃত্তি জুটেছে, যাবে দূরদেশে। দেখে প্রতিবেশী বান্ধবী ফিরেছে স্বামীর সঙ্গে। খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। পুকুরঘাটে কি অলস গ্রীষ্মের দুপুরে।

কিশোরী দেখে বিকালের আলোয় বারান্দার মাদুরে বসে তাকে গানের তালিম দিচ্ছে শহরের নানান অনুষ্ঠানের পরিত্রাতা গায়ক, সংগীতশিক্ষক। বারবার বলে দিচ্ছে, 'অন্তরাটা আবার ধরো, ঠিক হচ্ছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব, সব দেখে তারা। কাছে এসে ক্ষীয়মাণ দেহটির চারপাশে বসে। স্ফটিকের চোখের দিকে তাকায়। সিলিং থেকে ঝুলতে থাকা মৃদু বৈদ্যুতিক আলোর বাল্বটি কিন্তু তারা দেখে না।

দেখে না সেই ভোরের যাত্রা। হাঁটাপথে কেউ যেন সামনে না আসে এই কামনায় দ্রুত চলে যাওয়া। দেখে না বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট রাস্তা, ধানকাটা মাঠের শক্ত জমি মাড়িয়ে পুরনো নদী– এখন বিলের তীরে দাঁড়ানো; দেখে না ছোট ডিঙি নৌকাটি; দেখে না হঠাৎ বড় রাস্তার কাছে এসে পড়লে দূরে কালো ট্রাক, দেখে না কালভার্টের নিচে জমা বিলের জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকা দলটিকে; দেখে না কোমর জল ভেঙে শেষ দূরত্বটুকু পার হওয়ার মুখে উত্তেজনায় হাতে ধরা বড় শখের রেডিওটি বারবার জলে ডোবানো– যেন মাপছে 'এ বাঁওয়ে জল মেলে না।'

স্ফটিক চক্ষুর দিকে তাকায় তারা। দেখে শূন্যে ভাসে ভূমি। আর একথা বলে তারা জোরেই, শুনে ফেলে দরজার বাইরে দাঁড়ানো সমব্যথী সকলে। তারা ঘরে ঢুকে পড়ে। দেহটিকে ঘিরে বসে। প্রথম বৃত্তে স্থান না পেলে দ্বিতীয় বৃত্ত তৈরি করে, তারপর দরজার বাইরে বসে যায় সারি বেঁধে। পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে তারা। যেন স্ফটিক চক্ষুর, অক্ষিপটলহীন চক্ষুতারকার সব ভাসমান দৃশ্যই সকলে দেখে।

দেখে তারা ভূমি স্থিত, জলপ্রপাত নিম্নমুখী, বৃক্ষাদি নিজ নিজ শিকড়ে দাঁড়ানো, সুনীল আকাশে মুখ বাড়িয়েছে প্রভাতী দোয়েল, ফুটে আছে শ্বেত শাপলা পদ্মবিলে। পুড়ে যাওয়া ঘর, গ্রাম, শহর তেমনি স্বস্থানে। অথবা তাই কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নের সীমানায় পারাপার

এক

অন্ধকার ও আলোর মাঝখানে এক ধূসর অস্তিত্ব আছে– সেখানে বুঝি কিছু থাকে না, কিছু ঘটে না। স্বপ্ন ও জাগরণের মাঝখানেও কি তেমনি? কিছু কি ঘটে না সেখানে কিছু কি থাকে না?

আমি আমার বিছানায় শোয়া, বালিশে মাথা। ঈষৎ পাশ ফিরলে আমি তাকে দেখতে পাই। কখনো তার পূর্ণ শরীর, কখনো কিছুটা আড়ালে থাকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধবার জন্য একটু নড়লে অমন হয়। আমি তাকে দেখি।

এক মুহূর্ত আগের কথাটাই তখন আমার কানে। 'ঘুম পেয়েছে কি?' তার এই প্রশ্নের জবাবে বলি, 'না তো।' বলেই চোখ বন্ধ করি। শুনি বলে সে, 'আমার ভালো ঘুম হয় না রাতে– অনেক দিন ধরেই।' বলে ঘরের অন্য পাশে তার বিছানার দিকে যায়। আমি আর তাকে দেখতে পাই না।

দুই ঘরের মাঝখানে খোলা দরজা দিয়েই তাকে দেখি আমি। আমি এক ঘরে, সে অন্যটিতে। দুই ঘরেই ঢোকবার আলাদা দরজা আছে। এই মুহূর্তে ওই দুই দরজাই বন্ধ। শুধু মাঝখানের দরজাটিই খোলা।

আমার ঘরের আলোটি ম্লান। ভারী অস্বচ্ছ কাচের একটি শেড বাতিটিতে পরানো। বিছানার বাঁপাশে রাখা আলোটির দিকে সামান্য পেছন ফিরলেই তাকে দেখতে পাই আমি। তার ঘরের আলো এত ম্লান নয়। ঘষা কাচের শেডে ঢাকা বাতিটি দেয়ালে বসানো। তার বিছানার পাশের ছোট টেবিলটিতেও আমার ঘরের মতোই একটি বাতি আছে। শুতে যাওয়ার আগে হয়তো জ্বালাবে সেটি। দেখবে সব কিছু ঠিক আছে কি না। বিছানার একপাশে ভারী কোলবালিশের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট নকশিকাঁথার উপরে শোয়ানো সন্তানটিকেও হয়তো দেখবে সে। একটু আগে যেমন দেখেছিল।

খোলা দরজার আলোর ছায়া ভাসে মনে হয়। দরজার দিকে ফেরানো মুখ, চোখ বন্ধ থাকলেও আলোর আড়াল বোঝা যায়। 'এই বাচ্চাটি হওয়ার পর থেকে ঘুম আরও কমে গেছে' বলে বুঝি সে। বলে আমার দিক থেকে কিছু শোনবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা করে কি? তাকায় কি দরজা দিয়ে আমার দিকে? দেখতে পায় কি সে আমার মুখ, আমার বন্ধ চোখ? 'ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?' বলে সে।

আমি দরজার আলো ছায়া দেখি বন্ধ চোখেই। হালকা হওয়ার সঙ্গে সামান্য খসখস শব্দ ওঠে বুঝি। সে বুঝি আমার পাশেই এই ভেবে আমি বিছানার ভিতরে সরে গিয়ে তাকে বসবার জায়গা করে দিতে চাই। বুঝি বুকের পাশে এসে বসেছে সে। মুখ নিচু করে আমার বন্ধ চোখ কি দেখে সে? কাঁপে কি সেই চোখের পাতা? 'সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

দুই

তাদের নতুন ঘরে আসবার কথা আমার অনেক দিনের। চিঠিতে নানা বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বেড়াতে আসার অনুরোধ। চিঠির হস্তাক্ষর আমার বন্ধুর কিন্তু তার স্ত্রীর বয়ান-ই যে সবটুকু তা আমি বুঝি। তাদের বিয়ের পরে দু'বার আমি এসেছিলাম। একবার বিয়ের মাসকয়েক পরে বন্ধুপত্নীর পিত্রালয়েই। ভরা বর্ষার দিনে খানিক রেলগাড়িতে, খানিক নৌকায় তারপর ডুবে যাওয়া পথঘাটে জমা হাঁটুর উপরে ওঠা জল পার হয়ে। বিবাহ আসরে আমাকে দেখার কথা তার মনে ছিল না। পরদিন ভোজসভায় সামাজিক পরিচয়কালে সেটি আমি বুঝেছিলেম। আমার নাম শুনে প্রায় উচ্ছ্বসিত-ই হয়েছিল সে বলা যায়। স্বামীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু— সব জানে সে। তবুও শত অভ্যাগতের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে কথা বলা— কয়েক মিনিটের বেশি তো নয়। সেই স্বল্প পরিচয়ের সব দূরত্ব সেবারে ঘোচাবে বলে তৈরিই ছিল যেন। তবুও দুপুর প্রায় পার করে তাদের বাড়িতে পৌঁছালে নানা আতিথেয়তায় সময় কাটে। গাছ থেকে লোক দিয়ে ডাব কাটানো কি পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরার কালে পুকুরপাড়ে দাঁড়ানো আমি তাকে দেখতে পাই না। সে কি দেখেছিল জানালা দিয়ে আমাকে? জানি না।

সন্ধ্যার পরে বন্ধুর সঙ্গে গ্রামের হাট ঘুরে দেখে আসার পরে ঘরের দরজা খুলে ঝলমলে হাসিতে অভ্যর্থনা করে সে। সারাদিনের প্রতিবেশিকুল কি গুরুজন তখন ছিল না, স্বচ্ছন্দে সামনে এসে বলে সে, 'কী আনলেন আমার জন্য?' আমি হেসে বলি, এই গ্রামের হাটে তার হাতে দেওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পাইনি আমি।

রাতে সবাই যার যার বিছানায় চলে গেলে আমরা তিনজনে গল্পে বসি। পাশের ঘরেই আমার বিছানা। সে তার স্বামীর পুরনো প্রেমিকাদের গল্প বলে, স্বামীর মুখেই শোনা। অমলিন সেইসব প্রেমকাহিনি তাকে যে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না উভয়ের উজ্জ্বল হাস্যমুখে স্পষ্ট দেখি। সে আমার শৈত্যতাপে সুখদায়িনী কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আছে কি না জানতে চায়। স্বামীর মুখে আমার মনোহারিণী অনেকের কথাই শুনেছে সে। আমি মাথা নাড়িয়ে নির্মল হাসিতে বলি, 'তাদের কেউ আমার নয়।'

রাত্রির গভীরতার জন্যই বুঝি, ঘুম আসে চোখে। স্বপ্নের মাদকতাও সম্ভবত, বন্ধু সর্ব আকর্ষণের মাঝখানে যে বসা তার দিকে ঘুমভরা চোখেই কি তাকিয়ে বলে, 'আয়, ওকে চুমু খাই।'

দ্বিতীয়বার তাকে আমি দেখতে যাই বন্ধুর কর্মস্থলেই। সরকারি চাকরি, সরকারি ছোট বাসা। তবুও না-এসে আমার উপায় ছিল না। বন্ধুর হাতের লেখায় তার-ই বয়ানে সর্বদাই বেড়াতে আসবার অনুরোধের জবাবে আমি লিখেছিলাম সে যদি নিজের হাতে আমায় লেখে তবেই যাব। হাতের লেখা ভালো নয়, খুব বেশি লেখাপড়া নেই, স্কুলও তো শেষ করা হয়নি, নিজহাতে চিঠি না-লেখার এই কারণই দিয়েছিল বন্ধু তার জবানিতেই। তাই যেদিন বন্ধুর চিঠির সঙ্গে কাঁচা হাতের লেখা চিরকুট পড়ি, 'হাতের লেখা ভালো নয়, নানা কাজে সময় পাই না। নিউমার্কেট থেকে কাচের চুড়ি নিয়ে চলে এসো, আমায় দেখে যাও', সেদিন আর পারি না। অফিসের কাজে ভিন্ন শহরে দুদিনের জন্য এলে ফেরতপথে তাদের বাসায় আসি।

দরজা দিয়ে আমাকে নিয়ে ঘরে ঢোকবার পরেই গৃহস্বামী তাকে ডাকতে থাকে। বাইরের ঘরে সে নেই দেখে আমাকে শোয়ার ঘরেও নিয়ে যায়। দেখি আলনার কাপড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ানো সে। বন্ধু হেসে বলে, 'ওরে বাস, দারুণ রাগ হয়েছে রে! রাগ ভাঙা।' আমি পাশ দিয়ে ঘুরে তার সামনে যাই। নিচু মুখ প্রায় তুলে ধরবার চেষ্টা করতেই সে মুখ তোলে, দেখি গড়িয়ে না-নামলেও চোখে জল ছিল-ই। বলে সে, 'এতদিনে মনে পড়ল!'

আর ঠিক তখনই পাশের ঘর থেকে কাশির শব্দ শুনি। বন্ধু ক্লিষ্ট হাসির সঙ্গে বলে, 'আমার বাবা, অসুস্থ। আজকাল ঘরেই থাকেন বেশি সময়।'

আমি হাত নামিয়ে নিই। খুব কাছে গিয়েছিলাম কি তার? কাশির শব্দের কোনো কারণ তো জানতে চাইনি আমি! শুধু রাত্রিটুকু-ই তো, ভাবি আমি।

বসবার ঘরে বিছানা করছিল সে। বন্ধু ভিন্ন ঘরে, সম্ভবত পিতার কাছেই। বিছানা করতে করতে বলে সে, 'লেখা ভালো নয়, আর লিখব-ই বা কখন? কালি, কলম, খাম, ডাকটিকেট পাই-ই বা কোথায়!' কথার মাঝখানে থামে সে, 'আমি বেশি লেখাপড়া জানি না, দেখতেও তো ভালো নই, আমাকে ভালোবাসে না ও।'

আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে চলে আসি সেবারে।

আর এই এবারে। অনেক দিন পরে। সরকারি চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ী আমার বন্ধু এখন। বড় ব্যবসায়ী। ব্যবসাসূত্রে নানা দেশ-বিদেশে যাওয়া-আসা তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সন্তান জন্মের কিছুকাল পরে যদিও আমার কাছে গিয়েছিল তারা। পুরনো পৈতৃক বাড়ি ভেঙে উঠান ঘিরে নতুন চার কোঠার দালান তার। উঠানের ওপারে বৈঠকখানা। স্থানাভাব মোটে নেই। নতুন বাড়িতে তাদের দেখতে না-আসার কারণ খুঁজে পাই না। যদিও ভুলি না আমার বাসায় তাদের ভ্রমণকালে সেই জ্যোৎস্না রাত্রির কথা।

আমার বসবার ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিলে ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্না সামনে ফুলের বাগান বসবার ঘর সমস্ত অন্ধকার কোণ-ও ভরে দিয়েছিল সেদিন। বন্ধু বলেছিল, 'আয়, আজ সকলে আমরা বিছানা করে এই ঘরেই শুই। ঘুমাব না। জ্যোৎস্নায় সারা রাত গল্প করব।' তার দিকে তাকাই আমি। স্থির চোখের দিকে। বন্ধু বিছানা করে ছেলেটিকে ওপাশে সরিয়ে স্ত্রীর ও নিজের মাঝখানের জায়গাটি দেখিয়ে বলে, 'এখানে আয়'।

তিন

অনেক দিন পরে এই শহরে আসা আবার। শহর বদলেছে মনে হয়। রেলস্টেশনটি যদিও আছে প্রায় আগের মতোই। বেশ কয়েকটি প্রশস্ত রাস্তা। আন্তঃনগর পরিবহন ব্যবস্থা সর্বত্র ছড়িয়েছে সম্ভবত এ জন্যই রেলস্টেশনটির চারপাশ একইরকম দেখি। শেষবার এই শহরে এসেছিলাম অফিসের গাড়িতেই। এবারেও আসা যেত। পনেরো ঘণ্টার রেলভ্রমণ চার ঘণ্টার নামত গাড়িতে এলে। তবুও কী ভেবে পনেরো ঘণ্টার পথই বেছে নিই। সেই প্রথমবারের কথাই মনে পড়ে হয়তো। কয়েক দিনের ছুটি। গাড়ি চালিয়ে আনবে যে তাকে বন্ধুর বাসায় একাধিক দিনের জন্য অতিথি করা যায় না। কোনো হোটেলে পাঠাতে পারি কিন্তু তাতে বন্ধুর সম্মান রক্ষা হয় না।

পুরনো পাড়াও অনেক বদলেছে দেখি। রাস্তাটাই কেবল চওড়া নয়, দুপাশে বেশ কিছু নতুন দালান। দ্বিতল, ত্রিতল তো অনেকই। বন্ধুর পৈতৃক বাড়ির সামনের খোলা জায়গা এখন প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চারচালার টিনের কোনো ঘর দেখি না আর।

নতুন বাড়ির কাজ শেষ হওয়ার পর থেকেই আসার নিমন্ত্রণ। মাঝখানে বেশ কিছুকাল দেশের বাইরে থাকায় সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যায়নি। তাদের সৌভাগ্যে কি আমি প্রীত নই, এমন প্রশ্নও করা চলে বৈকি! তবু শেষ ভ্রমণের স্মৃতি ভুলি না। যদিও ভাবি, সময়ে সবই বদলায়। জাগতিক পরিবর্তন হয়তো মনও কিছু পালটে দেয়। এজন্যই ট্রেনে উঠে বসা। দীর্ঘ সময়ের ভ্রমণ। পুরনো কথা স্মৃতি দিয়ে মন ভরে রাখার জন্য নয়। ইদানীং আমার চারপাশ, আমার শহর এমন নিরানন্দ, বিশৃঙ্খল, নিজ জীবনও নানা কারণে এমন স্বাদহীন যে অনেক সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

নিজেকে নিয়ে একলা থাকা, পুরনো সংসর্গে ফিরে যাওয়া, কিছু সময়ের জন্য হলেও, প্রয়োজন মনে হয়। তাই আসা।

আসবার আগে কয়েকবারই টেলিফোনে কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে। দু-একবার দিন পালটে শেষটায় ট্রেনের টিকেট কিনে জানিয়ে দিই। অবাক হয় তারা, গাড়ি থাকতে এত কষ্ট করা কেন তারা বোঝে না, আমি নিজেও ভালো বুঝি না।

খুব সকালে ঘর থেকে বেরনোর মুখে টেলিফোনে জানাই স্টেশনে যাচ্ছি। হেসে বলে সে, 'সত্যিই তো!' তারপরে একটু থেকে বলে, 'আপনার বন্ধু বাড়ি নেই। শেষরাতে বেরিয়ে গেছে জরুরি কাজে। আপনার গাড়ি তো পৌঁছবে সন্ধ্যায়। তার আগেই ফিরে আসবে। আর যদি নাও ফেরে, শহর তো আপনার অচেনা নয়! রিকশা নিয়ে চলে আসবেন। ওর নাম বললেই চিনবে।'

আমি একটু ভাবি, বলি, 'তাহলে আজ না হয় থাক। নাই-বা এলাম।' আমার কথায় তার গলার স্বর পালটায়, রাগ করে বলে সে, 'কেন আমরা বাড়ি নেই?'

আমি হেসে বলি, 'তা কেন? রাগ কোরো না। ঠিক আছে, এই বেরোচ্ছি।'

দিনমানের রেলগাড়ি। ঘুম তেমন আসে না। প্রশস্ত কামরায় যতই আরামে বসবার বা শোবার ব্যবস্থা থাকুক না কেন। প্রায় বৃষ্টির দিন, রোদে কোনো তাপ ছিল না, তাই জানালায় বসেই সময় কাটে। দেখি কখনো শস্যহীন প্রান্তর কখনো হলুদ ফসলের মাঠ, দেখি রেললাইনের পাশ বরাবর যাওয়া খুঁটির তারে লেজঝোলা পাখি, দেখি ঘন সবুজ গাছপালার নিচে বাঁশকাঠের ঘর, কি কখনো ছোট গঞ্জের রেলস্টেশনে যাত্রীর ওঠানামা। বারবার ফেলে আসা দিনের কথা ভাবি, তার চিঠির কথা ভাবি, স্পষ্ট দেখি তার জল পড়ে না তবুও সেই ভেজা চোখ।

নিজের কথাও ভাবি। পেছনেই পড়ে থাকার কথা যার, সে আজ সামনেই প্রায়। আলোছায়ার নানা দিনরাত্রির শেষে। ভাবি কিছু নষ্ট সম্পর্কের কথাও। কোনো কথাই তাকে বলিনি কোনোদিন। যখন দেখা হয়েছিল তখনও নয়, আর দীর্ঘ অদর্শনের কালে তো নয়ই, চিঠিপত্র কি টেলিফোনেও নয়। ভাবি, আমার এই নৈঃসঙ্গ্যের বোধই কি আজ পথে নামাল? অনেক আগের ফেলে আসা কিছুই কি খুঁজে পাওয়া যাবে না?

হালকা সন্ধ্যার মুখেই নামি ট্রেন থেকে। একটু অপেক্ষা করেও চেনামুখ দেখি না। রিকশাওয়ালাকে বন্ধুর নাম বলতেই সে চিনে নেয়। স্টেশনের কাছেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়াটি তাদের-চিনবেই না কেন! এক কালের ছোট শহর, এখন হয়তো কিছু বড়, তবে পুরনোজন চেনা সকলেরই।

প্রাচীরঘেরা দালানের সামনে রিকশা থামলে আমি নিশ্চিত হতে চাই– এটিই সে বাড়ি তো! জানি নতুন বাড়ি, নতুন দালান, তবুও।

নকশি গ্রিলের দরজায় আওয়াজ তুলতেই যে লোক এসে সেটি খুলে দেয়, মনে হয় আমি তার কত চেনা। আনন্দে, হাসিতে সে আমাকে অভ্যর্থনা করে, সঙ্গে ব্যাগটি নেয়, তারপর আঙিনা পেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখি ঘরের দরজা খোলা, পড়তি সন্ধ্যার অন্ধকারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দরজার পাশের আলোটি জ্বালিয়ে বারান্দায় পা দিতেই তাকে দেখি আমি। অনেক দিন পরেই তো, তবুও ওই উজ্জ্বল আলোর নিচে তাকে দেখে মনে হয় বুঝি আগে কখনো দেখিনি তাকে। কখনো বুঝি সে বলেছিল আমি তো দেখতে ভালো নই– নিজের কথা সে বলেনি নিশ্চয়ই।

আলোর নিচে আমি যেমন তাকে দেখি পূর্ণ চোখে, সেও বুঝি তেমনি। হাসির সঙ্গে বলে, 'দেখা হলো তাহলে শেষে।' কেন, আগে কি আমরা দেখিনি পরস্পরকে কখনো, বলতে পারতাম, কিন্তু বলি না। তাকে দেখে আমারও এমন কথা মনে এসেছিল।

'ও এখনও ফেরেনি। একটু আগে ফোন করে খবর নিয়েছে।' বিদেশি অতিথি, কর্মসহায়ক লোকটির সামনে তাকে হাত ধরে অভ্যর্থনা করা যায় না, তবুও তেমন করেই আমায় সাজানো ঘরে নিয়ে যায় সে। সঙ্গে আসা লোকটিকে বলে, 'ব্যাগটা ভিতরের ঘরে নিয়ে যাও।' লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি বলি, 'একটু দাঁড়াও', দেখি আগে তোমাকে।'

'ইস্, দেখবার কত ইচ্ছে সে তো জানিই। পাঁচ বছর পরে এই কথায় বিশ্বাস করবে কে?' ভাবি, সে কখনো বলেছিল, আমি তো বেশি লেখাপড়া জানি না।

'বসুন।' বলে আমাকে সোফায় বসিয়ে পাখা ছেড়ে দেয়। তারপরে দ্রুত দরজা দিয়ে ভিতরে যায়, এবং ফিরে আসে যখন দেখি তার হাতে এবং কোলে ধরে রাখা সাত বছরের ফসল। দিব্যকান্তি বালকটিকে সামনে এগিয়ে দেয় সে, 'নাম বলো'। তারপরে কোলেরটি দেখিয়ে বলে, 'ও এখনও নাম বলতে পারে না।'

আমি তাকে শেষ যখন আমার বাড়িতে দেখি তখন তার একটিমাত্র সন্তান– ছোট। তবে দুই সন্তানের সব খবরই জানা ছিল আমার।

ঠিক তখনই টেলিফোনের শব্দ। 'বন্ধুর জন্য বুঝি প্রাণ যায়। ধরুন।' বলে ফোনটি আমার হাতে দেয়। প্রসন্ন কণ্ঠ শুনি, 'কোনো কষ্ট হয়নি তো?' তারপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বলে, 'আজ রাতে ফিরতে পারলাম না রে। মহা ঝামেলা-পড়েছি। মিস্ত্রিরা এখনও কাজ করছে।' নানাভাবে খারাপ লাগার কথা বলে সে, 'এতদিন পরে এলি আর আমি নেই'। আমি হেসে সব কথা উড়িয়ে দিই। কিছুই মনে করবার নেই। জীবনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে, একথা কে না জানে, তাকে বোঝাই। সকালেই তো দেখা হবে।

আপ্যায়নের সমস্ত ব্যবস্থাই করা ছিল তার। আমার পছন্দের ফরাসি পানীয়টি পর্যন্ত। খাবার টেবিলে যাওয়ার আগে নানা কথায় গল্পে সময় কাটে। মাঝে মাঝে সে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে গৃহকর্মীটিকে কিছু নির্দেশও দেয়। একসময় গিয়ে সন্তান দুটিকেও শুইয়ে দিয়ে আসে।

খাওয়ার পরে বাইরের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বলে সে, 'গ্লাস নিয়ে ওই ঘরে চলুন।' আমি সামান্য দ্বিধায়, বলি, 'কেন এই ঘরেই তো দিব্যি বিছানা করা আছে।'

আমার দিকে তাকিয়ে বলে সে, 'এটি অতিথিদের ঘর।'

তার পেছনে এসে আমি দ্বিতীয় শোবার ঘরটিতে বসি। বাতিদানের টেবিলটির পাশে পাতা চেয়ারে বসি। সে সন্তান দুটিকে একবার দেখে আসে, তারপর বিছানা ঝেড়ে, মশারি টাঙিয়ে সেটি গুটিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এখন শোবেন নাকি?'

আমি হাতের গ্লাস দেখিয়ে বলি, 'এটি তো এখনও শেষ হয়নি।'

আর তখনই, দুই ঘরের বাইরের দরজা দেওয়া হলে, মাঝখানের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'ঘরে এখন যাওয়া-আসা কার?'

আমি হেসে বলি, 'ঘরের দরজা সব সময় খোলা। কে আসে কে যায়, খবর রাখি না তো!'

'কতজনের কথা বলে ও! লোকের কাছে শোনা।'

'তাহলে আমি একলা কেন?' হেসেই বলি।

কিছুক্ষণ চুপ করে চুল আঁচড়ায়। তারপরে বলে, 'এমন সঙ্গীহীন জীবন—'

'খারাপ কী', বলি আমি। তাপরে কী মনে আসে। তার দিকে তাকিয়ে বলি, 'আমায় কে চাইবে বলো?'

'কতজন আছে!'

পরিহাসের সুরে বলি আমি, সম্ভবত ভব্যতার সীমানা ছাড়িয়েও, 'তুমিও!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো জবাব দেয় না সে, আয়নার দিকে চোখ তার, সেদিকে তাকালে দেখি স্থিরদৃষ্টি আমার দিকেই পড়া।

চার

আমি দরজার আলোয় ছায়া দেখি বন্ধ চোখেই। হালকা হাওয়ার সঙ্গে সামান্য খসখস শব্দ ওঠে বুঝি। সে বুঝি আমার পাশেই এই ভেবে আমি বিছানার ভিতরে সরে গিয়ে তাকে বসবার জায়গা করে দিতে চাই। বুঝি বুকের পাশে এসে বসেছে সে। মুখ নিচু করে আমার বন্ধ চোখ দেখে সে? কাঁপে কি সেই চোখের পাতা? 'সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

আমি বলি, 'না তো!' আমি তার বসনের সুবাস পাই, শরীরের ঘ্রাণ। বুঝি আমার শরীরের দিকে নমিত তার শরীর। আমি পাশে রাখা হাত তুলে গভীর আশ্লেষে বন্ধ করি তাকে। সমস্ত শরীর বুঝি কাঁপে আবেগে। ধীরে আমার পাশে সে তার শরীর রাখে, আমি সেখানে, সেই শরীরে, আমার সমস্ত বোধ, বাসনা, কামনা ন্যস্ত করি। আনন্দে শরীর শিহরিত হয়।

পাঁচ

সকালের আলো জানালা দিয়ে এসে ঘুম ভাঙায়। দেখি আমি বিছানায় শোয়া। মশারি নামানো। রাত্রিকালে দেখা এই ঘর, এই বিছানা সবই অপরিচিত মনে হয়। মাঝখানের দরজাটি বন্ধ। আমার গলায় কোনো স্বর আসে না। এবং মুহূর্তে মনে পড়ে যায় খোলা দরজার কথা, দরজায় আলোয় ভাসা ছায়ার কথা। বন্ধ চোখের ওপারে আলো, ছায়া, শব্দ ও নানা গন্ধের খেলার কথা মনে পড়ে। আমি নিশ্চল শুয়ে থাকি, বিহ্বল। মুহূর্তে চেতনা ফেরে। শুনি, বাইরের আঙিনায় পাশের ঘরে জীবনের নানা কলরব। স্বপ্ন কিছুতে নয়, ভেবে মশারির বাইরে বসতেই ঘরের দরজায় শব্দ। উঠে দরজা খুলতেই দেখি, রাত্রিতে না আসার দোষ কাটাবার জন্য ওই ভোরেই সে আমার দরজায়। পরস্পরকে আলিঙ্গনে বাঁধি আমরা।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কাটলে বাথরুম থেকে ফিরে বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ার টেবিলে বসি আমরা। সদ্যস্নাতা সে চায়ের ডালা নিয়ে আসে। মুহূর্তে আমার রাত্রির কথা, না-ঘুম না-জাগরণের কথা, না-স্বপ্ন না-জীবন এর কথা মনে পড়ে যায়। আমি প্রায় বিমূঢ়, তার দিকে তাকাই। হাসিমুখে বলে, 'রাতে কত কষ্ট হয়েছে বন্ধুকে বলবেন না? ছোট ঘর, একা একা স্টেশন থেকে রিকশা করে আসা, কেমন বন্ধু বুঝুন।'

আমি হেসে বলি, 'ও ঘরে থাকলে কি এর চেয়ে বেশি আদরযত্ন পেতাম?' বলে ভাবি আমার কথার মধ্যে কি অন্য কিছু বলবার চেষ্টা আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমি তাদের মুখের দিকে তাকাই পর পর। বন্ধু দুঃখের সঙ্গে বলে, 'আসলেই আমার ফিরে আসা উচিত ছিল। কিছুতেই পারলাম না। নতুন মেশিন বসছে। কাজ শেষ হতে রাতও হয় অনেক। কিছু মনে করিস না।'

আমি তাকে বাধা দিই, কী যে পাগলের মতো কথা!

সারা দিন কাটে উৎসবের আমেজেই প্রায়। নতুন বাড়ি– সব ঘর, চারপাশ দেখায় আমাকে সে। শহরে তার অফিসে নিয়ে যায়। শহরের প্রান্তে পুরনো কারখানাটিতেও। সেখানেই তার ভাগ্যের সূচনা।

দুপুর পার করে ঘরে ফিরি যখন গৃহিণী তার রান্নাঘরের নানা ব্যস্ততা রেখেও বাইরে আসে। বলে, 'কেমন দেখলেন সব? এই নিয়েই তো আছে ও।' হয়তো তুমিও, মনে মনে ভাবি। সাত বছর আগের সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে– 'ও আমাকে ভালোবাসে না।' আর এখন? আর হঠাৎই মনে পড়ে যায় রাত্রে আমি মশারি নামাইনি। মশারির নিচে ঘুমাতে পারি না। পাখা চালিয়ে মশা তাড়াই। কিন্তু কাল রাতে মশারি নামানো ছিল। আরও কিছু ভাববার চেষ্টা করি। আরও কিছু চিহ্ন খুঁজি, না-ঘুম না-জাগরণ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায়। সারা দিনের নানা সময়ে সামনে এলে আমি তার চোখের দিকে তাকাই– সর্বদা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আদৌ কোনো বিশেষ নৈকট্য ধরা পড়ে কি না।

বাইরের ঘরে সান্ধ্য আসরের শেষে শোবার সময় হলে আমি বলি, 'আমি না হয় এ ঘরেই থাকি। ছেলেটার ঘর দখল করে আছি।'

'না না, তার দরকার নেই। ছেলে আমার মায়ের কাছেই থাকে।' একটু থেমে বন্ধু বলে, 'ঘরটি অবশ্য ছোট। আমি ভেবেছিলাম তোকে এখানেই শুতে দেব।' শেষে সে বলে, 'এটা অতিথিদের জন্য। তুই তো আমাদের অতিথি নোস!' হাসে সে। তার হাসিতে কোনো ক্লিষ্টতা ছিল কি? গলার স্বরে কোনো দ্বিধা? আমি নিশীথের সঙ্গীর দিকেও তাকাই। আয়নায় দেখা তার স্থিরদৃষ্টির কথা ভাবি। সেও কি আমাকে চায়, বলেছিলাম আমি তাকে। সেইসব কথা, রাত্রির কোনো আভাস তার হাসিতে, চোখে, কথায় ধরা পড়ে কি? অন্যের চোখে?

তিন দিনের বেশি অনুপস্থিতি কোনোমতে আমার অফিস বরদাস্ত করবে না জানিয়ে পরদিন সকালের ট্রেনেই চলে যেতে চাই। বন্ধু প্রবল আপত্তি করে। নতুন কারখানায় নেওয়া হলো না। আমি বলি, 'চালু হোক। আবার এসে দেখে যাব।'

'পাঁচ বছর পরে তো?' বন্ধুপত্নী বলে। 'থেকে যান না আর এক দিন', মিনতি তার গলায়।

রাত্রে আমি বাইরের ঘরেই শুয়ে থাকি। ওই ঘরে, ওই বিছানায়, ওই খোলা দরজার আলোয় ভাসা ছায়া যেখানে, সেখানে কোনোমতে থাকি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

আমি দরজার আলোয় ছায়া দেখি বন্ধ চোখেই। হালকা হাওয়ার সঙ্গে সামান্য খসখস শব্দ ওঠে কি? শরীরে জড়ানো বাসন্তী শাড়ির শব্দ সেটি। সে বুঝি আমার পাশেই বসা এই ভেবে আমি বিছানার ভিতরে সরে গিয়ে তাকে বসবার জায়গা করে দিই। বুঝি বুকের পাশে এসে বসেছে সে। মুখ নিচু করে আমার বন্ধ চোখ দেখে কি? কাঁপে কি সেই চোখের পাতা? 'সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?' সে কি জিজ্ঞেস করেছিল? আমি কি বলেছিলাম, 'না তো।' আমি তার বসনের সুবাস পাই, শরীরের ঘ্রাণও কি? আমার শরীরের দিকে নমিত তার শরীর। আমি পাশে রাখা হাত তুলে গভীর আশ্লেষে বদ্ধ করি তাকে। সমস্ত শরীর বুঝি কাঁপে আবেগে। ধীরে আমার পাশে শরীর রাখে কি সে? আমি সেখানে, সেই শরীরে আমার সমস্ত বোধ, বাসনা, কামনা ন্যস্ত করি কি? আনন্দে শরীর শিহরিত হয়?

সকালে আলোর দরজায় ভাসা ছায়ার পথ বন্ধ দেখি। রাতের গোটানো মশারি সকালে নামানো যদিও। মাঝখানের দরজাটি বন্ধ। সদ্যস্নাতা তার মুখে সলজ্জ হাসি দেখি। সারা দিন আরও কতবার আমি কর্মব্যস্ত তাকে দেখি। চাহনিতে কোনো ইঙ্গিত, হাসিতে কোনো আভাস খুঁজি। পাই না।

শুধু রাতে শোয়ার সময় বিছানা করে, মশারি নামিয়ে, বাতি নিভিয়ে চলে যাওয়ার ঠিক আগে প্রায় বুকের কাছে এসেছিল, 'আবার এসো।' ওই চিরকুটের পরে অমন ডাক এই প্রথম। তবু আমি আরও কিছু খুঁজি, আরও অভিজ্ঞান। স্বপ্ন ও জাগরণের ধূসর অস্তিত্বের আরও কিছু দাগ। বালিশে চুলের ঘ্রাণ, বিছানায় কোনো চিহ্ন। হয়তো ছিলও না কিছু। অথবা তাই কি?

স্বপ্নে সবই ঘটে, কিন্তু থাকে না কিছুই। স্বপ্ন ও জাগরণের মাঝখানেও কি তেমনি? কিছু কি ঘটে না সেখানে? কিছু কি থাকে না? কিন্তু আমি তো বন্ধ চোখেও সবই দেখি।

এই এতকাল, এতকাল পরেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহাবশেষ

প্লাবন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়– রেখেও যায় কিছু, ফিরিয়েও দেয় কিছু কখনো। বর্ষায় ফুঁসে ওঠা, গ্রীষ্মে ক্ষীণতোয়ার শরীর যখন নিরাভরণ, তখন দেখা যায়। গভীর জলাশয়ের সব সম্পদ নদীতে ফিরে গেলেও পলিতে গাঁথা থাকে তস্কর প্লাবনের লুণ্ঠিত কিছু সামগ্রী। তবে ঠিক যেমনভাবে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তেমন করে ফিরিয়ে দেয় না, সেই চেহারায়ও নয়। অনেক সময় চেনাও যায় না। তবু সে চিনেছিল।

বান সরে গেলে মাঠ যখন আবার সবুজ হয়, পথে যখন ধূলিরাশি ওড়ে আবার, বর্ষা কূলছাপানো, যেন আদিগন্ত বিস্তৃতই, তখন ছোট শুকনো বিলের বুকে ডোবানো ডালপালা সরালে জলচর প্রাণীদের দেখা মেলে, সাগ্রহে সকলে তাদের ঘরে নিয়ে যায় কিন্তু অকস্মাৎ সেই শূন্যপত্র কর্দমাক্ত বৃক্ষশাখা আর জঞ্জালের নিচে যদি দেখা যায় দেহহীন কোনো কায়া, সভয়ে সকলে সরে যায়। দ্রুত উঠে যায় জলাশয়ের পাড়ে। নানা চিৎকার কোলাহলে অনতিদূর গ্রামের লোকজনও ছুটে আসে কিন্তু কেউ কিছু বোঝে না, চেনে না, জানে না। আর্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় সকলে সেদিকে চেয়ে থাকে কেবল। আর তখনই সে এসেছিল, ছুটে নেমেছিল শুকনো বিলের বুকে। পলিমাটি, বালি সরিয়ে স্পষ্ট করেছিল দেহহীন সেই কায়াকে আর মুহূর্তেই সে চিনেছিল। চিনবেই-বা না কেন? ধাতব গোলাকার মণিবন্ধনীটি নোনাজল কি বালুমাটিতে যতই বিবর্ণ হোক দেহহীনার হাতে তখনও সেটি অটুট ছিল। আর সেটি দেখেই সে জড়িয়ে ধরেছিল দেহহীন কায়াকে জল, মাটি, কাদা, বালির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে। ধরবেই বা না-কেন, সে জানত নিজ ইচ্ছায় কোনোমতে ঘর ছাড়েনি সে। ভাসায় নি তাকে বানেও। যে যা-ই বলুক না কেন।

পাড়ের সকলে তখন বিলের শুকনো বুকে নেমে আসে। তাকে হাত ধরে টেনে তুলতে চায় কেউ কেউ। নানা কথা বলে সকলে, নানা কোলাহল। দেহহীন কায়াকে অত সহজে চেনা যায় না। বানে ভাসানো কবরের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সে, কি শ্মশানের পোড়াকাঠের নিচে থেকেও। নানা যুক্তিও তখনই শোনা যায়। কাছে কোনো সমাধিস্থল নেই, কি নেই কোনো শ্মশানঘাট। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্মশানের লেলিহান শিখা পুড়িয়ে দেয় প্রায় সবই। রাখে সামান্যই। কারও দেহহীন কায়া অমন অটুট থাকে না।

কেউ গ্রাম্য প্রধানের কাছে ছুটে যাওয়ার কথা বলে, কেউ বলে 'চেয়ারম্যানরে ডাকো'। সে কারও কোনো কথায় কান দেয় না। কেশ, মেদ, মজ্জা, শিরা, ত্বকহীন আপনজনের কর্দমাক্ত কায়াটিকে বুকে তুলে নিয়ে বিলের পাড়ে উঠে আসে। ছুটতে থাকে নিজ ঘরের দিকে।

বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে নিয়ে ধোয়ায় সে ঘরে ফিরিয়ে আনা আপনজনকে। সযত্নে তুলে রাখা নিরুদ্দিষ্টার ডুরে শাড়িটিকে বিছিয়ে দেয়। বলে, ওই শাড়িটিই সবচেয়ে পছন্দের ছিল। সেটিই না হয় পরুক এখন। ততক্ষণে গ্রামের মোড়ল ও চেয়ারম্যান বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। থানাতেও খবর দেওয়া প্রয়োজন কি না এমন কথা উঠলে উভয়ে কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত। স্পষ্ট কোনো অপরাধের চিহ্ন দেখা যায় না। জলে ডোবা কি ডুবিয়ে দেওয়া, ভেসে আসা কি ভাসিয়ে দেওয়া দেহবশেষ যে ওই নিরুদ্দিষ্টারই তারই বা ঠিক কী? সে বলে, মণিবন্ধের এই অলঙ্কার চেনে সে। অটুট দুটি গোলাকার মণিবন্ধনী– অতি বিবর্ণ, কালো, কিন্তু সে ওই অলঙ্কারের অসমান ঢেউ তোলা আস্তরণ দেখেই বুঝেছে নিজ হাতে কিনেছিল।

তখন সকলে বলে, তাহলে না-হয় শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা যাক। গ্রামপ্রধান কী চেয়ারম্যান সেটি মানে না। ওই দুগাছি চুড়িই পরিচয় নিশ্চিত করে না, আর পরিচয়হীন কারও শেষকৃত্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পরিচয় সঠিকও যদি হয় তাহলে কোন অপরাধ, কী দুর্ঘটনা ইত্যাদি স্থির করার জন্যও ওই দেহাবশেষের প্রয়োজন। শূন্যে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না তাকে।

নানা কথায়, কোলাহল, উত্তেজনায়, বিতর্কে বেলা চলে যেতে থাকে। বিহ্বল, উদ্ভ্রান্ত লোকটি যেন উন্মাদ। এমন সময়ে শহরে পড়ুয়া গ্রামের ছেলেটি বলে, সে বরং শহরে যাক। বড় হাসপাতালের ডাক্তারেরা, শোনা যায়, নানা উপায়ে দেহহীন কায়ারও নাকি পরিচয় নির্ণয় করতে পারেন।

সন্ধ্যা ক্রমে নামে। আগ্রহ, উত্তেজনা ক্রমে স্তিমিত হয়। সকলে যার যার ঘরে কী কাজে ফিরে যায়। তাহলে না-হয় তা-ই করো বলে মোড়ল ও চেয়ারম্যান উঠোন ছেড়ে যায়। প্রতিবেশী কেউ একটি আলো জেলে আনে। রেখে দেয় ডুরে শাড়িটির পাশে। সে স্থির চোখে ওই আলোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

দুই

শহরের বড় রাস্তার পাশেই সব সাজানো, নদীর পাড় ধরেই আদালত, ট্রেজারি, উকিল, মোক্তার আর মক্কেলের মিলনস্থল উঁচু প্রাচীরঘেরা জেলখানা, হাসপাতাল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ম্যাজিস্ট্রেটের নিবাস, সিভিল সার্জনের অফিস, বাসা– আর তার পাশের রাস্তা দিয়ে নদীর দিকে গেলেই ডাইনে চোখে পড়বে পুলিশ-প্রধানের বাসস্থল। সবক'টি স্থাপনার পেছন দিয়ে বয়ে গেছে নদী– সমস্ত শহরেরই পাশ দিয়ে যেন। ওইসব দালানকোঠার মাঝে মাঝে রাস্তা নদীর দিকে চলে গেছে লোকালয় থেকে। রাস্তা যেখানে শেষ সেখানে নদীর ঘাট। প্রায় বাঁধানো। বর্ষায় নদীর ঢেউ বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে ছলকে ওঠে। খরার দিনে সিঁড়ি সব শূন্যে ঝুলে থাকে– অনেক নিচে শুকনো নদীর খাত। শুধু হাসপাতাল আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসস্থানের মাঝখানের ঘাটটিই সবসময় ভরা থাকে। বিস্তৃতও নদী এখানে অনেক– গল্পও তাই অনেক। শোনা যায়, চৌধুরীদের বড় ছেলে এই ঘাটে স্নান করতে এসে যেদিন তলিয়ে যায় সেদিনই তার প্রথম বিভাগে পাস করার খবর আসে। ননদের বিয়ের লোকাচারের জন্য ঘাটে এসে পা পিছলে নদীর গভীরে চলে যায় যে বধূটি সে-ও কখনো ফিরে আসে না। শোনা যায় জল উথাল-পাতাল করেও নাকি কোনো অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি, যেমন পাওয়া যায়নি ওই কৃতবিদ্য ধনী সন্তানের। নদীর নানা ঘাটের নানা গল্প থাকে– আদালতের ঘাটে ডুবে যায় মামলার সর্বস্ব-হারানো সুদিনশেষের জমিদার, ভরা নদীতেও লাফ দিয়ে পড়ে আর ওঠে না। জেলখানা থেকে নৌকায় ওপারের জেলবাগানে যাওয়ার কয়েদি, চোরাবালিতে ডুবে যায় তুখোড় বক্তা রাজনৈতিক কর্মী যুবকটি– পুলিশ সাহেবের ঘাটেই। আর সব গল্পের শেষেই থাকে ওই একটি কথাই, কারও কোনো অবশেষ কেউ কখনো খুঁজে পায়নি। তাদের পিতা-মাতা, পুত্র, কন্যা নদীর ঘাটে এসে সারা জীবন বসে থাকলেও নয়। কিন্তু সে পেয়েছিল।

তাই সদর রাস্তা থেকে হাসপাতালের দিকে যাওয়ার পথটির মোড়ে যখন এক ভোরে দেখা যায় বসে আছে গ্রামীণ কৃষক, প্রায় শূন্যপত্র বেলগাছের নিচে– তখন সকলে চমকে যায়। দেখে সামনে ছড়ানো ভাঁজ করা ডুরে শাড়িটি আর তার উপরে শোয়ানো একদেহাবশেষ, তখন অনেকে চমকেও যায়। রাস্তার উলটো পাড় ঘেঁষেও চলে যায় অনেকে। স্কুলের কোমলমতি বালকই কয়েকটি নিঃসন্দেহে, মুখে শব্দ তুলে দৌড়ে জায়গাটি পার হয়ে যায়। একটু দূরে গিয়ে তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ উপরে চোখ তুলে তাকায়, দেখে প্রায় শূন্যপত্র বেলফলের গাছটি, ছোট দু-একটি ফলও দেখা যায়, আর তখনই তাদের মনে পড়ে, অশরীরী দেহহীনদের কথা। এই দিনের পরিষ্কার আলোয় ডুরে শাড়ির উপরে যে শুয়ে আছে, সে কায়াহীন নয়– এ কথা ভুলে যায়। নদীর ঘাটে নিখোঁজ যারা তাদের কখনো কোনো দেহ ছিল না, কায়াও নয়, এ-কথা বুঝি তাদের মনে পড়ে, তাই স্নান শেষে ফিরতি পথে অসম সাহসী কয়েকজন ঘিরে দাঁড়ায় দেহহীন কায়াটিকে– শঙ্কা, ভয়, উত্তেজনায় দ্রুত শ্বাসও নেয় কেউ কেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি তখন তাদের কাছে শাড়িতে শোয়ানো আপনজনের কথা বলে। ভেজা চোখে দুই অটুট মণিবন্ধের অলঙ্কার দেখায়, নিজ হাতে কেনা– তাই তার ভুল হয়নি। চিকিৎসক কি অস্থিবিদেরা কোনোমতে কি পারে না পরিচয় নিশ্চিত করতে? কেউ কি পারে না কেন সে দেহহীন একথা বলে দিতে?

তিন

বেলার সঙ্গে বাড়ে লোক চলাচলও, আর তাই বাড়ে ভয়, শঙ্কা, উত্তেজনা, কৌতূহল। দেহহীনের অনেক গল্প তারা জানে, জানে না কি শোনেনি কখনো দেহহীন কোনো শরীরের গল্প।

ছায়াহীন গাছটি পার হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই বাঁপাশে দাতব্য চিকিৎসালয়। সেখানে কখনো কোনো চিকিৎসক বসে না, কেবল তার সহকারী নানা রঙের আরক-ভরা বোতল নাড়াচাড়া করে সারা দিন। শত ডাকাডাকিতেও সে বেরোয় না। দেহহীন কোনো শরীরের পরিচয় নিশ্চিত করার ক্ষমতা তার নেই।

বড় রাস্তায় যান চলাচল বাড়ে। চলে যায় উকিল, মোক্তার, জজ, আমলা, দফতরি কি কেরানির দল। পায়ে হাঁটা কেউ তার সামনে দিয়ে গেলে সে ওই গাছতলায় বসেই কাতর মিনতি জানায়। ওই দৃশ্য যে মনোহারী নয় এ-কথা সে বোঝে না, কেবল দেখে দ্রুত পায়ে সরে যাওয়া লোকজন। কেউ যদি সাহস নিয়ে দাঁড়ায়, তাকে দেখায় সে মণিবন্ধের অলঙ্কার। নিজ হাতে কেনা।

বেলা বাড়ে, রৌদ্র প্রখর হয়। আকাশে কিছু মেঘও জমে কখনো। বর্ষণ হয়। লোকটি তেমনি বসে থাকে। আবার রোদ ওঠে। লোকটি বসে থাকে। প্রায় বেলাশেষে হাসপাতালের বড় ডাক্তার তার সামনে এসে বোঝান ওই মণিবন্ধনীই কেবল কোনো পরিচয় নিশ্চিত করে না। আর করলেই-বা কী কারও ক্ষমতা নেই বলার, কেন তার আপনজন এখন দেহহীন। কে তাকে ঘরছাড়া করেছিল, কি ভাসিয়েছিল, কি ডুবিয়েছিল কারও ক্ষমতা নেই সে কথা বলার। যদি ঠিকই জানা যেত দেহহীনা কে তাহলে হয়তো পুলিশ কি বিচারক খোঁজখবর নিতে পারে। কিন্তু সেটি স্থির করার কোনো উপায় জানা নেই সরকারি চিকিৎসকের।

আবারও দিনশেষে সন্ধ্যা আসে। হাসপাতাল আর ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির বিস্তৃত ঘেরা প্রাঙ্গণের মাঝখানে শহরের টাউন ক্লাব। বনেদি অধিবাসীদের মিলনস্থল। বেলা শেষ হওয়ার আগেই ক্লাবের লোকজন সিমেন্ট-বাঁধানো টেনিস কোর্টের মাঝ বরাবর প্রায় বুকসমান উঁচু জাল টাঙিয়ে দিয়ে যায়। জালের দুই প্রান্তে জোরালো বৈদ্যুতিক আলোয় স্তম্ভ। বিত্তবান, যশস্বী, প্রতাপী কেউ কেউ টেনিস খেলার সাদা পোশাক পরে খেলায় নামে। আলোর চারপাশ স্পষ্ট দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

যায়। দেখা যায় লোকটিকেও, আর তার সামনে শ্বেত কায়া উজ্জ্বল আলোয় আরও শুভ্রতা পায়।

তবু তারা আসে। গাছটির আড়ালে, সামান্য অন্ধকারে দাঁড়ায়। বলে, সারাদিনে কিছুই তো মেলেনি তার, মিলবেও না কখনো। শুধু শুধু কেন সে ডোরাকাটা শাড়িতে শোয়ানো ওই দেহহীনাকে বয়ে বেড়াবে! বরং দিয়ে দিক সেটি তাদের হাতে তুলে। কিছু নিঃসন্দেহে মিলবে তার।

বিস্ময়ে ত্রাসে চারপাশে তাকায় সে, অন্য কাউকে দেখে না কাছে। কিছুদূরের টেনিস খেলার মাঠে সহর্ষ শব্দ কেবল। হাসপাতালের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। দাতব্য চিকিৎসালয় অন্ধকার। সহকারী চিকিৎসক কোনকালে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেছে। বড় রাস্তায় যান চলাচল কমে এসেছে, লোক চলাচলও। রাত্রিবেলায় এই পথে হাঁটে না তেমন কেউ।

দিশাহীন লোকটি তখন উঠে দাঁড়ায়। শাড়ি দিয়ে দেহহীনার সমস্ত শরীর জড়িয়ে নেয়। জড়িয়ে বুকের কাছে ধরে রাখে। পাশে দাঁড়ানো সাহায্যদানে উৎসুকজনকে বলে, তারা চলে যাক। সে বরং যাবে আদালতপাড়াতেই। সারা রাতের শেষে সকালে জজ সাহেব তো আসবেনই। আদালতের উল্টোদিকে পুলিশ প্রধানের দফতর জানে সে। সেখানেও না-হয় যাবে সে। সকাল হলে কারও না কারও দেখা তো মিলবেই। কেউ না কেউ তো এগিয়ে আসবেই। শুনবে তার কথা। চাই কি কোনো উপায়ে তার মিলবে সে যা চায়।

সন্ত্রাসীজন হাসে কেবল। কিছুই মিলবে না আগামী দিন শেষেও, এ কথা বললেও দেহাবশেষ তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার সাহস তাদের হয় না। জজ পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের অঞ্চল। নানা প্রহরী পুলিশের ঘোরাফেরা। সামান্য আর্তচিৎকার শুনলেও তাদের কেউ ছুটে আসবে এ কথা জানে দুর্জন সকলে। তাই বড় রাস্তায় উঠে ডানে ঘুরে আদালতপাড়ার দিকে যেতে দেয় তাকে।

অসমান পা ফেলে হাঁটে সে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা কি অবসাদ কিছু সে মানেনি। কিন্তু ওই সবই তার সঙ্গে আছে। কেবল সে-ই কিছু বোঝে না। অসমান পায়ে হাঁটতে থাকে। এই রাত্রিটুকুই তো কেবল— ভাবে বুঝি।

ঘন বটপাকুড়ের ছায়ার ঢাকা আদালতের রাস্তা। আলোর স্তম্ভ দাঁড়ানো দূরে দূরে। কিছু অন্ধকার তারা দূর করে। ডানপাশে সহস্র কক্ষের আদালত ভবন— যেন শেষ— শুরু দেখা যায় না। বাঁপাশে পুলিশের আস্তানা। সেখানে শান্ত্রী দাঁড়ানো। আদালতের শেষে ট্রেজারি— সরকারি ধনাগার। ঘণ্টা পেটানোর হাতুড়ি হাতে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শান্ত্রী সেখানেও। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আওয়াজ তোলার জন্যই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ভয় তাকে স্পর্শ করে না। পুলিশ কোর্টের উল্টোদিকে আদালত ভবনের ঠিক মাঝখানে আলোর নিচে বসে সে। সে কোনো অন্যায়ী নয়, ভয় কিসের তার।

দেহহীনাকে পাশে রাখে সে। সকালের অপেক্ষায় নিজেও সিঁড়ির ধাপে হেলান দেয়। চোখ বুজবে না সে কিছুতেই কিন্তু বুজলেই দেখতে পেত পাশেই ডোরাকাটা শাড়ি পরে বসে আছে যে হাতে তার ঝকঝকে বালা দুটি।

তেমনি মসৃণ ত্বক— হাত বোলোলেই বুঝত সে। দেখত খোলা চুল উড়ছে সামান্য বাতাসে। আর মাত্র কিছু সময়। এই সময়টুকুই আছে তার দেহহীনার দেহকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ফিরিয়ে এনে বিচারকের সামনে দাঁড়াবে সে। সামান্য কৃষকের মুখে যে কথা মানায় না, যে কথা শোনা যায় না, সে কথাই বলবে সে। বলবে, মহামান্য বিচারক, দেখুন এই আমার সে— জলে ভাসে না, আগুনে পোড়ে না। আমি জানি, সে কে। এখন আপনি বলে দিন, সে কে? সে আমার কে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~